অবঙ্গতের অপলাপ

বিনায়ক সান্যাল

অজন্তা পাবলিশার্স
৫৬, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯
পোস্ট বক্স নং : ১০৮৫৪

আভাষ

'অবস্থতের অপলাপ' নামটা থেকে বোধ হয় আন্দাজ ক'রতে পারছেন না এর নিহিতার্থটা। ব'লতে কি, সাহিত্যের ঠিক কোন্ কোঠায় ফেলা যায় লেখাটাকে এ নিয়ে আমার নিজের মনেও খটকা নেহাত কম নয়। কথা-সাহিত্যের নানা প্রকারের মধ্যে হালফিল 'রম্যরচনা' নামটা খুব শোনা যাচ্ছে। শব্দটা যে শ্রুতিরম্য তাতে সন্দেহ নেই, আর কথা-বস্তুটা বচন-রচনা ছাড়া আর কিই বা। এর জাত্যর্থের পারিধিটাও তাই স্বভাবতই বেশ প্রশস্ত। তাই সব দিক ভেবে হালের এই নামটাই বেছে নিলাম এর বর্গীকরণের জন্য। প্রধান কারণ অবশ্য এই যে এর প্রকরণটা যে কি, কেউই প্রায় তা জানে না; তবে ওয়াকিবহাল মহল থেকে শুনেছি ধারাবাহিকতার ধার এতে ধারতে হয় না, আর সংহতির সূত্র-যোজনাও নিষ্প্রয়োজন। অ্যাল্‌বামের মত শুধু খোপের ফাঁকে ফাঁকে ছবিগুলো গুঁজে দিতে পারলেই দায় খালাস। গ্রন্থিহীন এই গ্রন্থের বর্ণিত আলেখ্যগুলিও অ্যাল্‌বামের ছবির মতই ছাড়া-ছাড়া। তবুও একটু বৈশিষ্ট্য বোধ হয় আছে এদের,—বিবিক্ত হ'লেও এরা রসরিক্ত নয়, আর যে রসটি আছে তা' নিছক রঙ্গের, ব্যঙ্গের নয়। আসলে, লেখাটা আগাগোড়াই অপলাপ অর্থাৎ বৈঠকী মেজাজে বলা পরিহাস-বিজল্পিত আলাপ। তবুও ছদ্মনামের আশ্রয় নিতে হ'য়েছে স্থানে স্থানে, ভুল বোঝাবুঝির হাত এড়াবার জন্যে। প্রবাহের মুখে কোথাও কোথাও গীতি-নর্মের আমেজ লেগেছে এর কারু-কর্মে; ক্বচিৎ হয়তো বা গীতিধর্মটাই প্রধান হ'য়ে বস্তু-ধর্মকে ফেলেছে ঢেকে। ভাল হোক, মন্দ হোক, এটাও এই গ্রন্থের আর একটা বৈশিষ্ট্য। নিজের কোলে এর বেশি ঝোল টানা শিষ্ট-সম্মত নয়; তাই এখানেই এই পরিচ্ছেদের ছেদ টানলে বোধহয় ভাল হ'তো; কিন্তু জের টানতে হ'লো আর একটু। ছাপা

শেষ হ'লে লেখাটার ওপরে চোখ বোলাতেই বোঝা গেলো ভেতরে ভুল র'য়ে গিয়েছে কিছু কিছু। খুঁটিয়ে না প'ড়লে সবগুলো ধরা প'ড়বে না। তবু ধরা যা' প'ড়েছে, তাই ধ'রে দিলাম আপনাদের সামনে। এ থেকে ধারণা করতে পারবেন ভুলগুলোর ধরন কি। "উহ্য" হয়েছে "উহ্" (পৃঃ ১৩৭, পং—২৬), "রসায়ন" হ'য়েছে "রসায়ণ" (পৃঃ ১৪৪, পং—১৯), "রসস্রুতি" হয়েছে "রসশ্রুতি" (পৃঃ ১৫৭, পং—শেষ), "প্রবাহিণী" হয়েছে "প্রবাহিনী" (পৃঃ ১৬৭, পং—৬) ; এ ছাড়া ছেদ-চিহ্নের বিচ্ছেদও ঘটেছে এখানে-ওখানে। আশা করি সহৃদয় পাঠক ভুলগুলো দেখে ভুল বুঝবেন না গোটা বইটাকে।

কর্মজীবন থেকে অবসর অবশেষে নিতেই হ'লো। পঞ্চান্ন বছর বয়সের পর সরকার আর চাকরিতে বাহাল রাখেন না। যতোই ডাঁটো থাকুন, পঞ্চান্নোর্ধ্বে বানপ্রস্থ আপনাকে নিতেই হবে। সত্যিই তো! ইস্কুল-কলেজ তো পিঁজরাপোল নয় যে কতকগুলো বুড়ো গোরুকে (গোরু ছাড়া আর কি? দশ বছর মাষ্টারি ক'রলেই শুনেছি গোত্বপ্রাপ্তি ঘটে!) পুরো মাইনেতে পুষতে হবে চিরকাল! অবিশ্যি সরকারি অন্য বিভাগের কথা আলাদা, সেখানে পাঁচ-সাত বছর 'এক্সটেন্শন্' যার তার যখন তখন হতে পারে। আর আপনি যদি নির্বাচনের গণ্ডি পার হ'য়ে বিধান-সভা কিংবা -পরিষদের সদস্য হতে পারেন, আর রাতারাতি 'আদ্দি' পাল্‌টে খদ্দর ধ'রতে পারেন —অর্থাৎ যদি উলট্-পাঞ্জাবি* হ'তে পারেন তা'হলে তো কথাই নেই; ধুঁকতে ধুঁকতে, হুমড়ি খেয়ে প'ড়তে প'ড়তেও যখের মত আমরণ মন্ত্রিত্বের গদি আগলে ব'সে থাকতে পারেন। স্থবিরত্বের জন্যে বুদ্ধিটা যদি স্থাবর হয়েই গিয়ে থাকে তাতেও ক্ষতি নেই। কিন্তু শিক্ষা-বিভাগ যেখানে দৌড়ঝাঁপের কোন বালাই নেই, পরিপক্ক বুদ্ধি এবং পরিণতজ্ঞানের যেখানে বিশেষ প্রয়োজন, সেখানে পঞ্চান্নর ওপর আর একটা দিন বাহাল থাকলেই সর্বনাশ! যাক্, না-হক্ গায়ের ঝাল ঝেড়ে আর লাভ কি? ইচ্ছে থাক আর নাই থাক, অবসর আমাকে নিতেই হ'য়েছে—আমার সামনে এখন আদিগন্ত ধূ ধূ ক'রছে অন্তহীন অবসর! কি ক'রে কাটবে জীবনের কর্মহীন এই দিনগুলি? কাজ না থাকলে খুড়োর গঙ্গাযাত্রা করার ব্যবস্থা আছে শুনেছি। কিন্তু খুড়ো না থাকায় আমার সে গুড়েও বালি! তবে উপায়?

* Turncoat শব্দের আধুনিক বাঙলা রূপ।

বিদায় যখন আসন্ন হ'য়ে এসেছিলো তখনকার মনের ভাবটা ঠিক বুঝিয়ে বলা শক্ত ; তবে এটা ঠিক যে কেমন যেন একটা অস্বস্তির ভাব মনটাকে পেয়ে ব'সেছিল—"ঘরেও নহে, পারেও নহে"—গোছের একটা অবস্থা। শুনেছি জেলখানার বনেদী কয়েদীদের নাকি মুক্তির খবর শুনেও চট্ ক'রে চট্‌কা ভাঙে না, ফাটকের ফটকের বাইরে এসেও তারা ফিরে ফিরে সেই দিকেই চায়। আমার অবস্থাটাও ছিলো কতকটা ওদেরি মত,—আনন্দ-বেদনায় মেশানো একটা অদ্ভুত মনের ভাব! এই ক' মাসে সে ভাবটা কেটেছে অনেকটা।

অবসরটা ক্রমেই গা-সওয়া হ'য়ে আসছে। এখন চিন্তা হয়েছে পেন্‌শন্‌টা কি ক'রে মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া যায়। বাঁচতে হ'লে দানাপানি দুটো পেটে দিতে হবে তো! সরকারি কর্মযন্ত্র যে শম্বুকের চেয়েও মন্থরগতিতে চলে সেটা সর্বজনবিদিত, সুতরাং বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। গল্পগাছা ক'রে, পান দোক্তা খেয়ে, বিড়ি সিগারেট ফুঁকে উদ্বৃত্ত সময় কিছু হাতে থাকলে তবে তো কাজ! দফতরে দফতরে দেদার লোক, গণ্ডায় গণ্ডায় অফিসার ; সব ব'সে ব'সে খোস মেজাজে খাসা আড্ডা জমাচ্চে। কে কার কড়ি ধারে! দেখে হিংসে হয়। যে সব ভাগ্যিবান মান-সম্মান খুইয়ে কেরানী-পুঙ্গবদের দুয়োরে ধর্না দিতে পারেন, তাঁদের কাজ হাসিল হয় একটু সহজে এবং সত্বর, অর্থাৎ বছর দেড়-দুই-এর মধ্যেই তাঁরা পেন্‌শন্ মঞ্জুরের আশা করতে পারেন। শোনা যায় দক্ষিণান্ত করতে পারলে,—কথাটা ঠিক বলা হ'লো না, দক্ষিণাটা অন্তে নয়, আদিতেই—দাক্ষিণ্যটা সঙ্গে সঙ্গেই লাভ হ'তে পারে। আহা! হবেই তো ; 'অ্যান্টি-কোরাপ্‌শন্'-এর যুগ পড়েছে যে! ঘেটুপুজোর দক্ষিণে আছে, আর কেরাণী পুজোর নেই! আমার মত অভাজন যারা—মুখে ছল, ট্যাঁকে বল, কোনোটাই নেই যাদের—তাদের শুধুই আঁকুবাঁকু ; কৈবল্য-প্রাপ্তির আগে পেন্‌শন্ প্রাপ্তির আশা করা তাদের বাতুলতা।

বটেই তো ; সরকারি নির্দেশনামায় স্পষ্টাক্ষরেই লেখা রয়েছে 'পেন্‌শন্‌-কেস্‌'-গুলো 'এক্সপিডিশাস্‌লি' অর্থাৎ তড়িঘড়ি করে ফেলতে হবে। অবিশ্যি যাঁতাকল থেকে বেরিয়ে 'গ্যাঁড়াকলের' আশ্রয় যারা নিতে পারে 'অনর্থ' অর্থের ভাবনা অন্তত তাদের ভাবতে হয় না। কিন্তু তিনকাল-উত্তীর্ণ শিক্ষকের পক্ষে বুড়ো বয়সে বড়ো বিদ্যের হাতে খড়ি তো আর সম্ভব নয়। কাজেই 'যা করেন খোদা মালেক' বলে নিষ্ঠুর নিয়তির হাতেই সঁপে দিতে হয় আপনাকে।

নতুন ক'রে বে-সরকারি কোন কলেজে চাকরির চেষ্টা অবিশ্যি আপনি করতে পারেন, কিন্তু সেখানেও 'সবুজ-শিঙ'-এর দল পথ আগ্‌লে শিঙ্‌ উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তরুণ খুন ঢুকিয়ে প্রতিষ্ঠান-গুলোকে চাংগা করবার চেষ্টাও চলেছে সর্বত্র। তাছাড়া 'চাট্‌পটা' আর 'গাংগুষ্ঠ'ই হচ্চে চাকরিজয়ের ব্রহ্মাস্ত্র-বৈষ্ণবাস্ত্র ; ও দুটি আয়ুধ হাতে না থাকলে শুধু অভিজ্ঞতা আর যোগ্যতার জোরে চাকরি পেতে শুনেছেন কাউকে ? আর ধরুন, দৈবাৎ যদি শিকে ছিঁড়েই পড়ে ; পাঁচ হাজার ছাত্রের এই সব কলেজে, দু-তিন শো ছেলের সামনে সমানে এবং স-মানে বক্তৃতা দেবার কলিজা আছে কজন বুড়োর ? এর ওপর আবার পান থেকে চুন খসলেই ওয়্যা ; ষ্ট্রাইক, বয়কট, এমন কি উত্তম-মধ্যমও অসম্ভব নয়। দেখেশুনে ওদিক আর মাড়াই নে, মশাই ! পুরানো ছাত্র দু'চার জন আসে মাঝে মাঝে, তাদের সঙ্গে পড়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যায় একটু আধটু, পরীক্ষার খাতাপত্রও দেখা যায় দু-চারখানা (দু' পয়সা আসেও তাতে) আর বাকী সময়টা এটা-ওটা লিখে কর-কণ্ডূতি চরিতার্থ করি। একটা বড়ো কিছু কাজ হাতে নিতে ভরসা হয় না : হরেক রকম বেগ-উদ্বেগে মন এমন অশান্ত যে অশ্রান্ত পরিশ্রমের জোর আর খুঁজে পাইনে নিজের মধ্যে।

এক একবার মনে হয় চাকরি-জীবনের শেষের কটা বছর কলকাতায় না এসে কেষ্টনগরেই যদি থাকা যেতো তা'হলে অন্তত

কৈলাস-কবিরাজের সান্ধ্য বৈঠকে আড্ডা জমিয়ে নিরবচ্ছিন্ন নৈষ্কর্ম্যের প্রায়শ্চিত্ত করা যেতো কিছুটা। কিন্তু অবশেষে সৃষ্টিছাড়া দেশে এসে পড়া গিয়েছে মশাই! না আছে কারো সঙ্গে তেমন মাখামাখি, না আছে নিরালা কোনো আড্ডার কোণ, যেখানে মন খুলে রসালাপ ক'রে দু-চার ঘণ্টা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দেওয়া যায়। এ এক আজব শহর —কেউ কারোর কড়ি ধারে না, উদ্দেশ্য ছাড়া একটি পাও ফেলে না, ছেঁদো কথা আর দেঁতো হাসি, এ আমার ধাতে সয় না। কলেজের অধ্যাপক যাঁরা, তাঁরা এলেন কলেজে নির্দিষ্ট সময়ের ঠিক দু'তিন মিনিট আগে—ট্রাম-বাসের গোলযোগ ঘট্‌লে ২।৫ মিনিট পরেও হয়তো বা—আর শেষ ক্লাসটিকে নিয়েই দিলেন ছুট অফিস ছুটির ভীড় জমবার আগেই বাস্ ধরবার তাগিদে; কাজের কথার ফাঁকে দুটো প্রাণের কথা বলবেন তার ফুরসত কোথায়? 'সময়-নিষ্ঠা' 'নিয়মানুবর্তিতা' শব্দগুলো বেশ গালভরা, শুনতেও নেহাত মন্দ নয়, কাজ হাসিলের দিক থেকে এদের প্রয়োজনও আছে হয়তো। কিন্তু কাজের মাঝে মাঝে অকাজের অবকাশ যদি না থাকে তা'হলে জীবন হয়ে ওঠে পান্থপাদপহীন মরুভূমির মতই অসহ্য। ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখের কথা মুখেই রেখে ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসার মধ্যে গাজুরি বাহাদুরি হয়তো আছে কিন্তু তাতে অন্তরের সায় নেই নিশ্চয়ই। সময় সময় আমার মনে হয় কোনটা বড়ো, ছুটি না ছোটাছুটি। ইংরেজের পাঠশালায় প'ড়ে আমরা মনে করি ছোটাছুটিটাই বুঝি কাজ, আর ছুটি তার উল্‌টো। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, কাজের প্রেরণা আছে ছুটির মধ্যেই—স্থিতির মধ্যেই আছে গতির ইংগিত।

নিজের সম্বন্ধে একটা বড়াই যদি করি আপনারা আমাকে মাপ করবেন মশাই। কলকাতার কলেজের সাধারণ নিয়ম ভংগ করে আমাদের কলেজে ছোটোখাটো একটা আড্ডার আখড়া আমি বসিয়েছিলাম। সভ্য সংখ্যা যে খুব বেশী কিংবা নিয়মিত ছিলো তা

নয়, তবে ক্লাসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে হাসিঠাট্টার একটা হাল্‌কা হাওয়া সেখানে বয়ে যেতো। ক্ষণিক গোষ্ঠি-সুখ অনুভব করবার একটা ঠাঁইও অন্তত হ'য়েছিলো। এখনো মাঝে মাঝে কলেজে যাই অবশ্য কাজের উপলক্ষ্যে, লক্ষ্যটা কিন্তু অকাজ—সংসার বিষবৃক্ষের অমৃতোপম দুটি ফলের একটি—'আলাপঃ সজ্জনৈঃ সহ'। মদিরার চেয়ে মধুরা এর ধারা—অপ্রমত্ত আনন্দের উৎস! কাজের পেছনে যারা দম-দেওয়া লাট্টুর অথবা টাট্টুঘোড়ার মত ঘুরছে অহরহ, আড্ডা রসের নির্যাসে যে কি মধু, তারা তার কি বুঝবে? অসূয়ক দার্শনিক 'ডাইওজিনিস্'-এর প্রশান্ত ঔদাস্যের ভাষ্য করা অশান্ত "অলীক-সুন্দরের"* কর্ম নয়। জাবের টবে বসে ভাবের জাবর কাটার যে সুখ, জবরদস্ত্ যুযুৎসুরা তার মুখও দেখেনি কোন দিন।

একটা সাধারণ ভুল এইখানে ভেঙে রাখি। আড্ডাধারীদের সমান-বয়সী হ'তেই হবে এমন কোন কথা নেই। মন থাকলে বিশ-তিরিশ বছরের ঘাটতি-বাড়তিতে বিশেষ কিছু এসে যায় না। খাঁটি আড্ডাবাজ যারা, শিঙ্ ভেঙে বাছুরের দলে মিশতে তাদের একটুও বাধে না। ভারিক্কি চাল আড্ডায় একেবারে অচল! এরকম একটা আদর্শ গণতন্ত্র আর কোথাও আছে কিনা জানিনে; অভিজাত নেই, 'বুর্জোয়া' নেই, 'প্রোলেটেরিয়ট্' নেই—সব একাকার। আড্ডা জিনিসটা বৃত্তি নয়, প্রবৃত্তি; পেশা নয়, নেশা। আড্ডার সাধারণ সূত্রই হচ্ছে—'তাতে কাত, মৌতাতে মাত'। মেজাজে থাকলে আমার তো সকলের সঙ্গেই কাঁধে মেলে—তিন পুরুষে একসঙ্গে বসে গোল ক'রে আড্ডা দিতে পারি, এতে সুবিধা বা অসুবিধা হচ্ছে এই যে আবেগ-উচ্ছ্বাস কখনই উদ্দাম হয়ে উঠতে পারে না। অপ্রকাশ্য কোন ভাব প্রকাশ করতে গেলেও বেশ ব্যঞ্জনার সঙ্গেই তা' করতে হয়। এতে ক'রে একদিকে ভাষার সংযম শিক্ষা হয়, অন্যদিকে

* অধ্যাপক বিধুবাবুকৃত 'আলেক্‌জাণ্ডার' নামের সংস্কৃত সংস্করণ

ভাবের ভব্যতাও আয়ত্ত হয়। শ্লীল ও অশ্লীল এ দুটো তো সামাজিক মানুষের কৃত্রিম বিভাগ; রস রসই—শুদ্ধ ও শাশ্বত; রসের মধ্যে যাকে আদিরস নাম দেওয়া হয় আমার মতে তা শুধু আদি নয়, অনাদিও বটে। এ কোন কালে ছিলো না তা কল্পনাও করা যায় না। প্রথম প্রস্তর-যুগ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত এর ধারা অব্যাহত বয়ে চলেছে, একদিনের জন্যেও তাতে ভাঁটা পড়েনি। কাজেই আড্ডার মুখে যদি আদিরসাত্মক কিছু উঠেই পড়ে, তাতে লজ্জা পাবার কারণ নেই ; শুধু সেটাকে কলাকৌশলে ঢেকেঢুকে এমন চোস্ত্ করে প্রকাশ করতে হবে যে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙ্বে না, অর্থাৎ কথাটা বলে নেওয়াও হবে, অথচ শালীনতাও ক্ষুণ্ণ হবে না। বড়ো বড়ো শিল্প-কৃতি সম্বন্ধেও এ উক্তি সমান সত্য। প্রকৃতির নগ্নরূপকে আবরণ ও আভরণ দিয়ে সাজানোই তো ললিত কলা—ব্যথাকে সুষ্ঠু কথা দেওয়াই তো শ্রেষ্ঠ কাব্য! তুচ্ছ কথাও উচ্চ হয়ে ওঠে সাজানোর গুণে, যা তথ্য মাত্র তা সত্য ও সুন্দর হয়ে ওঠে শুধু কথার কর্তবে। বনেদি বৈঠকে এই বাক্-শক্তির অতর্কিত বিকাশ লক্ষ্য করলে সময় সময় অবাক হয়ে যেতে হয়। তা'ছাড়া, গুণিজনের আসরে কথা-বার্তার মধ্যে দিয়ে নানাবিষয়ে জ্ঞান-আহরণের সুযোগও নেহাত কম হয় না। বিদগ্ধজনের মজলিসে 'আন কথা'র চেয়ে 'কান কথা'ই তো অধিক প্রত্যাশিত! আমার নিজের জীবনেও আমি এই সব রস-সত্র থেকে রসের রসদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার সূত্রও কম পাইনি। কিন্তু বৈঠকের আসল উদ্দেশ্যই মাটি হয়ে যায় যদি একে কেবল কাজের কথা দিয়েই ভরে তোলা যায়, যদি কাজের কথার অবকাশে বাজে কথার আল্‌কো হাওয়া উঠে জমাট গুমোটকে সরিয়ে না দেয়। যেখানে হাসি নেই, আনন্দ নেই—নেই দাক্ষিণ্যের স্পর্শ, সেটা তর্ক-চক্র হ'তে পারে, বিবুধ-সভা হতে পারে, কিন্তু তা আড্ডা নয়।

একটা রাজ্য স্থাপনার চেয়ে একটা ছোটোখাটো আড্ডা-পীঠ-প্রতিষ্ঠাকে জনকল্যাণের দিক থেকে আমি ঢের বড়ো ব'লে মনে

করি। আড্ডা-স্থাপনায় মারামারি কাটাকাটি নেই—নেই সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রশ্ন। অসূয়ার বন্ধ হাওয়ায় আড্ডার হয় অকালমৃত্যু। প্রাচীন রাজাদের বয়স্য ও বিদূষক থাকতো। দুষ্মন্তের ছিলো, কৃষ্ণচন্দ্রেরও ছিলো। কিন্তু কেন? এর নিহিতার্থ কি? কঠিন রাজকার্যের পরে বিরল অবসরে অন্তরংগ পরিকরের মধ্যে জীবনকে সহজ স্বরূপে দেখে নেওয়া। সাদা ডাল-ভাত কিংবা পোলাও-কালিয়ার পরে একটু চাটনির টাক্না দিয়ে মুখ বদলানো আর কি—প্রাত্যহিক জীবনের মরচেগুলো রসের রসান দিয়ে মেজে নেওয়া। বয়স্য যাঁরা থাকতেন বেতনভুক্ ভৃত্য হলেও, মজলিস্-মাইফেলে রাজার সমকক্ষ বলেই গণ্য হতেন তাঁরা; রূঢ় তিক্ত কথাও গূঢ় রসে সিক্ত ক'রে বলতে কুণ্ঠিত হতেন না। শুধু রহস্য-পটু হলেই ভালো বয়স্য বা বিদূষক হওয়া যেতো না। তাঁদের মধ্যে থাকতো সেই প্রতিভা যা কথা দিয়ে, ব্যক্তিত্ব দিয়ে একটা হাসির আবহ সৃষ্টি করতে পারে; রসের ভিয়েন করতেন তাঁরা বয়ানের সংগে প্রীতির ময়ান দিয়ে। বিদূষক শব্দের পারিভাষিক অর্থ যাই হোক, এর মৌলিক অর্থ হচ্চে দোষ ধরে যে, দূষণই যার স্বভাব। বাস্তবিক, রাজা-মহারাজার দোষ ধরতে এবং প্রকারান্তরে তাঁদের শিক্ষা দিতেও এঁরা পিছ-পা হতেন না। গোপাল ভাঁড় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তার সহজাত রহস্য পরিহাস-পটুত্বের জন্যে। যে সব শাণিত ও রঞ্জিত উক্তি আজও তাঁর নামে চলে আসছে তা থেকে প্রমাণ হয় তাঁর আশ্চর্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এবং নট-নৈপুণ্যের। উক্তিগুলির মধ্যে কতগুলি তাঁর নিজস্ব, আর কতগুলিই বা তাঁর ঘাড়ে চাপান হয়েছে এতদিন পরে তা নিশ্চিত করে নির্ণয় করা শক্ত। হয়তো এমন উক্তিও দু' চারটে আছে যা ঠিক রুচি-সম্মত নয়। কিন্তু একথা সত্য, যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষক রাজার নামকে ছাপিয়ে নিজের নামকে তুলে ধরতে পেরেছেন তাঁর ব্যংগ-ও-রংগ-নৈপুণ্য যে অনন্য ছিলো তাতে সন্দেহ নেই। গোপাল ভাড় শুধু রসিক ছিলেন না,

ছিলেন রসস্রষ্টা—নদীয়া রাজ্যের আড্ডাব আদি জনক। শিক্ষা-দীক্ষা হয়তো তাঁর খুব বেশী ছিলো না, কিন্তু ছিলো রসাস্বাদনের ও রসস্রাবণের অপূর্ব রসনা। ভণ্ড অর্থে তিনি ভাড় ছিলেন না, তিনি ছিলেন রসের ভাণ্ড, আকর বা আধার। কিন্তু তিনি শুধু রসস্রষ্টা নন, রসিক-স্রষ্টাও বটে—একটা স্কুল বা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। কথানুসঙ্গে বিষয় থেকে দূরে এসে পড়েছি, এইবার প্রসঙ্গে ফেরা যাক্।

হাতে কাজ নেই, অখণ্ড অবসর। এটা ওটা করি, লিখি পড়ি; কিন্তু মন বসে না উড়ু উড়ু করে, কি যেন চায় অথচ পায় না, তাই সে উন্মনা। মাঝে মাঝে যথাশক্তি পেন্‌শনের তদ্বির করি, যেহেতু এ যুগে সব রকম বীরের মধ্যে তদ্বির-বীরের (কার্লাইল এদের নাম জানতেন না) আসনই সকলের আগে। কাজে অকাজে পথে বেরিয়ে পড়ি—কোথায় যাবো কিছুই ঠিক না করে। লক্ষ্যহীন বৃথাভ্রমণের শেষে ট্রাম বা বাস থেকে নেমে পড়ে দেখি পুরনো সেই কলেজের সামনেই হাজির হয়েছি। সম্মোহিত ব্যক্তি যেমন অন্যের প্রভাবে চালিত হয়, আমারও সেই দশা; অর্থাৎ সজ্ঞান আমি অজ্ঞাত কোন অন্য আমির প্রভাবে চালিত হ'য়ে এসে পৌঁছয় ঠিক কলেজেরই গেটের সামনে। বোধ হয় বিনিমাইনেয় পডাতে পেলেও বর্তে যাই। অভ্যাস এমনি জিনিস। কলুর বলদকে চোখের ঠুলি খুলে ফাঁকা মাঠে ছেড়ে দিলেও সে ঘানির চারিদিকেই ঘুরপাক খায়। অথচ অন্য কোথাও পড়াবার কথা কল্পনা করেও যে বেশ স্বস্তি পাই তাও নয়। অপরিচয়ের একটা বাধা বারবার ভয় দেখায়। যা হোক্, কলেজে ঢুকে পড়ি; বন্ধুদল সহৃদয় অভ্যর্থনা দিয়ে আপ্যায়িত করেন; মাঝখানে-অল্প-বেত-ছেঁড়া একখানা ঈজি-চেয়ার ছেড়ে উঠে কোন বন্ধু হয়তো সসম্মানে আমাকে বসান। আমি হেসে বলি, চেয়ারখানা বেশ 'Commodious'; শব্দটিকে তাঁরা আসল অর্থেই নেন, তবু একটু হাসেন। বেতের ফাঁকটা দেখিয়ে

ঘুরিয়ে বলি—কমোডের কাজ ভালোই চলে। এইবার তাঁরা হো হো করে হেসে ওঠেন। এইভাবে সেখানে দস্তুরমত খুঁটি গাড়ি। কেউ উঠে যান ক্লাসে যাবেন ব'লে, ক্লাস থেকে ফিরে এসে কেউ বা ব'সে যান খালি একখানা চেয়ারে আমার পাশে; আমার তো আর ক্লাসের বালাই নেই—গানের আস্থায়ীর মত আমি থেকে যাই একজায়গায় অনড় অটলভাবে, অন্তরা সঞ্চারীর দল ঘুরে ফিরে আসে আমারই পাশে। হপ্তায় এক আধদিন এমনি প্রায়ই ঘটে। কিন্তু এমন ক'রে তো চিরকাল চলবে না: মায়া একদিন কাটাতেই হবে, আবার হয়তো ডেরা বাঁধতে হবে অন্য কোথাও। সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে চেয়ে মনটা অত্যন্ত অব্যবস্থিত। এক একবার ভাবি গোয়াড়ী গিয়েই থাকি না হয়; জীবনের শ্রেষ্ঠ বাইশটা বছর কেটেছে যে মাটিতে, বাকী ক'টা দিনও না হয় কাটুক সেইখানেই। দেশে (শান্তিপুরে) গিয়ে বাস করবো সে কথাও ভাবি এক একবার, কিন্তু কেন জানি না ভেতর থেকে খুব সাড়া পাইনে। চার্লস্ ল্যাম্ব্ অবসর নেবার পর তাঁর পুরানো অফিসে গিয়েছিলেন মাত্র দুবার, আর আমি গিয়েছি আমার কলেজে এই আট মাসে অন্তত আট দুগুণে ষোল বার। পুরানো পরিবেশ আমাকে টানে যেমন ক'রে চুম্বক টানে লোহাকে—দীপশিখা টানে আলোকলোলুপ পতংগকে। এই গুণহীনকে যাঁরা বেঁধেছেন তাঁদের প্রীতির 'গুণে', তাঁদের কাছে আমার ঋণের ভরা ক্রমেই ভারি হয়ে উঠছে। শোধ করবার স্পর্ধাও নেই, প্রবৃত্তিও নেই, যা অপরিশোধ্য তা পরিশোধের প্রয়াস করে লাভ কি? আর একটা বিষয়েও ল্যাম্বের সঙ্গে আমার তফাৎ আছে; চাকরি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অবসরান্তিক বৃত্তি হিসাবে পেয়েছিলেন বেতনের তিন চতুর্থাংশ; আর আমি পাব মাত্র এক-তৃতীয়াংশ, তাও জীবদ্দশায় কিনা কে জানে!

ইচ্ছা ছিল, যদি বাঁচি, আর বেঁচে থেকে পেন্‌শন্-ভোগের দুর্লভ সৌভাগ্য যদি নেহাতই ঘটে, তবে বাণী-সাধনার চেষ্টা করবো

সাধ্যমত। খাতার পাতায় আখরের আঁচড় কেটে নিত্যকালের মনের ফসল ফলাবো সে দুরাশা অবশ্য আমার নেই—চোখের দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝাপসা হ'য়ে এসেছে মনের দৃষ্টিও ; তাই ভয় হয় আমি রেখে যাব বড় জোর জলছবির ছাপ, যা হয়তো দু' দিনেই যাবে মিলিয়ে। 'সোঁতের শেহলী'—ভাসতে ভাসতে কোন ঘাটে গিয়ে ঠেকবো, না শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভেসেই চলতে হবে, তা ব'লতে পারেন শুধু তিনিই, মানুষের দৃষ্টির আড়াল থেকে যিনি তার ভাগ্য নিয়ে ক'রছেন খেলা। "হাস্য মুখে অদৃষ্টেরে ক'রবো মোরা পরিহাস"—এ কথা বলবার সাহস কোথায় ? তাই ইংরেজ কবি মার্‌লোর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি—

It lies not in our power to love or hate,
For will in us is overruled by fate'.

'ঘৃণা-ভালোবাসা নয় মানুষের হাতে ;
মানুষের ইচ্ছা চলে নিয়তির সাথে।'

রবি-কবির ভাষায়,—

'আজ গড়ি-খেলা-ঘর, কাল তারে ভুলি,—
ধূলিতে যে লীলা তারে মুছে দেয় ধূলি।'

জীবন-পথের প্রান্তে পৌঁছে মনের মান-মন্দিরে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখছি ফেলে-আসা পথের দুধারে কত না বিচিত্র চিত্র সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ছায়া-চিত্রের পটে মায়া-ছবির মত। কত না হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা মিশে আছে এদের সঙ্গে কে তা নির্ণয় করে? এদের কোনটা ম্লান, কোনটা বা উজ্জ্বল। কিন্তু যেমনই হোক, কী এক অনির্ণেয় আকর্ষণে এরা আমার মনকে টানে সেই বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি-চিত্রগুলির দিকে। ঘটনার গুরুত্ব দিয়ে এদের গুরুত্বের পরিমাপ করা যায় না। কোন একটি ছোট ঘটনাও মনের ওপর এমন গভীরভাবে দাগ কেটে যায় যে তার রেখালেখ্যটি মন থেকে সহজে মোছে না। আবার জীবনের অনেক ক্রান্তিকারী ঘটনাও সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই কেন যে মিলিয়ে যায়, সে রহস্যের উদ্‌ভেদ করা সহজ নয়। যে কারণেই হোক আমার জীবন-পথের কতকগুলি বিচিত্র-কাহিনী আজও আমার মনে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে।

বোধ হয় ১৯০৭ কি ৮ সাল, আমরা পাটনা থেকে এসে স্থায়িভাবে শান্তিপুরে দেশের বাড়িতে বাস করতে লাগলাম। ভর্তি হ'লাম মিউনিসিপাল স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে। আর এক প্রস্থ নতুন বই কেনা হ'লো। মনটা বেশ খুশী, তবু ক্লাসে ঢুকতে বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করতে লাগলো। কে জানে শিক্ষক মশায়ের মেজাজ-মর্জি কি রকম, তিরিক্ষি না হ'লেই রক্ষে। ক্লাসে ঢুকেই বুঝলাম যা ভয় করেছিলাম তা নয়; শিক্ষক আনন্দবাবু (আন্দমাষ্টার নামেই তাঁর পরিচয়) গোমড়ামুখ হ'লেও ভেতরে ভেতরে তাঁর রসকস ছিলনা তা নয়। পাশের ছেলেটির সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখে বার কয়েক জিবের ডগা কামড়ে, আর চোখের ভোঁয়া ছিঁড়তে

ছিড়তে কতকটা ভ্যাঙ্‌চানির ভঙ্গিতে বলে উঠলেন "তুমি যে বাবা পুঁজির ওপর হ'লে।" প্রথম দর্শনেই এই ভর্ৎসনার সংবর্ধনা পেয়ে মনের উৎসাহের ব্যারোমিটারটা নিম্নতম পারদ-রেখায় নেমে গেলো। পরের দিন আমাকে স্কুলে পাঠাতে বাড়ির লোকদের যে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল সে কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। পঞ্চম শিক্ষক হরিবাবু ছিলেন বেশ একটু খেয়ালী ; কখনো চেয়ারে বসে পড়াতেন না, পড়া নেওয়ার চেয়ে পড়া দেওয়াই পছন্দ করতেন বেশি। পড়াতে পড়াতে উৎসাহ ভরে মেঝে থেকে চেয়ার এবং চেয়ার থেকে টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়াতেন। কে কি ভাবছে না ভাবছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করতেন না। কোনো ছাত্রকে মারতে তাঁকে দেখিনি কখনো। কিন্তু হঠাৎ একদিন বিপর্যয় ঘটে গেলো। ক্লাসের কোন একটি ছেলে কাগজের ওপর একটা অশ্লীল ছবি এঁকে তার অন্তরঙ্গ অন্য একটি ছেলের কাছে চালান ক'রলো। চালাচালির পথে জানাজানি হয়ে গেলো ; শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা সচিত্র শিক্ষক মশায়ের গোচর হ'লো। ছবিখানা হাতে আসতেই স্বভাবত শান্ত ও সংযত মানুষটি ক্রোধে যেন ফেটে পড়লেন। অফিস থেকে ছাঁচি বেতগাছা আনিয়ে দুষ্কৃতিকারী ছেলেটিকে আপাদমস্তক এমন প্রচণ্ড প্রহার করলেন যে সেই ফুটফুটে ফরসা ছেলেটির সর্বাঙ্গ রুধির ধারায় রঞ্জিত হয়ে উঠলো। ভদ্রলোকের এই রুদ্রমূর্তি এবং মার খাওয়া ছেলেটির এই মর্মান্তিক দুরবস্থা দেখে আমরা তো ভয়ে কাঁটা। এর পরে ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছিল, আর এরই সূত্র ধরে শিক্ষক মশায়কে পদত্যাগও করতে হ'য়েছিল।

শিক্ষক যতীনবাবু পড়াতেন ইংরাজি সাহিত্য ও ব্যাকরণ। পাঠ্য ছিল লেনি সাহেবের গ্রামার। একটি দুটি ক'রে Syntax-এর সূত্র ধরে পড়া দিতেন প্রত্যহ এবং পড়া আদায় করতেন কঠোর ভাবে। প্রত্যেক ছেলেকে আসতে হ'তো তাঁর টেবিলের কাছে, আর অনুশীলনী সহ গোটা পড়াটা উগ্‌লে দিতে হ'তো। প্রতিটি

ভুলের জন্যে বরাদ্দ ছিল করতলে হাল্‌কা বেতের এক এক ঘা। পদ্ধতিটা এখনকার যুগে একটু স্থূল ও মনোবিজ্ঞান-বহির্ভূত ব'লে মনে হতে পারে বটে, কিন্তু ফলটা পাওয়া যেতো হাতে হাতে। Dr. Johnson-এর একটা বক্রোক্তির কথা মনে পড়ছে এই প্রসঙ্গে। গুণপক্ষপাতী কোনো এক ব্যক্তি একদিন তাঁকে গ্রীক-লাটিনে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের হেতুকি জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করেছিলেন, "শিক্ষক মশায় বেত্র ব্যবহারে কুণ্ঠিত হন নি বলে।" শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্যে ইদানীং কস্‌রত ও কেরামত তো নেহাত কম দেখান হচ্চে না, কিন্তু মগজ-মেরামতের কাজ কি এতে একটুও এগিয়েছে? ভোজবাজী দেখানর এই দুরন্ত চেষ্টায় ছেলেমেয়েরা ডিগ্‌বাজীই খাচ্চে বেশী করে। সাহিত্যের ক্লাসে যতীনবাবুর পাঠন-পদ্ধতি ছিল মনোজ্ঞ ও মনে রাখবার মত। বিশেষ দৃষ্টি দিতেন রীডিং পড়ার ওপর। পাঠের সময় স্বরাঘাত ও শ্বাসাঘাত নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিবৃত্ত হতেন না। পড়ার ধরণ দেখেই বুঝে নিতেন বোঝার বহর। শিক্ষক মশায়ের নিজের উচ্চারণ ছিল বিশুদ্ধ; intonation-এর কায়দা-করত্‌ব না দেখিয়ে তিনি accentটা যথাসম্ভব নিখুঁত করার পক্ষপাতী ছিলেন। সে যুগে পাড়াগাঁয়ের ছেলেদের ইংরাজি উচ্চারণ ছিল অপূর্ব। হ্রস্ব 'u' কে 'অ' উচ্চারণ করা ছিল এক টা মজ্জাগত ব্যাধি; জষ্ট্‌, কট্‌, ফগু, পব্‌লিক্‌ প্রভৃতি তখনকার ছেলেদের মুখে মুখে হামেসাই শোনা যেতো; শব্দের বিশেষ কোন অক্ষরের (syllable) ওপর জোর দিয়ে উচ্চারণ করার নিয়ম সম্বন্ধে প্রায় কোন ছেলেই অবহিত ছিল না। ফলে credit, edit, benefit, profit কিংবা differ প্রভৃতি ক্রিয়াপদের অন্তে কালবাচক 'ed' যোগ করলে অন্ত্যব্যঞ্জনগুলির দ্বিত্ব হচ্ছে না কেন, acquit, admit, commit, defer, refer প্রভৃতির বে[illegible]য় হচ্ছেই বা কেন, সেটা ছেলেদের অনায়ত্ত থেকে যেত,—ফলে সংশোধ্য অশুদ্ধির সংখ্যা অকারণে যেত বেড়ে। সাধারণ ভাবে ফলপ্রসূ না হলেও এই

শিক্ষায় শিশিক্ষু ছাত্ররা উপকৃত হয়েছিল বিশেষভাবে। নিয়মানুবর্তিতার দিকেও তাঁর নজর ছিল কড়া। টুকিয়ে ছেলেরা তাঁকে ভয় করত যমের মত। তাঁর সন্ধানী দৃষ্টির আলোয় নকলনবীশদের গুহ্যতম কৌশলও ধরা পড়ে যেতো। ধরা পড়লে আর রেহাই ছিল না। বয়স চল্লিশের দিকে গড়ালেও তাঁর শক্তি ছিল প্রচণ্ড। দুর্দান্ত ধেড়ে কার্তিকদেরও শাস্তি দিতেন অকুতোভয়ে; প্রয়োজন হলে বড় বড় ছেলেদেরও রগের দু'পাশ দুই করতল দিয়ে মক্ষম করে চেপে ধরে একেবারে শূন্যে তুলে আছাড় দিতেন।

একটি বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে না বললে তাঁর চরিত্র-চিত্রণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেকালের শিক্ষকরা অর্থের বিনিময়ে ছাত্রদের বাড়িতে পড়াতেন বটে, কিন্তু নিছক ব্যবসাদারি ছিল না সেটা এখনকার মত। ছাত্রদের শেখাবার প্রবৃত্তিটাই বৃত্তির চেয়ে বড় ছিল তাঁদের কাছে। একটা ঘটনার উল্লেখ করি এই প্রসঙ্গে। একই ক্লাসের দুটি ছাত্র—আমাকে ও পরানকে—তিনি বাড়িতে পড়াতেন যথাক্রমে রাতে ও সকালে। একদিন আমাকে বললেন—"ছাখ্, একটা কাজ করলে হয়। তুই সকালে পরানদের বাড়ি আয়। আমি রাতে পরানকে সঙ্গে নিয়ে তোদের বাড়ি যাব। তাহলে তোদের দুজনকেই দুবেলা পড়াতে পারব।" ছাত্রের ইষ্টের প্রতি এই যে কল্যাণ দৃষ্টি, আধুনিক কালে তা প্রায় বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না। একবার তিনি বলেছিলেন যে বার্ষিক পরীক্ষায় আমরা প্রথম দুজনের মধ্যে হতে পারলে তিনি আমাদের পুরস্কার দেবেন। মনে আছে, পরীক্ষায় আমি প্রথম হওয়ায় একমাসের প্রশিক্ষণের দক্ষিণা ব্যয় করে তিনি আমাকে একটি 'সাইমা' ঘড়ি কিনে দিয়েছিলেন।

এরপর দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠে শিক্ষকরূপে পেলাম নন্দবাবুকে। ছোটখাট আঁটসাঁট রাশভারী মানুষ। মুখমণ্ডল ঘন কালো নীরন্ধ্র চাপদাড়িতে সমাচ্ছন্ন। জোড়া ভুরুর নীচে একজোড়া ঈষৎ রক্তাভ জ্বলজ্বলে চোখ। পড়াতেন গণিত আর ভূগোল; অধ্যাপনা কৌশল

ছিল অনন্য। বিষয় দুটিতে তাঁর অধিকার ছিল অবিসংবাদিত। প্রধান শিক্ষক বিশুবাবু ছিলেন একেবারে সদাশিব—হাড়ে হাড়ে বৈষ্ণব—তৃণাদপি সুনীচ আর তরুর মতই সহিষ্ণু। গুরুতর অপরাধেও ছাত্রদের শাস্তি দিতে ইতস্তত করতেন। কাজেই স্কুলের নিয়মশৃঙ্খলা অব্যাহত থাকতো প্রধানত নন্দবাবুরই ব্যক্তিত্বের প্রভাবে। অথচ আশ্চর্য এই যে ছেলেদের শাস্তি দিতেন তিনি খুবই কম,—মারতে তো তাঁকে কেউ দেখেই নি কখনও। ক্লাসে ছেলেরা চুলবুল করলে জলদ-গম্ভীর প্লুত স্বরে শুধু একটি হাঁকাড় দিতেন 'আঃ' বলে। বাস্ তাতেই কাজ ফতে। বিক্ষুব্ধ বারির বুকে কে যেন তেল ঢেলে দিত—তরঙ্গায়িত কল-কল্লোল মুহূর্তে হয়ে যেতো স্থির ও শান্ত।

একটা কৌতুককর ঘটনার কথা মনে প'ড়ছে এই প্রসঙ্গে। পরীক্ষাকালে আরক্ষণ-ব্যবস্থা কেমন ছিল সেকালে তার একটি পার্শ্ব-চিত্র পাওয়া যাবে এ থেকে। শিক্ষার সঙ্গে পরীক্ষার যোগ অঙ্গাঙ্গি, তাই এর উল্লেখ না ক'বলে অঙ্গহানি ঘটবে শিক্ষা-প্রসঙ্গের। এ থেকে বুঝে নিতে দেরি হবে না সেকালের সঙ্গে একালের পরীক্ষা-ব্যবস্থার পার্থক্যটা কোথায় এবং কতটা। সোডার বোতল অপ্রতুল ছিল না সেকালেও, কিন্তু শুধু পানীয়রূপেই ছিল এর ব্যবহার,—প্রহারের প্রহরণ-রূপে নয়। আরক্ষকের ললাট লক্ষ্য ক'রে প্রক্ষেপের অভিনব আধুনিক আঙ্গিকটা তখন অজ্ঞাত ছিল ছাত্রদের। মসী ও মস্যাধারের ব্যবহারও সীমাবদ্ধ ছিল লেখার মধ্যেই—অঙ্গরাগরূপে এর ব্যবহার পুরোপুরি এ যুগের।

সেদিন সংস্কৃত পরীক্ষা ; পরীক্ষাস্থল রিভার্স টমসন হল। প্রধান আরক্ষক নন্দবাবু স্বয়ং, প্ল্যাটফর্মের ওপর অটল আসনে অধিষ্ঠিত। হলের অন্যপ্রান্তে সীমান্ত রক্ষা করছেন অন্য একজন শিক্ষক। হলের মাঝামাঝি আমাদের পাড়ার সুশান্তের আসন। বলা দরকার সুশান্ত একজন স্বভাব-টুকিয়ে। কিন্তু নকলনবিশ হলেও প্রস্তুতির তোড়জোড়ের অভাব নেই তার একটুও ; পরীক্ষার ঠিক আগে পড়ার

'টেম্‌পো' চড়ে গিয়েছে বেশ কয়েক ডিগ্রী। রাত্রি যত বাড়ে, পড়ার চাড়ও তত চড়ে। প্রস্তুতির প্রতিযোগিতা চলে তার ও-পাড়ার ননীর সঙ্গে সারারাত ধরে। জাগ্রত পল্লীর মৃদু মুখরতা নিশীথ নৈঃশব্দের মধ্যে তার বাণী হারায়—সুষুপ্তির শান্তি নেমে আসে পল্লীর বুকে। সেই শান্তি অনুবিদ্ধ হয় দুটি শব্দসূচীর দশনদংশনে। আম্রকুঞ্জের ওপার থেকে ভেসে আসে খাদের গলার ননীর সিংহনাদ, এপারে শোনা যায় সুশান্তের অশ্রান্ত কলগুঞ্জন। ওদিকে চলে "জীবানন্দ গদগদস্বরে, জীবানন্দ গদগদস্বরে", এদিকে শোনা যায় "this will be found in the next chapter, this will be found in the next chapter"। পরীক্ষা শুরুর সাতদিন আগে থেমে যায় সুশান্তের অভ্যস্ত গুঞ্জন—শুরু হয় জরুরি প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখার নিভৃত প্রস্তুতি। ঠোঁটস্থ বস্তু পকেটস্থ হলে তবেই না আশ্বস্ত হওয়া যায়। সে যা হোক, পরীক্ষার হলে সুশান্তকে সেবার নিতান্ত অশান্ত দেখে নন্দবাবু জলদনির্ঘোষে আদেশ করলেন—"সুশান্ত, ওখান থেকে উঠে এসে আমার সামনের বেঞ্চিতে বসো।" অমোঘ আদেশ। সুশান্তর তখন সসেমিরা অবস্থা। খাতার মধ্যে বিরাট গন্ধমাদন, জানকীবাবুর কেঁদো মানের বই। সেটাকে সামলাতে গিয়ে খাতার ফাঁক দিয়ে গন্ধমাদন সশব্দে একেবারে মেঝের ওপর উপুড়। "সুশান্ত ওটা কিসের শব্দ"—নন্দবাবুর এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই পাকা ফুটবল খেলোয়াড় সুশান্ত এক ড্রপ্‌সটে মা সরস্বতীকে চালান করে দিয়েছে প্ল্যাটফর্মের নীচে। নন্দবাবু সব দেখলেন; একটি ছেলেকে ডেকে বললেন "দেখো তো, কি চালান করলো তলায়।" মানের বইটা বেরোতে দেরী হল না। ফলে, প্রথমে তিরস্কার, পরে বহিষ্কার ও জরিমানা। সুশান্তর শিক্ষা-জীবনের পূর্ণচ্ছেদ পড়লো এইখানেই। টোকার প্রসঙ্গে মনে প'ড়ে গেলো আমাদের প্রবীণ শিক্ষক বিহারীবাবুর একটি বক্রোক্তি—"তোমাদের প্রমোশন তো বাবা, শীতবস্ত্রের সাহায্যে; ব্যাপারটা

আসলে ব্যাপারের। হোক্ দেখি পরীক্ষাটা গরম কালে, দেখি কেমন ক্লাসে ওঠো।"

সবশেষে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশ্বেশ্বর দাসের (বিশুবাবু নামেই তাঁর পরিচয়) কথা বলে এই পরিচ্ছেদের ছেদ টানবো। দাস মহাশয়ের শিক্ষক-জীবন সুরু হয় এই স্কুলে এবং এইখানেই হয় সারা। প্রায় বছর চল্লিশ সংস্পৃষ্ট ছিলেন এর সঙ্গে। মিউনিসিপাল স্কুল থেকে অবসর নেওয়ার পরে মাস কয়েক সুতরাগড হাইস্কুলে এবং মায়াপুর গৌড়ীয় মঠের হাইস্কুলে বোধ হয় বছর খানেক প্রধান শিক্ষকের কাজ করেছিলেন অনুরোধে পড়ে। কিন্তু এই সিদ্ধকাম শিক্ষকের নাড়ীর যোগ ছিল সাধন-পীঠ মিউনিসিপাল স্কুলের সঙ্গে। আমরণ তিনি আপ্রাণ সেবা ক'রে গিয়েছেন এই প্রতিষ্ঠানের। অর্থের কামনায় কিংবা যশের লালসায় ব্রতভ্রষ্ট হননি কোন দিন। স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন তৃতীয় শিক্ষকরূপে, ক্রমে অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার জন্যই পেয়েছিলেন প্রধান শিক্ষকের পদ। বিদ্যার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল উদগ্র, ছাত্রদের ভালবাসতেন প্রাণ দিয়ে। কলেজে শিক্ষালাভের সৌভাগ্য তার হয়নি ; স্কুলে কাজ করতে করতেই পাস করেছিলেন এফ্. এ., বি. এ.। ইংরাজিতে এম্. এ. পরীক্ষাও দিয়েছিলেন কয়েকবার, কিন্তু উত্তীর্ণ হ'তে পারেন নি। অনেক জানার জন্যে অনেক লিখতে গিয়ে দিশা হারিয়ে ফেলতেন, সব প্রশ্নের উত্তর লেখাই হয়ে উঠতো না। অথচ রচনার পত্রে প্রতিবারই প্রথম বিভাগের অর্থাৎ ষাটের উপরে মার্ক পেয়েছেন। ভাষার ওপর দখল ছিল তাঁর অসাধারণ,—ইংরাজি, বাংলা দুইই লিখতেন সুন্দর। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রীতিও ছিল রীতিমত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্ম-ভাবে সংস্কৃতে প্রথম হয়েছিলেন। তাঁর পড়ানোর ধরণটা ছিল নিজস্ব, পাস করানোর চেয়ে শেখানোর দিকেই ছিল তাঁর লক্ষ্য,—শেখানো বললেও ঠিক বলা হয় না, তিনি চাইতেন জ্ঞান-রাজ্যের সিংহদ্বার

ছাত্রদের মনের সামনে খুলে ধরতে। এদিক দিয়ে সফলতাও লাভ করেছিলেন নিঃসন্দেহে। ল্যাম্ব্-এর Tales from Shakespeare পড়াতে পড়াতে মূল নাটকগুলি এনে আমাদের প'ড়ে শোনাতেন। এতে রূপান্তরিত রচনার মুন্সিয়ানা স্পষ্ট হ'য়ে উঠতো, আর সেই সঙ্গে বিশ্ববরেণ্য নাট্যকার-কবির ভাব-বৈভবের পরিচয়ও পাওয়া যেতো কিছু কিছু। ইংরাজিতে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক কিছু ছিল না ; দ্রুত পঠনের জন্য বিহিত ছিল স্কট্ অথবা অন্য কোন কোন বিশ্রুত ও বিশিষ্ট লেখকের গ্রন্থ। আরভিঙ্-এর Rip van Winkle, The Legend of Sleepy Hollow ও Christmas Eve, স্মাইল্স্-এর Self-help ও Character প্রভৃতি ক্লাসে পড়িয়েছিলেন,—বেশ মনে আছে। ভাষা শেখানোর ব্যাপারে তিনি অনুবাদের ওপরই জোর দিতেন বেশি করে ; (ব্যাকরণের বেলায় জোর দিতেন parsing-এর চেয়ে analysis-এর ওপর, এছাড়া ম্যাক্মর্ডির Idiom-এর বইটা তিনি পড়িয়েছিলেন খুঁটিয়ে)। নিত্য ক্লাসে বাঙলা থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ ক'রতে দিতেন এবং প্রত্যেকটি খাতা ক্লাসেই দেখে দিয়ে, Good, Fair, Tolerable প্রভৃতি মন্তব্য করতেন। আমার ভাগ্যে 'Good'ই জুটতো বেশির ভাগ। সতীর্থরা মনে করতো এটা আমার প্রতি তাঁর পক্ষপাতের ফল। একদিন অনুবাদ শেষ করে আমি খাতা দেখাবার জন্যে উঠতে যাচ্চি, এমন সময় আমার পাশের ছেলেটি বললো—"দে তোর খাতা,—আমি দেখিয়ে আসি।" আমি রাজী হবার আগেই সে ছো মেরে আমার খাতাখানা তুলে নিয়ে চলে গেলো তাঁর টেবিলের কাছে, উদ্দেশ্য প্রধান শিক্ষকমশায় কি মন্তব্য করেন দেখবে। খাতা দেখা হয়ে গেলে এফ্-এর প্রথম টানটা দিয়ে পর মুহূর্তে (এফ্-এর পেটকাটা হয়নি তখনও) মাথার ওপর চট্ করে একটি বৃত্ত-চাপ টেনে দিলেন,—আর দ্রুত হস্তে বসিয়ে দিলেন 'ood'।—এর কারণটা অনুমানের, প্রমাণের নয়। যাক সে কথা,

ব্যাপারটা ছাত্রমহলে যে ইঙ্গিতময় গুঞ্জন তুলেছিল তা আজও স্পষ্ট মনে আছে। একবারের একটি ঘটনা এখানে বলতে হয়। স্কুলের প্রবীণ সম্পাদক মথুরবাবুর রোগ ছিল ক্লাসে ক্লাসে ঢুকে প'ড়ে ছাত্রদের বিদ্যার গভীরতা মাপার জন্যে প্রশ্নের ওলন ফেলা। এই অতর্কিত আক্রমণ ছাত্র-শিক্ষক কেউই পছন্দ করতেন না। ঠারে-ঠোরে এটা তাঁকে জানিয়েও দেওয়া হ'তো,—কিন্তু তিনি গায়ে মাখ্‌তেন না। সব বেমালুম ঝেড়ে ফেলতেন। একদিন হঠাৎ আমাদের শ্রেণীতে ঢুকে তিনি আমাদের ইতিহাস-বিদ্যার পরিচয় নিতে উদ্যত হ'লেন। অল্প বযসেই দাড়ি-ওঠা একটি ছেলেকে প্রশ্ন করলেন, 'Who was Samkaracharya ?' অকুণ্ঠ কণ্ঠ থেকে সত্বর উত্তব এলো, 'Son of Mahammad Ghori.' ছাত্রটির এই বে-আদবি দেখে লাল হয়ে উঠলো প্রধান শিক্ষকের মুখ। ক্রোধে অধীর হ'য়ে তিনি চিরদিনের অভ্যাসমত তুড়ি বাজিয়ে তর্জনী নির্দেশ করে বারবার বলতে লাগলেন, 'You foolish boy, you foolish boy'। তজনী-সংকেতটা যে সম্পাদক মহাশযের দিকেই উদ্যত হ'লো তা খেয়ালও করলেন না। আত্মভোলা এই মানুষটির এই চিত্ত-বিভ্রমে ছেলের দল যে বিশেষ কৌতুক অনুভব করলো তা বলাই বাহুল্য। অপরাধী ছেলেটির শাস্তি কি হয়েছিল তা আজ আর মনে নেই। দুষ্টু ছেলের পাল্লায় পড়ে এ রকম ঘোল খেতে হয় অনেক শিক্ষককেই, কেউ ঘাল হন, কেউ হন না। কিন্তু শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে মাথা নত হয় যাঁর পাদমূলে, তার এই লাঞ্ছনা শুধু অবাঞ্ছিত হয়, ছাত্রকুলের কলঙ্ক। প্রধান শিক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলীর অনেকগুলিই তাঁর ছিল; প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা, ঐকান্তিক সহৃদয়তা, ক্ষমা ও তিতিক্ষা, ঋজুতা ও চরিত্রবত্তা—এ সবই ছিল প্রচুর পরিমাণে। ছিল না শুধু প্র৹াজন-কালে দুষ্টু ছেলেদের শায়েস্তা করবার মত মানসিক দৃঢ়তা। প্রাচীনকালের বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থায় আস্থা ছিল তাঁর অবিচল। জাতিগতভাবে তাঁর নিজের

স্থান ছিল অপেক্ষাকৃত নীচের থাকে, তাই উচ্চবর্ণের অপরাধী ছেলেকে তিনি সহজে শাস্তি দিতে পারতেন না। শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েও মাঝ পথেই নিরস্ত হ'তেন। একবার একটি ছেলেকে গুরুতর অপরাধের জন্যে শাস্তি দিতে বেত হাতে ছুটে গিয়েও শেষ পর্যন্ত প্রহরণ সংবরণে বাধ্য হ'য়েছিলেন; কারণটা ছিল এই যে ছাত্রটি ছিল ব্রাহ্মণ এবং দ্রুতপদে এগিয়ে যাওয়ায় হঠাৎ তাঁর পায়ের সঙ্গে ছেলেটির পায়ের সংস্পর্শ ঘটেছিল। হেঁট হ'য়ে নমস্কার করে রণে ভঙ্গ দিয়েছিলেন তিনি। কিছু না-মানার যুগে এই অন্ধ আস্থা নিন্দনীয় ব'লেই গণ্য হবে। আর সব কালের বিচারেই এই দুর্বলতা —বিশেষ ক'রে একজন প্রধান শিক্ষকের পক্ষে—শুধু অশোভন নয় হীনম্মন্যতার নিদর্শন। মজ্জায় মজ্জায় সেকেলে ছিল তাঁর মনটি, ইংরাজী শিক্ষার রসানেও তার রঙ বদলায়নি। কীর্তন শুনতে শুনতে তাঁর দুচোখে ধারা নামতে দেখেছি, ধুলোটের দিনে দেখেছি তাকে বিহ্বল ব্যগ্রতায় মদনগোপালজীর মন্দির-প্রাঙ্গণে ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে। তবুও তাঁর শাসন-কালে স্কুলের নিয়ম-শৃঙ্খলা যে অক্ষুণ্ণ ছিল সে কেবল তার চরিত্রের চারুতা ও সহকারী শিক্ষকদের স্বতঃপ্রবৃত্ত সহযোগিতার ফলে।

এই ছাত্রপ্রাণ সিদ্ধ শিক্ষকের কথা চিন্তা করলে হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। যে অপরিমেয় স্নেহের উৎস ছিল তাঁর অন্তর, তার কাছে তার বিদ্যাবত্তা ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যও ম্লান হয়ে যায়। শুধু শিক্ষক ছিলেন না তিনি, ছিলেন গুরু। গুরুর মতই শিক্ষা যা দিতেন, তার চেয়ে সঞ্চার করতেন অনেক বেশী। এই স্নেহশীল গুরুর সান্নিধ্যে উপনিষণ্ণ ছাত্রেরা অনুভব ক'রতো একটি উত্তপ্ত স্নেহের স্পর্শ। বেঞ্চি-চেয়ার-চৌকি-সজ্জিত শিক্ষা-কক্ষ হ'য়ে উঠতো শান্তরসাস্পদ ঋষির আশ্রমের মত কিংবা প্রাচীন গ্রীসের 'লাইসিয়াম্' 'আকাডেমসে'র মত। এই আবহ-সৃষ্টি ও ভাবসঞ্চারই তো শিক্ষার বড় কথা। জগতের সব শিল্পীর সেরা শিল্পী এই ঋষিকল্প আদর্শ শিক্ষকেরা—
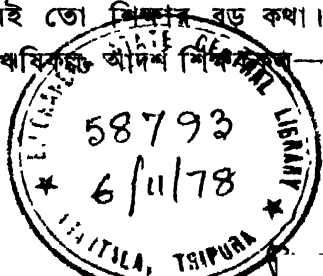
কোন জড়বস্তুর উপাদান নিয়ে এঁদের কারবার নয়—উদ্ভিদ্যমান জীবনই হ'লো এঁদের উপাদান। এঁরা স্রষ্টা, মানুষ তৈরী করেন এঁরা, এঁদের হাতেই আমাদের দ্বিজত্ব-প্রাপ্তি ঘটে। ছাত্র-জীবনের অনেকদিন পরের কথা। প্রধান শিক্ষকমশায় তখন অবসর নিয়ে মায়াপুর গৌড়ীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করেছেন। আমি নিজেও তখন অধ্যাপক। বাড়ী যাতায়াতের পথে ছোট-লাইনের গাড়ীতে হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা। আমাকে পেয়ে তিনি যে কী খুশী হলেন তা বলবার নয়। আনন্দ আমারও বড় কম হ'লো না। অতীত ও বর্তমানের কত কথাই না হ'লো। আলাপ-প্রসঙ্গে এক সময় তিনি জিজ্ঞেস ক'রলেন কলেজের কাজ কেমন চ'লছে। উত্তরে ব'ললাম, "মোটামুটি ভালই চ'লছে, সার; আপনার কাছে প'ড়েছি, ভুল শিখিনি তো কখনো"—ব'লেই তার মুখের দিকে চেয়ে দেখি স্বচ্ছ-শুভ্র মুক্তাপংক্তির মত আনন্দাশ্রুধারা ঝ'রে প'ড়ছে তাঁর দু' কপোল বেয়ে। আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে কি বলতে গেলেন, ব'লতে পারলেন না। কৃতজ্ঞ ছাত্রের এই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি—শিক্ষক-জীবনের এই পরম প্রাপ্তি তাঁকে বিহ্বল ক'রে দিয়েছে। আমাকে একেবারে টেনে নিলেন তাঁর স্নেহ-শীতল বুকের মধ্যে। সেই আনন্দ-ঘন পরম মুহূর্তটি দীপ্র রেখায় আজও লেখা আছে আমার মনের পটে। এ কি ভুলবার?

আমাদের হেড্ পণ্ডিত ছিলেন নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ, কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিসাংখ্যতীর্থ—অসামান্য মেধা ও ধীশক্তির অধিকারী। নিজের চেষ্টায় ইংরাজিও শিখে নিয়েছিলেন মন্দ নয়। মুখে হাসি বড় ছিল না, মুখ ভেংচিয়ে কথা ব'লতেন ছেলেদের সঙ্গে। সে সময় উপর পাটির কালো মাড়ি বেরিয়ে প'ড়তো প্রায় সবটাই। রুক্ষ শুষ্ক মানুষটি ঝুনো নারকেলের মত; খোলা খুলে ফেললেই পাওয়া যেতো সুস্বাদু শাঁস ও সুপেয় বারি। উপমান্তরে বলা যায় তিনি ছিলেন বালুকাস্তীর্ণ পার্বত্য তটিনীর মত, একটু খুঁড়লেই দেখা যেতো

স্নেহের অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা। শীতগ্রীষ্ম নির্বিশেষে একখানা হাতপাখা অবিশ্রান্ত ঘুরতো তাঁর বুকের পাশে। ঐ রকম কৃশকায় লোকের শীতের দিনেও পাখার দরকার হয় কেন, এ নিয়ে ছাত্রমহলে গবেষণার অন্ত ছিল না। শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তে তারা পৌঁছেছিল সেটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। অধিকাংশের রায়, পাখাটার কাজ নিছক বায়ু-সেবন কিংবা শোভাবর্ধন নয়, ওর অন্যতর এবং মুখ্য উদ্দেশ্য হ'লো প্রয়োজন হ'লে (হাত সুড়সুড় ক'রলে ব'লবো না) অশিষ্ট ও অনাবিষ্ট ছাত্রদের ব্রহ্মতালুর কাঠিন্য পরীক্ষা করা।

সেকালে ইংরাজি থেকে সংস্কৃতে অনুবাদের একটা প্রশ্ন থাকতোই। সংস্কৃতের প্রশ্ন-পত্রে এবং ক্লাশে এর তালিমও দেওয়া হ'তো রীতিমত। মার্ক নির্ধারিত ছিল পঁচিশ; কাজেই উদ্যমের অভাব ছিল না ছাত্রদের দিক থেকেও। না শিখেই বৈতরণী-তরণের বাসনা ব্যাধির মত ছাত্রসমাজকে পেয়ে বসেনি তখনো, তাই পাল্লা দিয়ে চ'লতো অনুবাদের অনুশীলন। অনুবাদের ঘণ্টা; পণ্ডিত মশায় একটি একটি ক'রে ব'লে যাচ্ছেন ইংরীজি বাক্যগুলো, সাগ্রহে লিখে নিচ্ছে ছেলেরা নিজের নিজের খাতায়। একটা বাক্যে এসে তাদের কলম গেলো থেমে, ঠিক যেন ব্যাসকূটের অর্থ গ্রহণ ক'রে লিখতে গিয়ে গণেশের অবস্থা! মাথা কুটেও তারা এই কূটের অর্থ আবিষ্কার ক'রতে পারলো না। 'হরি নো জল'; একী খিচুড়ি ভাষা! 'হরি' 'জল'এ দুটো তো সংস্কৃত, মাঝখানের ঐ 'নো' শব্দটাই শুধু ইংরাজি। ব'লে রাখি বিশিষ্ট বিদ্বান্ হ'য়েও পণ্ডিতমশাই উচ্চারণ সম্বন্ধে ছিলেন উদাসীন, বিশেষ ক'রে ইংরাজির। ফাঁফরে প'ড়ে কয়েকটি ছেলে বাক্যটি আর একবার শুনতে চাইলে তিনি আগের উক্তিরই পুনরাবৃত্তি ক'রলেন। এতেও গুঞ্জন থামলো না দেখে তিনি 'নো জলের' সন্ধিবিচ্ছেদ ক'রে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন, "হরি নোজ্ অল্"। বিক্ষুব্ধ জলতলে তেল প'ড়লো। মুহূর্তে গুঞ্জন গেলো

থেমে ; বিচ্ছিন্ন হ'য়ে 'জল' 'অল্'-এ পরিণত হ'তেই বাক্যটি জলের মতই প্রাঞ্জল হ'লো ছেলেদের কাছে। আগেই ব'লেছি পণ্ডিতমশায় উচ্চারণ-বিধি মানতে চাইতেন না কিছুতেই ; কেমন যেন এক-গুঁয়েমির ভাব ছিল তাঁর এ সম্বন্ধে। তবুও তিনি মাঝে মাঝে ক্লাসে ছেলেদের রীডিং প'ড়তে ব'লতেন দেবনাগরী হরফগুলো তাদের ঠিকমত রপ্ত হ'য়েছে কিনা যাচাই করার জন্যে। একবার একটি ছেলে প'ড়তে প'ড়তে 'গত্বা' শব্দটি উচ্চারণ ক'রলো 'গত্তোয়া' ক'রে। উচ্চারণটা কাণে যেতেই তিনি ঈষৎ হেসে (রঙ্গে না ব্যঙ্গে কে জানে ?) টিপ্পনী কাটলেন, "গত্তোয়া, না পানতোয়া"। ছেলের দল তো মহাখুশী, হেসে একেবারে কুটিকুটি। ঐ জাতীয় 'ক্ত্বাচ্' প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলো তিনি নিজে উচ্চারণ ক'রতেন 'গত্তা মত্তা' ক'রে। রঙ্গরসটা হয়তো একটু পাতলাই ছিল, কিন্তু স্বভাব-রুক্ষ পণ্ডিত মশায়ের মুখ থেকে বেরিয়ে ঘনত্ব প্রাপ্ত হ'লো, হাসির লহর উঠলো ক্লাসে। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। তাঁর ভিতরের মানুষটিকে যে দেখেছে সে তাকে চিনতে ভুল করেনি। সেখানে তিনি শুধু শিক্ষক নন, গুরু ; কেবল বিদ্যা দান করেন না, করেন শক্তি-সঞ্চার।

অনেক অনেক দিন পরের কথা। সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন কৃষ্ণনগরে, মূল সভাপতি সাহিত্যরথী 'বীরবল'। পণ্ডিত-মশায় তখন কুচবিহার কলেজের অধ্যাপক, আমি কৃষ্ণনগর কলেজের। রাজবাড়ির ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণে পেলাম তাঁর অভাবিত শুভদর্শন। দেখা হ'তেই পাদস্পর্শ ক'রে প্রণাম ক'রলাম। হাত ধ'রে তুলে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে ব'ললেন, 'কিরে, বিনে, ভাল আছিস তো !' এতদিন পরে তাঁরই দে'ওয়া নাম ধ'রে এই স্নেহ-সম্ভাষ শুনে মনটা যেন পিছু হ'টে চ'লে গেলো ফিকে হ'য়ে-আসা সেই কৈশোরের দিনগুলিতে। নাম-বিকার শুনে চিত্ত-বিকার ঘ'টলো না একটুও—বহুদিনের অনাস্বাদিত প্রসাদের স্পর্শে মন

উঠলো কানায় কানায় ভ'রে—মনে মনে লুটিয়ে প'ড়লো মাথা এই কৈশোর-গুরুর পদপ্রান্তে।

শুনেছি তাঁর আগের পণ্ডিতমশায়—জয়গোপাল গোস্বামী—ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য ধাতের মানুষ। সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রাথমিক নিয়মগুলো মুখে মুখে শেখাতেন ছড়া কেটে কেটে। ফলে ছেলেদের ধাতে ব'সে যেতো সেগুলো, সহজে তারা ভুলতো না। তাঁর বাগ্‌ভঙ্গি ছিল মনোজ্ঞ —অধ্যাপন-নৈপুণ্য অনন্য। শিক্ষক-জীবনের শেষ দিকে ছেলেদের কিছু লিখতে দিয়ে আফিমের মৌজে ঝিমিয়ে পড়তেন পণ্ডিতমশায়। হেড্ মাস্টার মশায় রোঁদে বেরিয়ে তাঁকে সুখসুপ্ত দেখে জুতোর খট্-খট্ শব্দ তুলে ক্লাসের মধ্যে ঢুকে প'ড়তেন। প্রবীণ পণ্ডিতের চট্‌কা কিন্তু চট্ ক'রেই ভেঙে যেতো। ব্যাকরণের কোন কঠিন সমস্যার সমাধানের জন্যই যেন ধ্যানস্থ হ'য়েছেন এমনি ভঙ্গি ক'রে হঠাৎ ঘাড় তুলে ব'লে উঠতেন, "কর্মধারয়ই বটে, তবে এ স্থলে বহুব্রীহিও ব'লতে পারো"—আর সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান-নেত্র উন্মীলিত ক'রতেন। হেডমাস্টার কোন কথা না ব'লে মনে মনে একটু হেসে আস্তে আস্তে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতেন। শান্তিপুরের প্রখ্যাত গোস্বামি-বংশের এই কৃতী সন্তান ব্যাকরণ, অলংকার, কথাসাহিত্য প্রভৃতি বহু বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা ক'রেছেন। 'গোবিন্দদাসের কড়চা' গ্রন্থের একটি কীটদষ্ট পুঁথির পাঠোদ্ধার ক'রে সম্পাদনও ক'রেছেন। তাঁর হস্তাক্ষর ছিল মুক্তার মত—হাতের তেলোয় কাগজ রেখে ভুষাকালিতে কঞ্চির কলম দিয়ে লিখে যেতেন অবিশ্রান্ত। এইভাবে সংস্কৃত-সাহিত্যের অধিকাংশ কাব্য-নাটকই স্বহস্তে লিখে রেখে গিয়েছেন। এই সচিত্র পাণ্ডুলিপি-গুলি (ছবিগুলি তাঁর নিজেরই আঁকা) প্রদর্শনীতে রাখার যোগ্য। আমি কোনদিন তাঁকে পাঁচজনের সঙ্গে গালগল্প ক'রে সময় কাটাতে দেখিনি। তাঁর পাঠকক্ষের সম্মুখ দিয়ে যখনই গিয়েছি, দেখেছি এই স্থিতধী সুধী সারস্বত সাধনায় নিমগ্ন। এই বেগ ও উদ্বেগের যুগে জ্ঞানসাধনার এই দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয় কি? অধ্যয়ন ও অধ্যাপনই ছিল

এঁদের জীবনের ব্রত, শুধু বৃত্তি নয় একালের মত। পাণ্ডিত্যের প্রখর তাপেও কিন্তু তাঁর অন্তরের রস-উৎসটি শুকায় নি একটুও। ভারি মজার মানুষ ছিলেন তিনি। একবার ওপরের ক্লাসের ছেলেদের নাকি ব'লেছিলেন, "দেখ্, একটা কাজ ক'রতে পারিস যদি তোরা, তা'হলে আমি একটা আশ্চর্য ম্যাজিক দেখাতে পারি তোদের।" ম্যাজিকের নাম শুনে মেতে উঠলো ছেলের দল, সমস্বরে ব'লে উঠলো, "পারবো, খুব পারবো, পণ্ডিতমশায়, বলুন কি করতে হবে"। পণ্ডিতমশায় ঝপ্ ক'রে ঝাঁপি না খুলে টিপে ছাড়তে লাগলেন কথাটা, দক্ষ মৎস্য-শিকারী যেমন ক'রে খেলিয়ে মাছ ডাঙায় তোলে অবিকল সেই কৌশলে। ছেলেদের আগ্রহ যতই বাড়ে ততই না-হুঁ না-হুঁ ক'রতে থাকেন তিনিও,—"বলে, গাঁ বড়, তার মাঝের পাড়া। আমার আবার ম্যাজিক। ও একটা কথার কথা, মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছে"। কিন্তু না-ছোড় ছেলেরা কি ছাড়ে। অগত্যা তাঁকে ভাঙতেই হ'লো প্রস্তাবটা: ব'ললেন, "দেখ, তোরা যদি প্রত্যেকে প্রত্যহ একটি ক'বে বড় গোছের নৈনিতাল আলু পৌঁছে দিতে পারিস আমার বাড়িতে এক মাস ধ'রে, তা হ'লে মাসের শেষে সেই অদ্ভুত ম্যাজিকটা তোদের দেখাবো। কিস্তি খেলাপ হ'লে কিন্তু কথারও খেলাপ হবে"। ছেলেরা সবাই খুব রাজি বাজি দেখার আগ্রহে। ভাঁড়ার-চুরি-করা একটি ক'রে তালের মত নৈনিতাল এসে প'ড়তে লাগলো পণ্ডিতমশায়ের বৈঠকখানায় রাখা প্রকাণ্ড এক ঝুড়িতে। আলুর খেলা চ'ললো এইভাবে পুরো একটি মাস ধ'রে। এই বার পড়লো পণ্ডিতমশায়কে খোঁচা দেওয়ার পালা—ছেলেদের তরফ থেকে। ঝালাপালা হ'য়ে উঠলেন তিনি। হচ্ছে-হবে ক'রে ক'রে কিছুতেই আর ছেলেদের ঠেকিয়ে রাখতে না পেরে শেষটা একদিন বললেন, "সবুর কর, সবুর কর, সবুরে মেওয়া ফলে জানিস তো!" মেওয়া কিন্তু ফলার নামও করলো না। ধৈর্যহারা ছেলের দল ক্লাসের বাইরে ঘিরে ধর'লো তাঁকে। ('ঘেরাও' নামধেয় অভিনব গণ-

তান্ত্রিক রণকৌশল তখনো অজ্ঞাত ও অশ্রুত ; ছেলেদের দৌড় তখন "ধরাও" পর্যন্ত।) প্যাঁচে প'ড়ে হক্ কথাটাই ফাঁস ক'রে ফেললেন, —বললেন "ম্যাজিক তো আর লজিক নয় রে যে কারণ থাকলেই কার্য ঘটবে? তোরা যে এই একমাস ধ'রে আলু জোগালি, অথচ কিছুই দেখতে পেলি নে, এর চেয়ে বড় ম্যাজিক আর কি হ'তে পারে! 'বিভাবনা' অলংকারের কথা শুনেছিস্ তো—কারণ বিনা কার্যের উৎপত্তি এবং কারণ সত্ত্বেও কার্যের অনুৎপত্তি যে হ'তে পারে, তা' কবিরা সবাই স্বীকার করেছেন। সব সাহিত্যেই ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তও আছে এর। এত জেনে শুনেও তোরা 'বরা' পাগল সাজ্ছিস্ কেন বল্তো" ? এর পরে আর বলার কি থাকতে পারে ? অগত্যা ছেলের দল ল্যাজ গুটিয়ে সরে পড়লো ; বেড়ালের ভাগ্যে শিকে আর ছিঁড়লো না।

আর একটা ঘটনার কথাও শুনেছি তার সম্বন্ধে। মহাকবি মধুসূদন তখন সবে বিলেত থেকে ফিরে ব্যারিস্টারী শুরু করেছেন। কি একটা কমিশনসাক্ষ্যের ব্যাপারে তিনি শান্তিপুরে আসেন। সেই সময় কাজের ফাঁকে তাঁর সঙ্গে পণ্ডিত মশায়ের 'মেঘনাদবধ' সম্পর্কে কিছু আলাপ-আলোচনা হয়। বৈয়াকরণ ও আলংকারিক হিসেবে তখন পণ্ডিতমশায়ের দেশজোড়া নাম। আলোচনা-সূত্রে অলংকার-দোষ ও ব্যাকরণ-দুষ্ট পদপ্রয়োগের কথা ওঠে। পণ্ডিত-মশায় বলেন,—"আপনার রচিত মনোহর কাব্য-দেহে ব্যাকরণ-দুষ্ট পদগুলি ব্রণের মত তাকে দূষিত করে রেখেছে। অনভিধানিক অর্থে শব্দের প্রয়োগ—রজত অর্থে রজঃ, কোষ অর্থে নিকষ, কুরঙ্গীর স্থলে কুরঙ্গিনী, বরুণানীর বদলে বারুণী—করা কি আপনার উচিত হয়েছে? নিঃশংকিলা, নির্বারিবে, প্রতিবিধিৎসিতে—ইত্যাদি রাশি রাশি নামধাতুর অযথা প্রয়োগ কি রুচিসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত হয়েছে? এছাড়া অলংকার-সংকরও ঘটেছে কম নয় ; দোষের মিশ্রণে গুণও যে নগণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দুষ্ট ব্রণগুলি সরিয়ে বা সারিয়ে

ফেললেই তো কাব্যখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। ওটা করেন না কেন?” আত্মসংবুদ্ধ মধুসূদন (বেতসবৃত্তি তাঁকে স্পর্শও করতে পারে নি কোন দিন) উত্তর করেন,—

“আপনি ভাববেন না পণ্ডিতমশায়। কবিরা চিরকালই নিরঙ্কুশ—ব্যাকরণ-অলংকারের শাসন তাঁরা মানেননি কোন কালে—ভাস, কালিদাসও বাদ যান না। আমার কাব্যে রস যদি থাকে, রসাভাসে কিছু যাবে আসবে না, দোষগুলোও গুণ হয়ে দাঁড়াবে আমার দেওয়া অভিনব অর্থে, শব্দগুলি গ্রহণের বিধান দেওযা হবে অভিধানে,—দুষ্ট প্রয়োগগুলিও শিষ্ট ও বিশিষ্ট ব'লে স্বীকৃত হ'বে।” পণ্ডিতমশায় শুধু নির্বাক নয়, অবাক হয়েছিলেন তার আত্মপ্রত্যয়ের এই দৃঢ়তা দেখে।

নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদের ঠিক পরেই প্রধান পণ্ডিত হয়ে এলেন ভুবনমোহন ভট্টাচায কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ। যশোর জেলায় এক বিশিষ্ট অধ্যাপক বংশের সুযোগ্য সন্তান। চুঁচুড়ার বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীতে তার খুল্লতাত ছিলেন সম্ভবত বেদান্তদর্শনের অধ্যাপক। তার কাছে থেকে ভুবনমোহন কিছুদিন কাব্য-ব্যাকরণ-অলংকার প্রভৃতি অধ্যয়ন করেছিলেন। কাব্য-ব্যাকরণ ছাড়া ন্যায়ের মধ্য পরীক্ষাও তিনি পাস করেছিলেন, শুনেছি। জ্যোতিষও জানতেন মোটামুটি। ভুবনমোহন যখন শান্তিপুরে আসেন তখন তার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। নাতিদীর্ঘ চেহারা, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। মুখে প্রসন্ন প্রশান্তি। কণ্ঠস্বরে ঈষৎ নাকীসুর। এসেই বাসা নিলেন ‘দান্দে’ পাড়ায় (দরিদ্র পাড়া?) একখানি একতলা বাড়িতে; পরিবেশ নির্জন হ'লেও নির্মল নয়; সামনের মেটে রাস্তাটা অদ্বৈত-পাদপূত রজোরাজিতে সমাকীর্ণ। পাড়ার বাড়িগুলির আশে পাশে ঘন ঝোপঝাড়। ভাড়া-করা বাড়িটি মন্দ নয়, উঁচু-পোঁতার মজবুত ইমারত। তাঁর আসার খবর পেয়ে আমরা ছেলের দল তার বাসভবনে এসে হাজির হ'লাম। আচার্য আমাদের পরিচয় পেয়ে

সৌম্য-স্মিতমুখে আমাদের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ ক'রতে লাগলেন। প্রথম দর্শনেই তাঁকে ভাল লেগেছিল, কথা শুনে সে আকর্ষণ আরও বেড়ে গেলো। অতিরিক্ত সংস্কৃত আমার পাঠ্য ছিল; তাঁর শিক্ষার গুণে বিদ্যার বনিয়াদ যে আরও পাকা হবে তাতে সন্দেহ রইলো না। কেতাবী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার্থীদের মানসিক উন্মেষের দিকেও তাঁর দৃষ্টি সজাগ; ছাত্রজীবনে সমাজসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবার উপদেশ দিলেন। প্রীতির সঙ্গে নীতির বীজ-বপন ক'রলেন আমাদের অন্তরে। আন্তরিকতা ছোঁয়াচে জিনিস, কিশোর-মনে অলক্ষ্যে সংক্রামিত হয়। ভরা মন নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। এর পরে স্কুলে এবং গৃহে তাঁর কাছে পাঠ নেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। যতই দিন গিয়েছে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা'ও ততই বেড়ে উঠেছে। ভাল ছেলেদের তিনি ভাল ক'রেই পড়াতেন; মাঝারি ছাত্রদের এমন কতকগুলি মক্ষম মুষ্টিযোগ দিয়ে দিতেন (শারীরিক মুষ্টিযোগ না ক'রেই) যে তারা পরীক্ষা-বৈতরণী সহজেই পার হ'য়ে যেতো। ছাত্রদের অধিকার-অনুসারে তিনি তাদের শিক্ষা দিতেন। ছাত্রদের বিদ্যা ও বুদ্ধির দৌড় তিনি একনজরেই বুঝে নিতেন এবং টোন্ (tone) ফেরাবার জন্য উপযুক্ত টনিকের ব্যবস্থা ক'রতেন। একেবারে নিচের তলার ছেলেদেরও তিনি তলিয়ে যেতে দিতেন না, তরিয়ে দিতেন প্রশিক্ষণের গুণে। ফলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতে ফেল্-এর সংখ্যা নিল্-এর কোঠায় দাঁড়াতো। পণ্ডিতমশায় ইংরেজিটা জানতেন একটু কম, অথচ তখনকার দিনে অনেক কিছুই শিখতে হ'তো ইংরাজিতে। সংস্কৃত থেকে ইংরেজি অনুবাদের পড়া নেবার সময় দুষ্টু ছেলেরা নষ্টামি ক'রে হুড় হুড়্ ক'রে আবোল তাবোল আউড়ে যেতো, পণ্ডিতমশায় মান বাঁচাবার জন্যে সেই অপূর্ব অনুবাদ মেনে নিতেন অম্লানবদনে। ছাত্রমহলে চাপা হাসির ঝিলিক খেলে যেত। পণ্ডিতমশায় কিন্তু নির্বিকার, নাচার হলে বিচার চলে না। একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলো। আবদুল

(মজিদ্) ব'লে একটি দাড়িওয়ালা ছেলে কি একটা বে-আদবী করায় তিনি তাকে বেঞ্চির ওপর দাঁড়াবার হুকুম দিলেন। দাড়িধারী ছেলেটি সে আদেশ মানতে চাইলো না বোধ হয় লজ্জায়। পণ্ডিত-মশায় ধেড়ে ছেলের এই ধৃষ্টতা বরদাস্ত ক'রতে না পেরে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন, "আবদুঁল, কেঁলাস থেকে বেঁরিয়ে যাঁও বঁলছি,—বঁলছি বেঁরিয়ে যাঁও।" আবদুলের বেরিয়ে যাওয়ার কোন গা নেই দেখে প্লাটফর্ম থেকে নেমে দ্রুতপদে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে চ'টে ম'টে চোটপায়ে এগিয়ে আসতে দেখেই শ্রীমান্ আবদুল রণে ভঙ্গ দিয়ে স'রে প'ড়লো। এই রকম অপ্রীতিকর ঘটনা মাঝে-মাঝে দু'একটা ঘটলেও শান্তি সচরাচর বিঘ্নিত হ'তো না তাঁর ক্লাসে। আমার প্রতি বাৎসল্য ছিল তার অনুপম। ক্লাসের পড়া ছাড়াও তিনি আমাকে অতিরিক্ত পত্রের জন্য ভোজপ্রবন্ধ, বেতাল পঞ্চবিংশতি,সরল কাদম্বরী প্রভৃতি আমাদের বাড়ীতে এসে পড়াতেন নিয়মিতভাবে, কিন্তু পারিশ্রমিক নিতে চাননি কিছুতেই। এই ত্যাগব্রত তীর্থপাদের পুণ্যস্মৃতিটি আমার মন থেকে মুছবে না কোনদিন। গুরুপাদ জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দিয়ে আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন—আমার মনের সামনে খুলে ধরেছিলেন এক নতুন দিগন্ত। পরের ছেলেদের মানুষ করেছিলেন তিনি নিরতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে, কিন্তু নিজের ছেলেদের মানুষ ক'রতে পারেন নি। ফলে বৃদ্ধবয়সেও পণ্ডিতমশায়ের রোজগারের রাস্তা দেখতে হ'তো নানাভাবে। এই অশীতিপর বৃদ্ধকে দায়ে পড়ে টুইশনি করতে হয়েছিল নাভিশ্বাস ওঠার আগে পযন্ত; তাছাড়া জ্যোতিষ শিক্ষাটা ঝালিয়ে নিয়ে কোষ্ঠি-ঠিকুজিও ক'রতে হ'তো। একদিনের একটা ঘটনার কথা বলি। ১৯৬১ সাল, আমি তখন শান্তিপুর কলেজের অধ্যক্ষের পদে। খবর পেলাম পণ্ডিতমশায় এসেছেন; আমি তাড়াতাড়ি চ'লে এসে পণ্ডিতমশায়ের পায়ের ধুলো নিলাম। তাঁকে বাইরের বারান্দায় রাখা একটি বেঞ্চে বসিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে

রইলাম। তিনি আমাকে পাশে বসতে ইঙ্গিত ক'রলেন। আমি বসলে একান্ত কুণ্ঠার সংগে ব'ললেন, "বড্ড টানাটানির মধ্যে দিন যাচ্ছে, মাসকাবারের এখনও ১৫ দিন বাকী, বাজারের খরচ ২৲ টাকা হিসাবে ৩০৲ টাকা লাগবে; ঐ টাকাটা তুমি আমাকে দাও।" এই করুণ কাহিনী শুনে উদ্‌গত অশ্রু-দমন ক'রে আমি তখনই তাঁর হাতে টাকাটা এনে দিলাম। টাকাটা হাতে নিয়ে তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। যে গুরু মাসের পর মাস বিনাবেতনে বাড়িতে এসে আমাকে পড়িয়েছেন, কী পরিস্থিতিতে পড়ে তাঁকে আজ হাত পাততে হ'লো তা ভেবে আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

সেকালে ইস্কুলে যাঁরা বাংলা পড়াতেন, তাঁদের বলা হ'তো ছোট পণ্ডিত। এই অর্থে দ্বারিকবাবু ছিলেন ছোট পণ্ডিত। সংজ্ঞায় ছোট হলেও প্রজ্ঞায় ছোট ছিলেন না তিনি। পক্ক-গুম্ফ, বেঁটে-খাটো ডাটো গড়নের মানুষটি—আয়ু পশ্চিমে হেলেছে। ইস্কুল করেন প্রত্যহ অন্তত পাঁচ মাইল পথ পায়ে হেঁটে ব্রহ্মশাসন গ্রামের স্বগৃহ থেকে। ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষা পাস, বাংলা-সংস্কৃত জানেন ভালই। শুক-চঞ্চুর মত নাসা (তা' বলে কিংশুক বলে ভুল হবার কথা নয়); ছেলেরা অভিনব নামকরণ করেছিল তাঁর—'টেয়া পাখী'। রসিক পুরুষ—টেবিলের ওপর হাতের কাছে হাতিয়ার হিসেবে রাখতেন আন্দাজ হাত-দুই লম্বা সরু লিক্‌লিকে কালকসিন্দের ডাল। শাস্তি দেবার সময় সেটা ব্যবহার না করে ডানহাতের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সহযোগে একটি চিম্‌টে রচনা ক'রে তাই দিয়ে খাম্‌চে ধরতেন তলপেটের চামড়া, অল্প-স্বল্প মোচড়ও যে তার সঙ্গে না থাকতো তা নয়। ষষ্টিপর বৃদ্ধের নিত্য ১০।১২ মাইল পথ-পরিক্রমার কথা, আধ মাইল যেতে হলেও ট্রামে-বাসে বাদুড়-ঝোলা হয়ে ঝুলতে হয় যে-কালে, সে-কালে কেউ কল্পনাও করতে পারবে? আগেই বলেছি, তিনি বিদগ্ধ ব্যঙ্গ-প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। ক্লাসে কথায় কথায় একদিন

কপালে হাত দিয়ে বললেন—"আমার নাকের ভ্রূ-সেতুর ওপর থেকে আরম্ভ ক'রে যে শিরা-রেখাটা ললাট-পটকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে সটান ওপরের দিকে চলে গিয়েছে,—কিরে, তোরা দেখতে পাচ্ছিস তো—ওটা হ'লো রাজটীকা, রাজা হবার বরাত করেই এসেছিলাম ; কিন্তু শিরাটা উঠ্‌তে উঠ্‌তে হঠাৎ এক জায়গায় একটু বেঁকে গিয়েছে, তাই সিংহাসনের বদলে এই কাষ্ঠাসন। নিয়তির নিদারুণ পরিহাস। তবে রাজচিহ্নটা একেবারে নিষ্ফল হয়নি। একবার বর্ধমানে রাজবাড়ি দেখতে গিয়ে নজরে পড়লো গদি-আঁটা এক মস্‌নদ। যাঁহা দেখা, অমনি এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়েই ব'সে পড়া। ললাট-লিপিকে খণ্ডাবে কে ? রেখাটা বাঁকা না হলে ফল পাওয়া যেত ছাঁকা।"

পরে শুনেছি কর্মজীবনের আদি ও মধ্যপর্বে ঠিকাদারি ক'রে বেশ কিছু রেস্ত তিনি হস্তগত ক'রেছিলেন, কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনায় সে সবই শেষে হস্তচ্যুত হওয়ায় অন্ত্যলীলায় অগত্যা তাঁকে রঙ্গপীঠে অবতীর্ণ হ'তে হ'য়েছিল শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে। তাই এখন সন্দেহ হয় তার এই রসপ্রসঙ্গ নিছক রঙ্গ-পরিহাস নয়, এর পিছনে প্রচ্ছন্ন ছিল তাঁর বিগতদিনের ব্যর্থতার ইতিহাস।

ছোট পণ্ডিতমশায়ের কথা বলতে বলতে আর একটা মশার ঘটনা মনে পড়লো—সেটা কিন্তু মোটেই আষাঢ়ে নয়। গল্পটা আমাদের অস্থায়ী শিক্ষক পূর্ণবাবুকে কেন্দ্র করে। মাষ্টার মশায়ের বয়স পঞ্চান্নের কোঠায়, নাদুস-নুদুস মোটাসোটা মানুষ, মুখে ধূর্তামি মাখানো। বিষয় গণিত, জানতেন ও পড়াতেন মন্দ নয়। কিন্তু ভোজনের ব্যাপারে ওজন হারিয়ে ফেলতেন। কথা বলতেন জিবের ডগা দিয়ে মুখামৃত হিসহিস করে টাকরার দিকে টেনে। একজন খাবারওয়ালা টিফিনের সময় নিত্য আসতো তার খাবারের পসরা নিয়ে। মাষ্টারমশায় পা টিপে টিপে ঠিক তার পেছনে এসে দাঁড়াতেন। হঠাৎ রসনার রস পেছনে টেনে নিয়ে ব'লে উঠতেন,

"হ্যাঁরে, তোর সিঙ্গাড়ার সের কত ক'রে? পান্তুয়াই বা বেচ্চিস্ কি দরে? দে তো তোর একটা রসগোল্লা আমার এই হাতে; আহা, বাপু রস একেবারে নিঙ্ড়ে দিচ্চিস্ যে! এমনি করেই কি লোককে ঠকাতে হয়। হ্যাঁ, তা বাপু হক্ কথাই বলবো, তোর জিনিস ভালো। কিন্তু এই কি তোর এক পয়সার রসগোল্লা রে? চোখের চামড়া একটু রাখিস্।" এই ব'লে, ক্রমে ক্রমে দুখানা সিঙ্গাড়া, দুখানা নিমকি, আর দুটো পান্তুয়া নিলেন। আহার পর্ব শেষ করে ক্রীড়ারত ছেলেদের দিয়ে একগ্লাস জল আনিয়ে পান করলেন। দাম দেবার সময় ছ'টা জিনিসের ছ'টা পয়সা দিয়ে এগিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন। মিঠাইওয়ালা আমতা আমতা ক'রে ব'ললো, "বাবু রসগোল্লার পয়সাটা? হাসিতে মাষ্টারমশাই ফেটে প'ড়লেন; ঝোল টেনে টেনে বললেন, "বলিস কিরে, যেটা চাখ্তে দিলি সেটারও আবার পয়সা? তোরা সব হলি কি রে?" এই ব'লে আর কথা না বাড়িয়ে পা বাড়ালেন সামনের দিকে। বেসাতী ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে সেই দিকে তাকিয়ে রইলো। আর একটা মজার কথা আপনাদের শুনিয়ে এই চরিত কথা শেষ ক'রবো। বার্ষিক পরীক্ষা সবে শেষ হয়েছে; খাতাপত্র দেখা সুরু হয়েছে। একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর ছেলে অংকে খুব খারাপ ক'রে মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জনৈক বন্ধু তার বিমর্ষতার কারণ জানতে পেরে ব'ললো "আরে পূর্ণবাবু তো পরীক্ষক। এক-আধসের নিখুঁতি-সন্দেশ নিয়ে গেলেই তো কাজ হাসিল"। উৎসাহ পেয়ে ছেলেটি চলে গেল দাস মশায়ের বাড়ি এবং সন্দেশ-ভেটের কথা সভয়ে নিবেদন ক'রলো। দাস মহাশয় বললেন, "ঠিক বলছিস তো; পাশ হয়ে টয়ে শেষটা ভু দেখাবি নে তে! জবান ঠিক রাখিস, যা, তোকে অভয় দিলাম।" ছেলেটি পেয়ে গেল খাঁটি ত্রিশটি নম্বর, কিন্তু দাসজীর ভাগ্যে ভেট মিললো না। সে যুগে এ জাতীয় শিক্ষক ছিল নিয়মের ব্যতিক্রম। তাই সত্যযুগের এই মিথ্যাচারের নজীরটা না রেখে পারলাম না।

আমাদের স্কুলের শিক্ষা ও শিক্ষকদের সম্বন্ধে উপরে যা বলেছি, একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হলেও সেটা কমবেশি সেকালের সব স্কুল সম্বন্ধেই খাটে। এই রূপরেখাটি ধরে সেকালের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যেতে পারে। দেহলী-দীপের মত যাঁরা সেকাল একাল দুকালই একসঙ্গে দেখছেন, পুরাতন ও অধুনাতন শিক্ষার আপেক্ষিক মূল্যায়ন করতে পারবেন কেবল তাঁরাই। এই প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত মতামত যদি আপনাদের সামনে রাখি (মাপ করবেন, এটা সাম্প্রতিক বাগ্‌রীতি) তাহলে বোধহয় অন্যায় হবে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য যে চিত্তবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন, এবং শিক্ষকের কাজ যে বিদ্যার্থীর মানসে একটি মাধুর্য-মণ্ডিত আলোকের আবহসৃষ্টি, আশা করি সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। সেকালের অধিকাংশ শিক্ষকই পুরাপুরি না হলেও অন্তত আংশিক-ভাবে, এই প্রাথমিক কর্ত্তব্যটি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। দুঃখের বিষয় এই যে সবশ্রেণীর সমাজসেবকদের মধ্যে এঁরাই পেতেন ন্যূনতম বেতন, অথচ কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় এরা ছিলেন না কারও চেয়ে কম। ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁরা গ্রহণ করতেন এই মহৎ ব্রত। অর্থের প্রয়োজন তাঁদের ছিল নিশ্চয়ই কিন্তু তাই বলে অর্থকে তাঁরা পরমার্থের আসনে বসাননি কোনদিন। হরেক রকম দাবীর আওয়াজ তুলে ঝাণ্ডা উড়িয়ে পথে পথে মিছিল করে বেড়ানো কিংবা স্কুলের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে জোট বেঁধে উপবেশন ধর্মঘট করার অভিনব আধুনিক আঙ্গিক তখন অজ্ঞাত ছিল, আর জানা থাকলেও বোধহয় এর আশ্রয় নিতে তাঁরা ইতস্তত করতেন। সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তনের মহনীয় আদর্শ সামনে রেখে তাঁরা চলতেন ; তাই রিক্ততা তিক্ততা আনতে পারেনি তাঁদের জীবনে। তাঁরা জানতেন শ্রদ্ধা ও সাধুতার মূল্যই দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যের অহংকারেই ফিরিয়ে দিতে পেরেছিলেন বুনো রামনাথ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে। তাই এককালে সমাজের শিরোমণি ছিলেন এই শ্রদ্ধেয় শিক্ষককুল। শিক্ষণকে ব্রত হিসাবে

গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা, তাই নিজেদের শিক্ষার ত্রুটি সম্বন্ধেও তাঁদের দৃষ্টি ছিল সজাগ। আত্মপ্রস্তুতির এই স্পৃহা নেই যে সব শিক্ষকের জীবনে, শিক্ষাদানের অধিকার তাঁদের কতটুকু তা জানি না। স্কুলে এসে কোনরকমে দায় সেরে সরে পড়া একালের নিয়ম হলেও সেকালে ব্যতিক্রমই ছিল। বাড়ি বাড়ি ফুল ফেলে বেড়ানোর রেওয়াজ তখন ছিল না। স্কুলে বসেই ছেলেরা যা শিখতো, তাতেই তাদের কাজ বেশ চলে যেতো ; বাইরের বাড়তি সাহায্যের প্রয়োজন হতো কদাচিৎ, হলেও সংশয় নিরসন করতেন শিক্ষকরাই স্কুলের পাঠকক্ষে। বাড়িতে টোল খুলে বসতেন ক্বচিৎ দু'একজন শিক্ষক। গৃহশিক্ষক রাখাটা সৌখিনতা বলেই গণ্য হতো, 'টিউটোরিয়াল হোম' প্রভৃতির নামও কেউ শোনেনি তখন। এ যুগের 'মানের বই', 'মেড্ ইজি', 'সাতবছরের প্রশ্ন ও উত্তর' জাতীয়-আগাছা গজায়নি সে যুগে, শক্তহাতে নিড়েন চালিয়ে এই জঙ্গল সাফ করতে না পারলে শিক্ষার রাহুমুক্তি কিছুতেই ঘটবে না। একবার আমি ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটা reference দেখবার জন্যে ঐ সম্পর্কে একখানা বই চেয়ে পাঠানোয় ইতিহাসের এক ছাত্রী আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল প্রায় ঘুড়ির কাগজে ছাপা শ'খানেক পৃষ্ঠার 'Important Questions with Answers' নামধেয় একখণ্ড মুল্যবান্ গ্রন্থ ! ঐ উড়ুপে চ'ড়েই সে সুড়ুত করে পার হয়ে গিয়েছিল বি.এ.-বৈতরণী। স্থালী-পুলাক-ন্যায়ে বুঝে নিন এর থেকে শিক্ষার দৌড়টা। অথচ পাঠ্যের তালিকা দেখলে তাক লেগে যায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যখন ন্যাপ্স্যাক স্কন্ধে গন্ধমাদন বহন করে স্কুলে যাতায়াত করে, তখন বৃদ্ধের দল অবাক্ হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। কোথায় ছিল তাদের কালে রকমারি খাতাপত্র আর পেন-পেন্সিলের হাজারো বায়নাক্কা। বালির কাগজে কঞ্চি বা খাঁকের কলমে লিখেই তখন হাতের লেখার খোলতাই যা হতো, এ যুগে দামী ঝর্না-কলমে লিখেও তার দর্শন পাওয়া ভার।

ইতিহাস, গণিত, সাহিত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতির পাঠ্যগ্রন্থ সব স্কুলেই প্রায় অভিন্ন ছিল। এইভাবে যাদবচন্দ্রের পাটিগণিত, অধরচন্দ্রের ভারতের ইতিহাস, কে. পি. বোসের বীজগণিত প্রভৃতি যুগ যুগ ধরে পাঠ্যরূপে প্রচলিত হয়ে এসেছে। এইসব বই থেকে লেখকরা নামের সঙ্গে ইনামও কম পাননি। প্রকাশকরা তখনও শোষকের ভূমিকা নেন নি—লেখকদের পোষকই ছিলেন তাঁরা। এ যুগে ক্লাসে ক্লাসে, বছরে বছরে, বই-বদলের যে খেলা চ'লছে, তাতে লেখক-প্রকাশকদের রেস্তর রাস্তাই শুধু খুলছে কিন্তু এদিকে দুঃস্থ অভিভাবক-দের অবস্থা হ'য়ে উঠছে সঙ্গীন! তাঁদের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম। পয়সা যাঁদের সস্তা তাদের অবশ্য অন্য কথা, ছেলেদের বস্তা বস্তা বই যোগাচ্ছেন তাঁরা নির্বিবাদেই। মোট কথা, বিদ্যার্থীদের মন এবং অভিভাবকদের ধন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সে কালে ছিল না। কিন্তু উপকরণের বাহুল্যের অভাবে শিক্ষার পথে কাঁটা পড়েছিল ব'লে মনে হয় না। উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথম পাদে যেসব কৃতী ও মনস্বী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছেন তাঁরা তো এই শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যেই লালিত। শিক্ষা-প্রকরণে উপকরণের বাহুল্যই যদি প্রগতির প্রমাণ হয়, তা'হলে অবশ্য অন্য কথা; অন্যান্য সব ক্ষেত্রের মত শিক্ষার ক্ষেত্রেও এখন সাধনের চেয়ে প্রসাধনই বড় হ'য়ে উঠেছে—রঙের চেয়ে ঢঙ্; আশংকার কথা এইখানেই। দিন দিন বই-এর বহর যত বাড়ছে, পড়া বা পড়ানোর চাড়ও তত কমছে—এও কম আশংকার কথা নয়। পরীক্ষাকক্ষে প্রশ্নপত্র দেখে common না পেলেই ছাত্রদের আচরণ uncommon হ'য়ে উঠছে এই কারণেই। ভাব দেখে মনে হয়, প্রশ্নকর্তাদের বোর্ডেও একজন ছাত্র-প্রতিনিধি থাকলে ভাল হয়। এরপর আরক্ষকদের প্রতি সোডার বোতল, কালির দোয়াত নিক্ষেপ করে উষ্মা-প্রকাশের কথা নাই-বা বললাম।

এই অসংবৃত আচরণের জন্যে শুধু ছাত্র নয়, অংশত শিক্ষকরাও

দায়ী, একথা মানতেই হবে। উদ্ভিদ্যমান্ তরুণদের নরম মন নিয়ে যাঁদের কারবার সেই শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের আচরণ যদি ভ্রান্তপথে বিচরণ করে, তাঁরা নিজেরাই যদি ঘটা করে ধর্মঘটের ঘট-পূজায় বসে যান, তবে ছাত্ররাই বা হটবে কেন? এর ওপর আছে আবার কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালের জুলুম। ভাষা-শিক্ষার সমস্যা নিয়ে জল ঘোলা তো কম হচ্ছে-না আজ বিশ বছর ধরে। তবুও প্রথম দিনে সমস্যাটা যেখানে ছিল, আজও ঠিক সেইখানেই আছে। হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে চালু করতেই হবে, তাতে অহিন্দীভাষী রাষ্ট্রগুলির যতই অসুবিধা ও আপত্তি থাক। ভাবটা এই—যেন হিন্দী শিখলেই ভারতের পুরুষার্থ চরিতার্থ হবে, সংযোগরক্ষার কাজ ইংরাজীর মারফত হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। সংবিধান-বিহিত চৌদ্দটি ভাষার মধ্যে ইংরাজীও তো একটি—কাজেই এই ভাষা বিজাতীয় নয়, বর্জনীয় তো নয়-ই। মজার কথা, লোকসভা-বিধানসভায় হিন্দীর ওকালতির সময় মুখ দিয়ে যাঁদের খই ফোটে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজের ছেলেমেয়েদের পড়তে পাঠান লোরেটো কিংবা কন্‌ভেণ্ট্ স্কুলে। 'সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ!'

ভবের খেলায় শেষ পর্বে পৌঁছে সিংহাবলোকন-ন্যায়ে ছেলে-বেলার খেলাধুলার দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে বোধ হয় অন্যায় হবে না। একালের ছেলেরা সে সব খেলার কথা শুনলে মনে মনে হাসবে। একদিকে ডাণ্ডাগুলি, গুলি, লাট্টু আর অন্য দিকে ধাপসা, চামচু, হাড়ুডু—নিখরচায় কিছু ব্যায়ামচর্চা। না আছে সাজ-সরঞ্জামের তোড়জোড়, না আছে গ্যালারি-ভেঙ্গে-পড়া দর্শকের ভীড় খেলার মাঠকে ঘিরে ; রেডিওর সামনে বসে খেলা শোনার কথা তো ওঠেই না। নেহাতই পাড়াগাঁয়ের মেঠো খেলা। তাই বলে এই সব খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে ছেলেদের মধ্যে উদ্দীপনার অভাব ছিল না। পাড়ায় পাড়ায় ম্যাচের ধুম লেগেই থাকতো, যদিও লীগ অথবা নক্-আউট্ প্রথায় খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হতো না ; হিসাব খাতায় কৃতিত্বের নজীরও জমা পড়তো না। ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড প্রকোপেও এই উৎসাহের স্রোতে ভাটা পড়তো না। হাড়-জিরজিরে ছেলের দল একটু চাঙ্গা হ'লেই পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে খেলার মাঠের একপাশে ব'সে পডতো, চোখে তাদের উদগ্র আগ্রহ, মনের কোণে হয়তো একটু বিষাদও,—ভাবতো কবে আবার এই খেলার ক্ষুধা তাদের মিটবে। ছেলে ছেলেই, হোক একালের কিংবা সেকালের,—সে খেলবেই। কালে কালে, দেশে দেশে খেলার রূপের রকমফের হয়, এই পর্যন্ত। জীব-প্রকৃতির মধ্যে এর শিকড় গাড়া। সাঁতার মানুষ দিয়েছে চিরকালই, তবে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিল কিনা তা পুরাণে লেখে না। এ যুগে বীর মিহির সেন ও বৈদ্যনাথ নাথ পক্‌প্রণালী পার হয়েছেন সাঁতার দিয়ে : ত্রেতায় মহাবীর পার হয়েছিলেন লঘিমা-বলে হাওয়ায় সাঁতার কেটে ; তফাত এই যা! সেকালের অভিযাত্রী দল গৌরীশৃঙ্গ-অভিযানে

গিয়েছিলেন কিনা পুরাণে তা লেখা নেই; তবে সারমেয়-সনাথ পঞ্চ-পাণ্ডব ও দ্রৌপদী যে মহাপ্রস্থানের অভিযানে নগাধিরাজ হিমালয়ের দুর্গম পথেই বেরিয়েছিলেন, মহর্ষি দ্বৈপায়ন তা স্পষ্টাক্ষরে লিখে রেখে গিয়েছেন। হাডুডু, চাম্‌চুর দেশে ফুটবল-ক্রিকেট বিদেশ থেকে আমদানী। আমাদের কৈশোর ও প্রাগ্‌-যৌবনেই এই খেলা দুটি পাকা খুঁটি গেড়েছে, বিশেষ করে ফুটবল। ১৯১১ খৃঃ মোহন বাগান শীল্ড বিজয় করে পলাশীর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে, সারা বাংলার লোকের মনের ভাবটা তখন অনেকটা এই রকম। সে উদ্দীপনার উত্তাপ শহরের সীমানা ছাড়িয়ে পল্লী-বাংলার বুকে বুকে তুলেছে এক উত্তাল আলোড়ন। পাড়ায় পাড়ায় ছেলের দল চাঁদ সেধে বহু কষ্টে এক একটি বল সংগ্রহ করেছে, আর তাই নিয়ে উৎসাহে মেতে উঠেছে। কোথায় বা গোল-পোষ্ট, ক্রস-বার, কোথায় বা নেট! জুতো-জামা দিয়ে গোল-এরিয়া চিহ্নিত ক'রে বাবলাগাছে-ঘেরা এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো ছোট-বড়-মাঝারি যে কোন মাঠের ওপর সার্ধ দুঘণ্টা ব্যাপী গলদঘর্ম অনুশীলন। খেলার গতির মুখেই মাঝে মাঝে হঠাৎ প'ড়তো যতি, যখন বেড়ার বাবলার কাঁটা বিঁধে ব্ল্যাডার ফুটো হ'য়ে হাওয়া বেরিয়ে বল যেতো চুপ্‌সে। কিন্তু তাই ব'লে তাদের উৎসাহ স্তিমিত হ'তো না, সল্যুশান্‌ ও রবার দিয়ে তারা তালি দেওয়ার কাজে লেগে যেতো; সল্যুশান না থাকলে ডোবার জলে ব্ল্যাডারটা ডুবিয়ে ছ্যাঁদার স্থানটা ঠিক করে নিতো; তারপর ছোট্ট একটি ঢিল ফুটোর মুখে বসিয়ে সুতো দিয়ে ক'সে গিঁট বেঁধে তখনকার মত কাজ চালিয়ে নিতো। তারপর বাড়ী ফিরে প'ড়তে ব'সে সে কী ঢুলুনি! খেলা-করা লোকের চেয়ে খেলা-দেখার লোকের সংখ্যা চিরকালই অনেক বেশি। সেকালেও ভাল কোন ম্যাচের অনুষ্ঠান হলে ঢোলসহরত ক'রে শহরময় খবরটা জানিয়ে দেওয়া হ'তো, আর দর্শকের দল কাতার দিয়ে মাঠের দিকে ধাওয়া করতো। মাদ্রাসা কিংবা অন্য কোন মুসলিম টীমের সঙ্গে

খেলা থাকলে প্রবীণ মিঞা-সাহেবরা মাদুর বা চাটাই, আর আলবোলা-সট্‌কা নিয়ে খেলা সুরু হবার অন্তত ঘণ্টা খানেক আগে মাঠে এসে হাজির হ'তেন। খেলা চলতে থাকলে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে খোস গল্প করতে করতে মৌজ করে মজা দেখতেন, আর থেকে থেকে হেঁকে উঠতেন 'চেয়ার আপ্,' 'বাগ্-আপ্', হেড্ সম্‌বডি' প্রভৃতি শুনে-শেখা ভুল ইংরেজি বুক্‌নির টুক্‌রো। সেই সঙ্গে বিপক্ষ পক্ষকে দুয়ো দিতেও কসুর করতেন না তাঁরা। ফলে, মাঠে হাতাহাতি-মাতামাতির ঘটনা এখনকার মত নিত্য না হলেও অন্তত নৈমিত্তিক ছিল, তবে মেজাজের ঝাজ লাঠি-চার্জের পর্যায়ে পৌঁছাত না কখনই। মফস্বলের খেলার মানও মোটের ওপর উঁচুই ছিল। কলকাতার নাম-করা দলগুলিতে খেলোয়াড়ের যোগান দিত এই সব পল্লীর টীম্। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা তখন কলকাতাতেও বিশেষ ছিল না। দেখে এবং ঠেকেই তারা শিখতো। শুনেছি এরিয়ানের দুখীরামবাবু তালিম দিয়ে প্লেয়ার তৈরী করতেন,—প্রসিদ্ধ ভাদুড়ী ভ্রাতৃদ্বয়, নির্মল চ্যাটার্জি (বড়), রূপচাঁদ দফাদার প্রভৃতি নাকি এঁরই হাতে গড়া।

এই তো গেলো ফুটবলের কথা। ক্রিকেট তখন ছিল আরো আদিম-অবস্থায়। ছেলেরা রণজিৎ সিংজীর নাম কেউ কেউ শুনেছিল, কিন্তু তাদের খবরের দৌড় এর বেশি আর এগোয় নি। ধাপ্‌সা-হাডুডুর এবড়ো-খেবড়ো মাঠেই নেহাতই মেঠো রকমের খেলা চলতো। তাতেও যোগ দিত খুব অল্পসংখ্যক ছেলেই। খেলা দেখার উৎসাহও ছিল না বললেও চলে। খেলার সাজ-সরঞ্জামও ছিল তথৈবচ। ভারী শাল কিংবা কাঁঠাল কাঠের দেশী ছুতোরের হাতে-গড়া হাতিয়ার যাকে বলা হ'তো, অবশ্য ব্যাটই—ওজন এতই বেশি যে তাকে চাগিয়ে ওকৃত-মত বলের সংগে লাগানো খুবই শক্ত ছিল। তে-কাঠা অর্থাৎ স্টাম্প্ এক দিকেই পোঁতা হতো, অন্য অর্থাৎ বল করার দিকে থাকতো একটি মাত্র কাঠি। দিক আর

হাতিয়ার হাতফের করে খেলা চলতো, 'ডিউস' বল অজ্ঞাত ছিল, কর্ক্ কিংবা লেদারের বলই বিকল্পরূপে ব্যবহৃত হ'তো। প্যাড্ গ্লাভ্-এর নামও কেউ শোনেনি ; স্ট্যাম্পের ওপর বেলের বালাইও ছিল না, হাত ছেঁচে কিংবা পা ছ'ড়ে গেলে দিশী আইওডিন অর্থাৎ ধুলোর ছিটে ক্ষতের মুখে টিপে দিয়ে ফার্স্ট এড্-এর কাজ চালানো হতো। কোথায় স্কোর বুক, কোথায় কি ? বালির কাগজের ওপর রান্-সংখ্যা লেখা হ'তো। খেলার নিয়মাবলী সম্বন্ধে একেবারে আনাড়ি যে কোন একটি ছেলের ওপরই এই ভার পড়তো। ওপর-দরজার ছেলেদের মধ্যে বাংলাদেশে ক্রিকেট খেলার প্রবর্তনের অগ্রণী অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়,—সংক্ষেপে এস্. রায়ের নাম শুনেছিল কেউ কেউ, তাই খেলাটা পল্লীর মাঠে চালু করবার চেষ্টা কারো কারো মধ্যে দেখা গিয়েছিল। তা ছাড়া, শান্তিপুরের বেরিলি-প্রবাসী সুবোধ-সুকুমার মুখুজ্জে দেশে আসায় ক্রিকেট-খেলার ব্যাপারে একটা নতুন উদ্যম দেখা দিল। ভাল ক্রিকেট-সেট্ মায় প্যাড্-গ্লাভ্ কার-নোবিশের দোকান থেকে আনানো হলো। মাঠ যথাসম্ভব চোস্ত করা হলো, তালিম চললো ; আণ্ডার-হ্যাণ্ড্ বলের বদলে রাউণ্ড-হ্যাণ্ড্ বলের রেওয়াজ সুরু হলো। এক কথায়, উৎসাহের বান ডেকে গেলো অনুরাগীদের মধ্যে। স্বভাব-পটু ছেলেরা তালিমের গুণে খেলার কসরত-কৌশল আয়ত্ত করে কলকাতার মাঠেও নাম করলো। 'ব্যাট-বল' খেলা অবশেষে ক্রিকেট খেলার পর্যায়ে পৌঁছলো।

আমাদের স্কুল-জীবনে গ্রামে হকি খেলার কোন তোড়জোড় কোথাও দেখি নি। পাটনা কলেজ-স্কুলে পড়বার সময় সহপাঠীদের তথা বড়দের হকি খেলতে অবশ্য দেখেছিলাম। দেশে এসে তার প্রতিরূপ কোথাও চোখে পড়েনি। হকি খেলা এখনও শান্তিপুরে রীতিমত হয় ব'লে মনে হয় না। তবে কৃষ্ণনগরে খেলাটির প্রচলন প্রচুর। কিন্তু নাম করার মত খেলোয়াড় এখনও বেরোয় নি।

আমার আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে এতদিনেও মোহনবাগান-ইস্টবেংগল হকি-দলে বাঙালী-খেলোয়াড়ের সংখ্যা আজও মুষ্টিমেয়। সর্বভারতীয় দলে তো বাঙ্গালী একজনও নেই। এর কারণ কী শারীরিক অপটুতা, না স্বাভাবিক অনীহা? লম্ফন-কুর্দন, দৌড় প্রভৃতিতে বাঙ্গালীর স্থান খুবই সংকীর্ণ। এইসব বিষয়ে পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের ক্রীড়াবিদ্দের অধিকার প্রায় অপ্রতিহত। বাঙালী সন্তরণ-বীরদের কৃতিত্ব অবশ্য সত্যিই শ্লাঘার বস্তু। দূর ও দুরূহ সিন্ধু-বিজয়-অভিযানে এমন কি মহিলা-সাঁতারুরাও দক্ষতার যে সাক্ষ্য রেখেছেন, তা' সারা বিশ্বের সম্ভ্রম আকর্ষণ করেছে।

এই সব খেলারও পর্যাপ্ত সুযোগ ছিল না তখনকার মফস্বলের স্কুলগুলিতে। 'সুস্থ দেহই সুস্থ মনের আধার'—এই মৌলিক তত্ত্বটা শিক্ষা-ব্যবস্থাপকেরা তখনো মেনে নিতে পারেন নি নীতিগতভাবে, তাই এদের অনুশীলনের ব্যবস্থাও ছিল না রীতিমত। এ ছাড়া অধি-কাংশ স্কুলেরই অর্থকোষ ছিল প্রায় শূন্য, কাজেই কর্তৃপক্ষের দাক্ষিণ্যও ছিল কুণ্ঠিত—নেহাতই দায়সারা-গোছের। স্কুলের না ছিল নিজস্ব খেলার মাঠ, না ছিল ক্রীড়া-শিক্ষক। পাড়ায় পাড়ায় যে সব ক্লাব ছিল তাতেই যোগ দিয়ে ক্রীড়া-কণ্ডূতি চরিতার্থ করতো স্কুলের ছেলেরা। 'ড্রিল্'-শিক্ষক একজন ছিলেন আমাদের স্কুলে; তিনি ড্রিল্-শেখানো ছাড়া ড্রয়িং-শিক্ষক ও করণিকের কাজও করতেন। উপরের ক্লাসের ছেলেদের হপ্তায় একদিন করে 'left-right'-এর রেওয়াজ ক'রতে হ'তো। বাস, ঐ পর্যন্ত। স্কুল-প্রাঙ্গণে ছোট বড় দুটি 'প্যারালেল্-বার্', আর একটা 'হোরাইজণ্টাল্-বার' ছিল; ব্যায়ামার্থীর সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। কিশোরীবাবু (আচার্য) নামে একজন মাঝবয়সী শিক্ষক স্কুলের ছুটির পর নিজে অনুশীলন করতেন এবং স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে তাদের তালিম দিতেন। ইনি আসতেন সুতরাগড় উপকণ্ঠের শেষ প্রান্ত থেকে। একটা না-জ্বালা লণ্ঠন হাতে ক'রে, প্রায় সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উদয় হ'তেন শান্তিপুরে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা

সব ঋতুতেই ঐ একই চাল। শীতের সময় চড়াতেন ভুটানী সোয়েটারের ওপর দুর্জয় ভারী পা-পর্যন্ত-লম্বা এক ওভারকোট, আর পায়ে পশমের মোজা। ভদ্রলোক তিব্বত-ফেরত, পোশাকগুলো সেখান থেকেই আনা। কর্মব্যপদেশে, কি খেয়ালের বশে সেখানে গিয়েছিলেন তা ঠিক জানা যায় না। ত্রিশের ওপর বয়স, মাত্র এন্ট্রান্স পাস হ'লেও শিক্ষক হিসাবে প্রভূত প্রতিষ্ঠা; তাই প্রাইভেট্ টুইশানির বাজারেও প্রচুর পসার। সকাল থেকে স্কুলের সময়ের মধ্যে গোটা তিন গৃহশিক্ষণ সেরে নিতেন। শেষ বাড়িতে পড়ানো শেষ ক'রে সেইখানেই ফরাসী-স্নান সেরে নিয়ে ভোজন-পর্ব সমাধা করতেন। বন্দোবস্ত এই রকমই ছিল। স্কুলের কাজ শেষ হ'লে কাছের এক ময়রা দোকান থেকে জলযোগ সেরে নিতেন। তারপর আবার স্কুলে ফিরে প্যারালেল্-বারে আধঘণ্টা আন্দাজ দেহচর্চা করতেন। ব্যায়ামের যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল তা নয়, কারণ তাঁর দৈনিক পথ-পরিক্রমা ছিল কম ক'রেও দশটি মাইল। কিশোরীবাবুর দেহচর্চার অভ্যাসটা ছিল মজ্জাগত। এদিকে তাঁর দক্ষতাও ছিল লক্ষণীয়।' ব্যায়ামার্থী স্বল্পসংখ্যক ছাত্রদের তিনি সাধ্যমত সাহায্য করতেন। তাঁর শরীরের ঊর্ধ্বভাগ ছিল পেশীবহুল ও পুষ্ট, সে তুলনায় পায়ের নীচের দিকটা দেখাতো বেমক্কা রকমের বেমানান। প্যারালেল-বার-এর নানা প্রকার হাত পায়ের কসরৎ দেখাতে তিনি ছিলেন ওস্তাদ্। আমরা অনেক সময় মুগ্ধনেত্রে তার ক্রীড়া-কৌশল দেখতাম। আমি ঠিক তার ছাত্র ছিলাম না, কিন্তু তাঁর বিদ্যাবত্তা ও কর্মনিষ্ঠার জন্যে তাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতাম। ব্যায়াম শেষ ক'রে স্কুলের ইঁদারার জলে হাত-পা-মুখ ধুয়ে মাস্টার মশায় আবার চলে যেতেন টুইশানির ঘানি টানতে। পর পর গোটা তিন বাড়ী পাঠন শেষ করতে রাত্রির দ্বিতীয় যাম অতিক্রান্ত হ'তো। লণ্ঠনটা ছাত্রদের বাড়ীতে কম ক'রে জ্বালানই থাকতো। মাস্টার মশায় সেটা টপ্ ক'রে তুলে নিয়ে পশ্চিম দিগন্তের দিকে পাড়ি

দিতেন। তাঁর পায়ে থাকতো খট্-খট্-শব্দ-করা বিরাশী সিক্কা ওজনের একজোড়া স্যু, তাঁর লিক্‌লিকে পায়ের সঙ্গে বেজায় বেখাপ্পা। শীতের রাতেও শয্যায়-জাগা নর-নারী তাঁর জুতোর খট্ খট্ শব্দ শুনে বুঝতে পারতো যে রাত তখন খাঁটি সাড়ে ন'টা। বাড়ী পোঁছে খাওয়া-দাওয়া সেরে শয্যায় যেতে বেজে যেতো সাড়ে দশটা-এগারটা। কয়েক ঘণ্টা নিশ্চিন্ত নিদ্রার পর প্রত্যূষে প্রাতঃ-কৃত্যাদি সেরে তিনি বেরিয়ে পড়তেন স্কুলের অভিমুখে। এই ছিল তাঁর নিত্যকর্মপদ্ধতি। তাঁর পথ-পরিক্রমা ছিল গ্রহপুঞ্জের ক্রান্তি-কক্ষ প্রদক্ষিণের মত অমোঘ। এই অবদাত-চরিত্র আচার্যের স্মৃতি চিত্রটি আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আমাদের ছেলেবেলায় (বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে) কিশোর ও আসন্ন-যৌবন তরুণদের জন্যে আমোদ-প্রমোদের আয়োজন ছিল খুবই অপ্রচুর। কোথায় ছিল আকাশবাণীর বেতারে শিশুমংগল, নেহরু-স্মরণে শিশুদিবস, গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে কিশোরদের "কোণ," তাদের জন্যে বিশেষভাবে পরিকল্পিত ও প্রযোজিত ছায়াচিত্র ও প্রদর্শনী কিংবা স্কুল থেকে যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম্ অথবা বোট্যানিকাল গার্ডেন প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়ে আনার ব্যবস্থা। ফলে তখনকার তরুণদের হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হ'তো রাস-রথের মেলা আর শীতের মরসুমে গণপতিবাবুর ম্যাজিক, কিংবা বোসের সার্কাসের বাঘ-সিংহের খেলার জন্যে। এই ম্যাজিক্-সার্কাসও যে ফি-বছর কপালে জুটতো তাও নয়। তবে রাসের মেলার নাগরদোলা আর ভাঙা-রাসের মানুষ ও পুতুল-সঙের খেলা দেখার সৌভাগ্য তাদের হ'তো প্রতি বছরই। এ সব ছাড়া আরও ছিল যাত্রা-পাঁচালী, তর্জা ও কবিগান, গাছ-রামায়ণ আর কথকতা। এগুলি থেকে তখনকার দিনে আমরা প্রচুর আনন্দ এবং সেই সঙ্গে শিক্ষাও পেয়েছি। বেশ মনে আছে বঙ্গবিশ্রুত কথক মোহনলাল গোস্বামীর মুখে মহাভারত কথা শুনবার জন্যে প্রতি সন্ধ্যায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছি। হাডুডু-ধাপ্সার প্রবল আকর্ষণ উপেক্ষা ক'রে মাঠের বদলে ছুটেছি মঠে; আগেভাগে গিয়ে আগের দিকে আসন-সংগ্রহের আগ্রহে। সে উদ্দীপনার তুলনা দেব কিসের সঙ্গে তাই ভাবছি। হয়তো শ্যামের বাঁশী শুনে এমনি ক'রেই ছুটতো ব্রজ সখা-সখীরা যমুনা-পুলিনে বংশীবটের অভিমুখে। তবে অকুণ্ঠকণ্ঠে স্বীকার করব ফুটবল্ 'ফ্যান্'দের দশ বিশ ঘণ্টা ধ'রে লাইন দিয়ে টিকিট সংগ্রহ ক'রে 'ম্যাচ্'

দেখার আগ্রহের কাছে এ হার মানে। সে যা হোক, গোঁসাই-জীর কণ্ঠে শুধু মধু নয়, ছিল যাদু—তাই দিয়ে তিনি এমন একটি আশ্চর্য আবহ সৃষ্টি করতেন, যে তা আবালবৃদ্ধ-বণিতা সকলের মনকেই টানতো সমান ভাবে; তাঁর মধুকণ্ঠ থেকে মাধুরী ঝরে পড়তো; গল্প বলার সে মোহন ভঙ্গি মোহনলালের নিজস্ব—তা' অনবদ্য ও অননুকরণীয়—কানে না শুনলে বিশ্বাস করা শক্ত। এ ছাড়া রাস উপলক্ষে আমদানী রেসো (অর্থাৎ খানদানী নয়) যাত্রা-গানও আমাদের কম আনন্দ দিতো না। পল্লী-অঞ্চলের দল, বেশ-বাস রঙ্-ঢঙ্ কিছুই ভদ্রস্থ নয়, কাজেই নাগরিক সামাজিকের রুচিকর ছিল না। কিন্তু আমার ও সমবয়স্ক অন্যান্য ছেলেদের এই অভিনয় প্রচুর আনন্দের খোরাক যোগাতো। অভিনেতারা ছোট বড় সকলেই অজ পাড়াগাঁ-এর বাসিন্দা। ম্যালেরিয়ার হস্তাবলেপের চিহ্ন অল্প বিস্তর প্রত্যেকেরই শরীরে; স্বভাব-কালো, গায়ের রঙ তাই আরও ঘোরালো। হাত পা কাঠি কাঠি হলেও উদরের অংশটা উদার। বুটো-জরির-কাজ-করা রঙ্-চটা নকল মখমলের রাজা ও সেনাপতির পোষাকগুলো ঢল্ ঢল্ করতো তাদের গায়ে; কিন্তু ম্যালেরিয়ার জারিজুরি খাটেনি কেবল একটি জায়গায়,—তনু ক্ষীণ হলেও কণ্ঠ পীন ছিল, আওয়াজ ছিল বাজখাঁই। প্রেম-দৃশ্যে দেবরাজ ইন্দ্র যখন প্রেমে গদগদ হ'য়ে ইন্দ্রাণীকে 'শচী' ব'লে সম্বোধন করতেন, আর উত্তরে দেবরাণী 'কেনো, প্রাণনাথো' বলে কিরকিরে কৃত্রিম নাকী স্বরে টেনে টেনে পাল্‌টা গাইতেন, তখন অতি বড় সহৃদয় শ্রোতারও এটাকে দাম্পত্য প্রীতির চিত্র ব'লে ভুল করা সম্ভব ছিল না। রঙ্-চটা আল্‌পাকার মোক্তারের পোষাকে সজ্জিত কণ্ঠীধারী জুড়ির দল যখন চারজন চার মুখে দাঁড়িয়ে সমবেত কণ্ঠে তারস্বরে তান ধরতেন, তখন কচি ছেলেমেয়েদের চমকে ওঠা কিছুই বিচিত্র ছিল না। একবার তো এক বৈষ্ণব জুড়ি বাঁ কানে হাত চাপা দিয়ে ডান হাত নেড়ে এমন তুড়ে তান ধরলেন যে কণ্ঠ চড়িতে আরও চড়াতে গিয়ে

কণ্ঠী ছিঁড়ে ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে প'ড়লো। জুড়ির জুনিয়ার ব্যাচ্ ছিল বালকের দল। গলাবন্ধ নকল কিংখাবের কোট থাকতো এদের গায়ে। রোগজীর্ণ শীর্ণ শরীর, কিন্তু উৎসাহ অপরিমিত। এরাও চার মুখে চারজন দাঁড়িয়ে গান গাইতো। গলা কারো কারো ভালই থাকতো; কিন্তু জ্বর-গায়েই যারা গাইতে উঠতো তাদের স্বর-কম্পনটাকে ঠিক গিটকিরির পর্যায়ে ফেলা যায় না। একটি বিশেষ করমুদ্রার আশ্রয় নিতো তারা গাইবার সময়, দু'হাতের আঙুলগুলো বুকের ওপর একত্র করেই দুপাশে সবেগে ছুড়ে দিতো; স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত চ'লতো এই প্রক্রিয়া; গান না থামা পর্যন্ত এর বিরাম ছিল না। এর নিহিত উদ্দেশ্যটা কি তা বলা শক্ত—হয়তো এটা দমকে বেদম করবার একটা কৌশল। এর ওপর ছিলো আবার সখী-নৃত্য। বেঁটে-মাঝারি-ঢ্যাঙা (ছ' ফুটের কাছাকাছি সখীও দেখা যেতো) কপ্‌নি-আঁটা ঘাগ্‌রা ও আঙ্‌রাখার ওপর ওড়না উড়িয়ে আসরে এসে একে একে যখন দর্শন দিত, তখন নাচ দেখার আগে তাদের দেখেই দর্শকদের মন ভুলে যেত। ক্ষীণ-পীন, হ্রস্ব-দীর্ঘ নির্বিশেষে একই আঙ্‌রাখা ঘাগ্‌রা সকলকেই পরতে হতো—কাজেই ঢ্যাঙার অঙ্গে কটি থেকে উরুতের মাঝ বরাবর নেমেই সেটা জবাব দিতো, নিম্নাঙ্গের অনেকটাই তাই অনাবৃত থাকতো, তারপর ঘুরে ফিরে পাক দিয়ে নৃত্য ক'রবার সময় যে বাহার খুলতো, তা যে না দেখেছে তাকে বোঝানো যায় না। চারদিকের চ্যাঙ্‌ড়া-মহল থেকে ঢ্যাঙার উদ্দেশে প্রশস্তি-বৃষ্টি হ'তো আর সেও উৎসাহিত হ'য়ে বাঁ হাত কোমরে আর ডান হাত ঊর্ধ্বে উত্তোলন ক'রে জলদাগমে শিখীর মত বহু নয়,—বাহু-বিস্তার ক'রে 'আরও ঘুরে ফিরে' নাচতে সুরু করে দিতো; ঘাগ্‌রা কিন্তু ঘুরতো না একটুও, কারণ কুঁচি বা ফাঁদ বলে কিছুই ছিল না তার ছাঁদে। এ ছাড়া, অভিনয়ের শেষে আসরে ব'সেই কৌশল্যা ও মন্দোদরীর হুঁকো-খাওয়ার সনাতন প্রথা যে বাহাল ছিল তা বলাই বাহুল্য। একবারকার এক বিপর্যয়-কাণ্ডের

কথা আজও বেশ মনে আছে। দুর্যোধনের উরু-ভঙ্গ পালা—অভিনয় তখন শেষ পর্যায়ে চরম সন্ধিতে পৌঁচেছে। দ্বৈপায়ন হ্রদের জলস্তম্ভ থেকে রণশ্রান্ত মহামানী দুর্যোধন সন্থ উঠে এসেছেন মহাবাহু বৃকোদরের ধিক্কারে উৎখাত হয়ে; মুখোমুখি দুই গদাবীর, অদূরে অপেক্ষা করছেন কৃষ্ণার্জুন; বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হ'লো বেশ কিছুক্ষন বাগ্‌যুদ্ধের পর। অয়েল-ক্লথের মধ্যে শিমুলতুলোভরা ভারী গদা দুজনের হাতে, তালিতে তালিতে আচ্ছন্ন। গদার সঙ্গে গদার সংঘাতে জীর্ণ আবরণ ছিঁড়ে তুলো ছড়িয়ে পড়ছে ইতস্তত। কিন্তু সান নেই রণমত্ত দুঃস্থদের। একেবারে শেষ দিকে দুর্যোধন এক বিপরীত কাণ্ড করে বসলো। বলবীর কৌরব দৈহিক শক্তিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পাণ্ডবকে ক্ষমা করলো না, দুর্বলের এই বেয়াদপি তার অসহ্য। সে ভীমকে কাত করে মাটিতে ফেলে তার উরুতে দমাদম বাড়ি মারতে লাগলো তালি-ফাসা গদা দিয়ে। এইভাবে ভীমের উরু-ভঙ্গ ক'রে রণরঙ্গে নিজের বিজয়ে উল্লসিত হ'য়ে উদ্যত গদা আস্ফালন করতে করতে সাজঘরের দিকে চম্পট দিলো। কি ভাগ্যি! ঝাড়ের শামাদানের কাঁচগুলো একটুর জন্যে বেঁচে গেলো। দোষ অধিকারীর; তাঁরই চালের ভুলে বানচাল হয়ে গিয়েছিল সেদিনের সেই পালাটা। ভীমের ভূমিকাটা তার দেওয়া উচিত ছিল তাকতের দিকে তাকিয়ে।

পেশাদার যাত্রা পার্টি ছাড়া সখের দলও ছিল দু-একটা শহরের মধ্যেই। সব জাতের লোকই ছিল এই সব দলে, তবে তাঁত-বোনা তাঁতীরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। দিনের কাজের শেষে কোনও খালি বাড়ির খোলা-ঘরে এসে এরা জমায়েত হ'তো এবং রাত দুপুর পর্যন্ত সমানে মহড়া দিত। গীত-বাদ্যের শাখাও সংশ্লিষ্ট ছিল এর সঙ্গে। এদের জলসা বসতো আর এক জায়গায়। তালিম চলতো গভীর রাত পর্যন্ত। আনদ্ধ, সুষির, ঘন, ও তত—চার বর্গের বাজনাই বাজানো হ'তো বৃন্দ-বাদ্যে। তবলা ও ঢোলক, করতাল ও খঞ্জনী, পিকলু ও এড়ো বাঁশী, ফ্লুট ও ক্ল্যারিওনেট, বেহালা ও সেতার কিছুই

বাদ যেতো না। এক প্রহর রাত থেকে নিষুতি রাত পর্যন্ত চল্‌তো এই বৃন্দ-বাদ্যের মহড়া। তন্দ্রিত পল্লী-প্রকৃতির নিথর নিঝুম বুক চিরে মন্দ্রিত হতো এই শ্রুতিসুখাবহ গভীর ঐকতান—জড়দেহে বেশ জেগে উঠতো জীবনের তরঙ্গ। এই সব সখের দলের যাত্রাগান মাঝে মাঝেই হ'তো—অভিনয়ের মান মোটামুটি উন্নতই ছিল, এবং স্থানীয় শ্রোতারা এ থেকে আনন্দও পেতো প্রচুর। অভিনীত নাটকগুলির অধিকাংশই পৌরাণিক, কদাচিৎ দু'একখানা ঐতিহাসিক নাটকও থাকতো। পুরুষরাই স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করতেন। অঙ্গ-রাগ ও রূপসজ্জাও নিখুঁত ছিল না, কাজেই দিনের কড়া আলোয় এই বৃহন্নলাদের দর্শকদের চোখে একটু বিসদৃশই লাগতো। গরমের দিনে চরমে উঠতো এই বৈসাদৃশ্য। পরচুলো-পরা মাথা আর টাইট্ জ্যাকেটের নীচে সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে উঠতো ; চুনকাম উঠে গিয়ে স্বরূপ বেরিয়ে পড়তো। গালের খাল-খন্দ আর কামানো দাড়ি-গোঁফের আমেজও দেখা যেতো মন্দ মন্দ। ফলে আবহটা হয়ে উঠতো শোকাবহ। এর ওপর যাত্রার পেটেন্ট্ টানের সঙ্গে বীরত্বব্যঞ্জক অঙ্গক্ষেপও অবশ্যই ছিল। সবচেয়ে উপভোগ্য হ'তো প্রেমদৃশ্যগুলো ; শৃঙ্গারের সঙ্গে বীররসের মিশ্রণে দ্বিগুণিত হ'তো দর্শন ও শ্রবণের আনন্দ। এই তো যাত্রাভিনয়ের কথা। এর ওপর আবার গজিয়ে উঠেছিল পাড়ায় পাড়ায় থিয়েটার ক্লাব। ক্ষীরোদ-প্রসাদের 'আলিবাবা'র তখন খুব নাম ডাক, শহরে পল্লীতে লোকের মুখে মুখে, "ছি ছি এত্তা জঞ্জাল," "বাজে কাজে মিনসেকে আর যেতে দেব না," "আমার কেমন কেমন ক'রছে কেন মন," ইত্যাদি গানের কলি। আবদাল্লা-মর্জিনার যুগল-নৃত্যের জোর মহড়া চলছে ক্লাবে ক্লাবে। করোনেশন্ ক্লাব খুললো পালাটা সকলের আগে। পর্যায়ক্রমে তারা দেখিয়ে বেড়াতে লাগলো পালাটা পাড়ায় পাড়ায়। মায়েদের সঙ্গে গেলো ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও। আমিও দেখলাম পালাটা। বোঝার বয়স তখনও হয়নি, তবে দেখে খুব ভাল

লেগেছিল এইটাই মনে আছে। "বোঁ বন্ বন্, সোঁ সন্ সন্" দস্যুদের এই গানের রসধ্বনিটা শুধু কান নয়, প্রাণ দিয়ে পান করেছিলাম। এর কয়েক বছর পরে ঐ ক্লাবেরই অভিনীত 'জয়দেব' নাটকটিও খুব নাম করেছিল, চলেওছিল এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় বেশ কয়েক রাত। নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন রাণাঘাটের খ্যাতনামা নট আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এতই চিত্তহারী হ'য়েছিল তাঁর অভিনয় যে আজও আমি ভুলতে পারি নি। পরাশরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রূপদক্ষ গায়ক ও নট অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়। আবৃত্তি ও আলাপে অনবদ্য হয়েছিল তাঁর অভিনয়। মৃদঙ্গ-সঙ্গতের সঙ্গে তাঁর সুধাকণ্ঠের 'এই ব'লে নূপুর বাজে'—গানখানি ভুলবার নয়। নাটকের রূপায়ণটিও মোটের ওপর মনোজ্ঞ ও রসোত্তীর্ণ হলেও অবান্তর কোন কোন ভূমিকায় ছোটখাট ত্রুটি যে না ছিল তা নয়। রসটা সময় সময় রসাভাসে পর্যবসিত হ'য়েছিল। রাজগুরুর ভূমিকা নিয়েছিলেন রামচন্দ্র সাহা, ইয়া দশাসই চেহারা—কাঁধ-পর্যন্ত-লম্বা, কুঞ্চিত কালো চুল, একমুখ ঘন-কালো গোঁফ-দাড়ি : তাই 'মেক্-আপ্' নিতে হয়নি তাঁকে। ললাট-পটে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক এঁকে, গেরুয়া বসন ও উত্তরীয়ে সজ্জিত হয়ে যখন তিনি দেবী-মন্দিরের প্রাঙ্গণে যূপকাষ্ঠের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন মনে হ'লো যেন কোন বীরাচারী তান্ত্রিক শবাসন ছেড়ে সদ্য উঠে এসে দাঁড়ালেন দর্শকদের দৃষ্টির সামনে। কণ্ঠও দেহের মত পূর্ণ ও পুষ্ট, শুধু 'র'-এর উচ্চারণটা ঈষৎ আড়ষ্ট ও দুষ্ট—মুখবিবর থেকে নির্গত হ'তো 'ড়'-এর আকারে। তাঁর আবৃত্তির ছোট্ট একটি টুকরো আজও আমার কানে বাজছে। শ্যামার শ্যামে রূপান্তর দেখে অভিমানক্ষুব্ধ সন্দেহদিগ্ধ রাজগুরু যখন ধাপে ধাপে কণ্ঠ চড়িয়ে আবৃত্তি ক'রে গেলেন—"কি কি, মা নাই আমাড়! হেড় ওই এলোকেশী দিগম্বড়ী ড়ুধিড়লোলুপা শ্যামা, লক্‌লকি কড়াল ড়সনা মাগিতেছে শিশুড় শোণিত! কি, কি মা নাই আমাড়"—তখন সেই উদাত্তকণ্ঠের

গম্ভীর আরাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো প্রেক্ষামণ্ডপ। টেম্পো যখন চরমে উঠেছে তখন ভিড়ের মধ্য থেকে কে এক ফক্কড় ছোক্‌রা তারস্বরে টিপ্পনী কেটে উঠলো 'Louder Please.' আর যাবে কোথায়? ক্লাবের শান্তিরক্ষী স্বেচ্ছাসেবকরা মার-মার করে উঠলো, আততায়ীকে ধরার জন্যে জোর তল্লাসি চ'ললো চারিদিকে, কিন্তু বৃথা, সে তখন জলের বুকে জলতরঙ্গের মত বেমালুম মিলিয়ে গিয়েছে ভিড়ের মধ্যে। দোষ নটের নয়, নাট্যকারের; কেন তিনি কি এই 'র' এর ফাঁদ না পাতলে পারতেন না?

জয়দেবের মাতব্বর পড়শী নিরঞ্জনের ভূমিকা যিনি নিয়েছিলেন তাঁর সমস্যা আবার একটু অন্য রকমের। ড় ও র দুইই শুদ্ধভাবে বেরোতো তাঁর মুখ দিয়ে, কিন্তু আবৃত্তির মুখে কেন জানি না, এরা ঠাঁই বদল করতো অনিবার্যরূপে। ঘর পুড়ে যাওয়ার পর অনুতপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত নিরঞ্জন আর্তকণ্ঠে যখন ব'লে উঠলো, "জয়া, জয়া, তবে আমাড় ঘড় পুরবে না তো পুরবে কাড়্" তখন সেই বিহ্বল বিলাপ সামাজিক জনের মনে যে রসের উদ্বোধন করেছিল, তাকে করুণ কিছুতেই বলা চলে না। ঘটনাটা ঘটা করে বলবার মত নয় কিন্তু এই সামান্যই অসামান্য হ'য়ে আমার স্মৃতির সম্পুটে আজও সঞ্চিত রয়েছে।

সে যা হোক, শান্তিপুরে থাকতে নানা নাট্যসঙ্ঘের আরও অনেক সামাজিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় আমি দেখেছি; কোনটা ভাল লেগেছে, কোনটা লাগে নি। কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে, যে দেখে দেখে নাট্যরসের নেশা মনে ধরে গিয়েছিল এবং নিজেরাও লেগে গিয়েছিলাম একটি সঙ্ঘ গঠন করে অভিনয়ের আসরে নামতে। উত্তরকালে সাধারণ রঙ্গপীঠে অভিনয় করে যাঁরা দেশজোড়া নাম করেছিলেন, আশুতোষ লাহিড়ি (ছোট্টু লাহিড়ি), ললিতমোহন লাহিড়ি, নির্মলেন্দু লাহিড়ি, পূর্বতন দিনের প্রখ্যাত নট অবিনাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (ন্যাশনাল

থিয়েটার কর্তৃক অভিনীত জয়দেব নাটকের পরাশর), স্টার থিয়েটারের কাশী চট্টোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী—এঁরা সকলেই শান্তিপুরের অধিবাসী। রূপদক্ষ এইসব নটের কলা-নৈপুণ্য আমাদের চোখ খুলে দিয়েছিল। পল্লী-প্রস্থের একটি কেন্দ্র থেকে এতগুলি বিশিষ্ট রঙ্গশিল্পীর আবির্ভাব থেকেই বোঝা যায় এখানকার অভিনয়-মানের উৎকর্ষ। শুনেছি বলিদান-নাটকে ছোট্টুবাবুর করুণাময়ের ভূমিকার অভিনয় দেখে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। কলকাতার প্রথিত নাট্যসঙ্ঘ 'ওল্ড্ ক্লাবের' সম্পাদক ও নাট্যশিক্ষক ছিলেন তিনি ; শিশিরকুমার, নরেশচন্দ্র, রাধিকানন্দ ও নির্মলেন্দু তাঁর কাছে অভিনয়ের তালিম নিয়েছেন। 'জয়দেব'-এর অবিনাশচন্দ্রের উদাত্ত কণ্ঠের 'এই বলে নূপুর বাজে' যারা শুনেছে তাদের কানে এখনও সেটা বাজছে। এ যুগের রঙ্গ-রসিকদের কাছে অহীন্দ্র-নির্মলেন্দুর পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। হাস্য-রসের অভিনয়ে কাশী চট্টো ছিলেন অদ্বিতীয় ; নাট্যনৃত্যেও তাঁর খ্যাতির কথা শুনেছি। এ ক্ষেত্রে নৃপেন (ন্যাপা) বোসের মত তার নাম দূরবিস্তৃত না হলেও কাশীবাবু তার কাছাকাছি ছিলেন। যা হোক, ইতিবৃত্তের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে অভিনয় সম্পর্কে নিজেদের নয়া নিরীক্ষার কথাই এবার বলি। স্থির হলো, মামুলি নাটকের পুরানো কাসুন্দি না ঘেঁটে একটা টাটকা নাটক নিয়েই হাত পাকানো যাক্। তখন কলেজের তাজা পড়ুয়া আমরা ; কাল্‌চারের ওপর বেজায় দম। ঠিক করলাম, রবীন্দ্রনাথের কোন নাট্যকাব্য নিয়ে আসরে নামতে হবে। নির্বাচনটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো 'রাজা ও রানী' আর 'বিসর্জনের' মধ্যে। আলোচনায় 'রাজা ও রানী'র দাবী পরিহৃত হ'লো নাট্যসন্ধি ও সংঘাতের অভাব এবং গীতি-প্রবণতার প্রাধান্যের কারণে। তাছাড়া স্বয়ং কবি নাকি একে ঠিক অভিনেয় বলে মনে করেন নি। যে সময়ের কথা বলছি, 'তপতী' প্রকাশিত হয় তার অনেক পরে। সদস্যদের অধিকাংশের

সমর্থনে "বিসর্জনের"ই জয় হ'লো। তালিম দিতে গিয়ে মালুম হলো ছন্দ-আবৃত্তির এলেম সকলের নেই। গদ্যাংশের সংলাপ অভিনেতাদের মুখে বেশ জমছে বটে, কিন্তু ছন্দের অংশটা তেমন খুলছে না—কারো কারো মুখে বেশ একটু খোঁড়াচ্ছে। যা হোক জোড়াতালি দিয়ে কোন রকমে পালাটা তো খাড়া হ'লো—এখন সাজ পোষাকের কি করা যায়। সকলেরই সাধ, প্রসাধক সহ প্রসাধন-দ্রব্যগুলি আনা হয় কলকাতা থেকে, কিন্তু অর্থকোষের কৃচ্ছ্র তাই বাদ সাধলে' সে সাধে। বাড়ি-বাড়ি চাঁদা সেধে যা আদায় হয়েছে, তাতে সে বাড়াবাড়ি করা চলে না। অগত্যা শরণ নিতে হ'লো অধমতারণ লক্ষ্মীতলা-যাত্রা পার্টির সাজ-পোষাকের। জিনিসগুলো খেলো নয়, এক সময় বেশ খরচ ক'রেই করা হয়েছিল; কিন্তু দীর্ঘদিনের অবহেলায় যে অবস্থায় তারা পৌঁচেছে তাতে ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া চলে না। কিন্তু উপায় কি? একটু ঝেড়েঝুড়ে রোদ খাইয়ে নিলে ভ্যাপসা গন্ধটা অন্তত যাবে তো! তবে ভাবনা কেবল ঐ পরচুলোগুলো নিয়ে; তৈল-নিষেক ও সংস্কারের অভাবে যে পর্যায়ে তারা পৌঁচেছে, তাতে রাজরানী ও মুনিঋষির কেশের মধ্যে তফাত করা শক্ত। আমাদের জয়সিংহটী বেঁটে-খাটো মোটাসোটা মানুষ, মুখখানিও গোলগাল; তাঁর মাথায় রুক্ষ কেশভার চাপিয়ে দিয়ে রক্তচন্দনে ললাট চর্চিত করে, গেরুয়া রঙের আলখাল্লা (যা গেঞ্জির মত তাঁর পীনাঙ্গে কেঁপে বসেছিল) পরিয়ে আয়নার সামনে ছেড়ে দেওয়া হলো। কাঁচের গায়ে নিজের চেহারাটা এক চমক দেখেই চমকে উঠে তিনি বললেন 'আমি নামবো না।' অনেক সাধ্য-সাধনা করে তাঁকে রাজি করা হলো রঙ্গপীঠে অবতীর্ণ হ'তে। এই তো গেল রূপসজ্জার ব্যাপার। বিশেষ সাধনা না করেই প্রসাধনের জন্যে পাওয়া গেল ভিন পাড়ার একটি ছেলেকে। সাজানোর সাধ ও সাধ্য দুই তার আছে। এরপর বাকী শুধু মঞ্চমণ্ডপের অংশটা। স্থির হলো বড় গোঁসাইপাড়ার স্টেজটা আনা হ'বে; আকারে

একটু ছোট হ'লেও দৃশ্যপটগুলো ভালো পটুয়া দিয়ে আঁকানো, রঙ-চটা ধুল্-ধুলে নয়; আর 'উইং'গুলোও মানানসই; নদীর ঢেউ-খেলানোর উপকরণও আছে। তা'ছাড়া সহজেই পাওয়া যাবে, এর-ওর দুয়োরে ধর্না দিয়ে বেড়াতে হবে না। বাস্, আর কি? এলো দৃশ্যপট, এলো উইং, খাড়া হলো রঙ্গমঞ্চ। অভিনয়ের দিন-ক্ষণও বিজ্ঞাপিত হ'লো পাড়ায় পাড়ায়। বাঙ্‌লা-স্কুলের অনতি-পরিসর প্রাঙ্গণে উন্মুক্ত অম্বরের নীচে প্রেক্ষাভূমি, পিছনের প্রশস্ত পূজার-দালানে মেয়েদের বসার ব্যবস্থা। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে থেকেই দলে দলে দর্শক সমাগম হতে লাগলো; শেষে ভীড় যা দাঁড়ালো তাতে তিল ধারণের স্থানও রইলো না কোনখানে। যা হোক, কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটার ঘণ্টা বাজলো, নেপথ্যে বাদ্য-বৃন্দ বেজে উঠলো এবং সেটা শেষ হতেই উঠলো যবনিকা। রানী গুণবতীর 'মা'র কাছে কী করেছি দোষ' দিয়ে সুরু হলো পালা। ছেলেটিকে মেয়ের সাজে সাজিয়ে মানিয়েছিল ভালো, পরে শুনেছি মেয়েরাও হিংসা করেছিল। তাতেই মাত—অভিনয়ের ভাল-মন্দের প্রশ্ন কেউ আমলেই আনলো না। রাজা গোবিন্দমাণিক্যের ভূমিকা নিয়েছিলেন একজন সুদর্শন তরুণ। তাঁর নিজেরই ছিল নিকষ কালো কুঞ্চিত বাবরি চুল। পরচুলো্র পরোয়া তাঁকে ক'রতে হ'লো না। এর গলায় ট্রিমলোর খেলা; তার 'ট্রেমর' গিয়ে লাগলো একটি সহৃদয় শ্রোতার কানে এবং সেখান থেকে সোজা তাঁর প্রাণে। উদ্দীপনায় চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'super excellent tone'. অভিনেতাও ইঙ্গিতটা অনুমানে বুঝে কম্পনের বহর আরও বাড়িয়ে দিলেন। এরপর বলতে হয় রঘুপতি জয়সিংহ সম্বন্ধে দু'চার কথা। এঁরাই তো জুড়ে আছেন নাটকের সমগ্র পটভূমিটা।

স্থান—দেবী-মন্দির; অপেক্ষমান রাজগুরু রঘুপতি ক্ষণপরেই প্রবেশ করলেন। পুত্রপ্রতিম শিষ্য জয়সিংহ শূন্যহাতে, মনের ভুলে

আনতে ভুলেছেন ভৃঙ্গার-ভরা পাত্র। বলার কথা ছিল, "গুরুদেব আনিয়াছি জল", রঘুপতির উত্তর ছিল, "থাক রেখে দাও জল।" কিন্তু বুদ্ধিমান জয়সিংহ পরিস্থিতি সামলাবার জন্যে বানিয়ে বললেন, "গুরুদেব আনিব কি জল ?" রঘুপতিও যদি সমান প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়ে "থাক, কাজ নাই", বা ঐ জাতীয় অন্য কোন উত্তর দিতে পারতেন, তা'হলে সংকটটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হতো। কিন্তু, তা হলো না, তিনি ঘাবড়ে গিয়ে ব'লে ফেললেন, "লয়ে এসো।" জয়-সিংহও সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন জল আনতে ; যে পথে আগমন সেই পথে নিষ্ক্রমণ। এটা অভিনয়ের আইন মোতাবেক হলো বটে, কিন্তু গাড়ু-গামছা যে সাজানো আছে ওদিকের উইং-এর ধারে! কি ক'রে উদ্ধার করা যায় ও দুটো ? ফেলা আছে যে একেবারে শেষের সীন্‌টা। বিপুল বপু নিয়ে 'দুর্গা' বলে ঝাপ দিয়ে পড়লেন পিছনদিকের উঠানে—আর উদার উদরের ঠেলা দিয়ে পটের পর্দাটা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে ঠেলে উঠলেন ওপারে। কিন্তু হায়, গিয়ে দেখলেন গাড়ু উধাও ; জনৈক মাননীয় বৃদ্ধ নাকি সেটা নিয়ে গিয়েছেন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে। জয়সিংহ বেচারা কোন চারা না দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসতে যাচ্চেন, এমন সময় চাতকের ফটিক জলের মত এসে পড়লো বড় আশার সেই গাড়ুটা। ছোঁ দিয়ে সেটা তুলে নিয়ে নিয়ে আর ঘোর প্যাঁচ না ক'রে সোজা পথেই ঢুকে পড়লেন রঙ্গমঞ্চের ওপর। রঘুপতি এতক্ষণ পিঠের দিকে দু'হাত এক ক'রে খাঁচার বাঘের মত ক্রমাগত পায়চারি আর বিরক্তিব্যঞ্জক মুখভঙ্গি করে কালক্ষেপ করছিলেন। জয়সিংহ ফিরে এসে অনুতপ্ত কণ্ঠে, "গুরুদেব, আনিয়াছি জল" বলতেই গুরুদেব একেবারে ফেটে প'ড়ে ব'লে উঠলেন, "থাক, রেখে দাও জল"। বিলম্বটা প্রলম্বিত হওয়ায় অভিনয়টা খুব 'natural' হয়ে গিয়েছিল—অন্তত সেই রকমই শুনেছি পরের দিন লোকের মুখে। এক কড়া ফাঁড়া কাটলো এইভাবে। এ ছাড়া ছোটখাট আবৃত্তির ত্রুটি কারো কারো রয়েই গেল। বহু চেষ্টাতেও

দেওয়ান চাঁদপালের উচ্চারণের একটা মারাত্মক ত্রুটি শেষ পর্যন্ত কিছুতেই গেলো না। এও শ্রোতাদের শ্রুতিতে আসতো না, যদি তিনি পাল্‌টে শোধরাতে গিযে উল্‌টোপাল্‌টা বলে না ফেলতেন। "ভীরু আমি ক্ষুদ্র-প্রাণী, বুদ্ধি কিছু কম" এই বাক্যের 'ক্ষুদ্র-প্রাণী' শব্দ দুটো কিছুতেই বাগাতে পারলেন না। "ভীরু আমি ক্ষুদ্দ প্রাণী" বলেই ভুল সামলাতে গিয়ে জিব কেটে দ্বিতীয় বার ব'লে উঠলেন 'ক্ষুদ্র-পাণী'। পর পর দুটো 'র'-ফলার ফলা রসনা সইতে পারলো না।' এ-নাটকের কথা এই পযন্ত।* কিন্তু, একটু খিঁচ তবুও রইলো। আগেই বলেছি আলখাল্লাটা কেঁপে বসেছিল জয়সিংহের বর কলেবরে। গ্রীষ্মের উষ্মায বাহুমূল হ'য়েছিল আমূল স্বেদরসে সিক্ত। আলখাল্লার [illegible]ষ্টিনের ঐ অংশটাও অনিবা[illegible]য কারণেই হয়েছিল আর্দ্র। আবেগব্যঞ্জক কি একটা বলতে গিয়ে যেই ডান হাত তোলা, অমনি বগলের আগল গেলো খুলে—সেলাই বরাবর গেলো ফেসে। বাঁ হাত তুলতে গিয়েও হ'লো একই অবস্থা। এর পর থেকে হাত তোলা ছেড়ে দিলেন তিনি (বোধ হয় গুনোগারের ভয়েই); শুধু তুন্দের একটু ওপরে দু হাতের দুই তালু তুলে ধরে অর্ধ-বৃত্তের আকারে আবর্তিত করে যেতে লাগলেন সমান তালে। হস্তাভিনয়ের ক্ষেত্রে এটাকে একটা নতুন পদক্ষেপ (হস্তক্ষেপ?) বলা যেতে পারে নির্বিবাদে।

* কথাটা বলতে গিয়ে বাক্-স্খলনের (spoonerism) আর একটি কৌতুককর ঘটনার কথা মনে পড়ে গেলো। অন্য কোন্ এক দলের কি এক নাটকের অভিনয়ে কুশীলবদের একজনের বলবার কথা ছিল, "এ দলিল জাল।' অভিনয়ে ভদ্রলোকের সবে হাতেখড়ি, ঘাবড়ে গিয়ে ব'লে ফেললেন —"এ জলিল দাল।' শ্রোতাদের হাস্য-গুঞ্জন কানে আসতে তাড়াতাড়ি শুধরে নিতে গিয়ে দ্বিতীয় দফায় বললেন, "এ দাল জলিল।" এরপর প্রেক্ষামণ্ডপে এর প্রতিক্রিয়া যা হয়েছিল, তা সলিলের মতই স্পষ্ট, কষ্ট করে অনুমান করতে হবে না নিশ্চয়ই।

আমাদের পরের নাটক ডি. এল. রায়ের 'পাষাণী'। আধা পৌরাণিক অর্থাৎ আখ্যানবস্তুর আধার পুরাণ হ'লেও ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণ কবির নিজস্ব। চম্পূ-জাতীয় নাটক এটি—গদ্য-পদ্যের সংকর। তাই বলে বিসর্জনের মত নাট্যকাব্য নয়। যুক্তির খনিত্র দিয়ে খনন ক'রে কবি উদ্ধার করেছেন এর নিভৃত তাৎপর্যটি। অহল্যার পাষাণত্বের প্রকৃত হেতুটা খুঁজে পেয়েছেন তার প্রকৃতির মধ্যে, অভিশাপের মধ্যে নয়। বিসর্জনে জয়সিংহের—"ওই তো সম্মুখে পথ চলেছে সরল" ইত্যাদি উক্তির মধ্যে, শুক্তি-গর্ভে মুক্তার মত যে কাব্য-সম্পদ নিহিত, তার নামগন্ধও নেই এই নাটকে। নিতান্তই বস্তুধর্মী এই নাটকটি। অভিনেয় বলেও ঠিক মনে হয় নি আমাদের; শুধু একটা নতুন কিছু করার লোভেই প্রবৃত্ত হয়েছিলাম এর রঙ্গ-রূপায়ণে। উতরেছিলও মন্দ নয়, তবে মহড়ার গোড়ায় পোড়াতে হয়েছিল বিস্তর কাঠ-খড। একটি মাতালের ভূমিকা ছিল এই নাটকে—সেটা বেল্লিকভাবাপন্ন, রসিকম্মন্য গৌতম-শিষ্য চিরঞ্জীবের।* যে যুবকটির কাঁধে পড়েছিল অভিনয়ের ভার, বইবার শক্তি তার ছিল যথেষ্টই; কিন্তু জলপথে চলাচলের অভ্যাস না থাকায় তার ঢঙে মাতালের রঙটি ঠিক লাগছিল না। সে ট'লে ট'লে ঢ'লে ঢ'লে পড়ছিল খুবই, "কেয়াবাত, তোফা" বলে তারিফও করছিল কেউ কেউ, কিন্তু অনেকেরই এতে মন উঠছিল না, তারা সুরা- ও সুরঙ্গ নুটুদাকে দিয়ে একবার দেখিয়ে নেওয়াই ভালো মনে করলো। ধরা হ'লো নুটুদাকে, অনুরোধ এড়াতে না পেরে তিনি একদিন এলেন নিজের কাজ ফেলে। নুটুদা কখনো চোখ খুলে, কখনো চোখ বুঁজে মহড়াটা খুঁটিয়ে দেখে এবং শুনে রায় দিলেন, "গোঁসাইজী, 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি' গাইতে গাইতে ঢ'লে ঢ'লে পড়া তোমাদের সাধনের অঙ্গ তা জানি,

* ঋষিশিষ্য মাতাল, শুনে আশ্চর্য হচ্চেন? না, না। তিনি মদ্যপ ছিলেন না, ছিলেন সোমপ। আর সোমরস পান যে সেকালে প্রশস্ত ছিল, খোদ ঋক্‌বেদে তার ভূরিভূরি প্রমাণ আছে। গোটা মণ্ডলটাই সোমরসের প্রশস্তি।

কিন্তু টলা আর চলা এদু'য়ের মধ্যে তফাত আছে একটু ; তোমরা চ'লে টলাও আর আমরা ট'লে চলাই। তা' দেখ, এক কাজ করো, পায়েরটা একটু গলায় দাও, বিলকুল ঠিক হো যায়েগা।" জহুরীর যাচাই, এর ওপর আর কথা নেই। রায় মানতেই হ'লো, ফলও হাতে হাতে ; পায়ের টলন কমিয়ে আর গলার স্খলন বাড়িয়ে পার্টটা সত্যিই উত্‌রে গেলো। খাঁটি-খোরের খাঁটি বাত কি ঝুটা হয় কখনো ? মনে রাখবেন ইনিই সেই পুরুষোত্তম—একখানা হিন্দি গান গাইতে বলায় যিনি হাত নেড়ে তান ধরেছিলেন "হামারে হাস্‌তে ব'লে হেতো অপমান ক্যার্‌রা", রাগের মধ্যে 'ঝিঁঝিট-খাম্বাজ', আর তালের মধ্যে 'যৎ' যাঁর কাছে ছিল চরম ও পরম। একটা কথা এখানে জানিয়ে রাখি : আমাদের অভিনয়ের পরে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার সাধারণ মঞ্চের আসরে নেমেছিলেন এই নাটকটি নিয়ে, কিন্তু বেশি দিন চলেনি সেটা ; 'সহৃদয়' শ্রোতারা হৃদয় দিয়ে একে গ্রহণ করতে পারেন নি।

এর পরের নাটক 'রাজা গণেশ'। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রসিদ্ধ উপন্যাসটিকে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন আমাদের পাড়ার সচিদা। নাট্যরূপটি এতই উপাদেয় এবং অভিনেয় হয়েছিল যে স্বয়ং শিশির-কুমার এটিকে মঞ্চস্থ ক'রবেন মনস্থ করেছিলেন। প্রাচীরে প্রাচীরে প্রচার-পত্রও মারা হয়েছিল এই মর্মে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাটকটি পরিত্যক্ত হয় কোন অজ্ঞাত কারণে। জনশ্রুতি, রাজনীতির দিক থেকে সরকারের আপত্তিই নাকি কারণ। সে যা হোক, আমরা মঞ্চস্থ ক'রেছিলাম নাটকটা এবং আঙ্গিক ও বাচিক দু'দিক থেকেই অভিরূপ হ'য়েছিল এই অভিনয়। রঙ্গপীঠ ও পট, রূপসজ্জার সম্ভার সবই হ'য়েছিল যথাসম্ভব যথাযথ এবং এর সঙ্গে আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ের উৎকর্ষ যুক্ত হ'য়ে রূপায়ণটিকে ক'রেছিল সত্যিই উপভোগ্য। একজন সুদক্ষ নাট্যশিক্ষকের প্রশিক্ষণের গুণেই সম্ভব হয়েছিল এটা। তাই ব'লে ভুল ত্রুটি ঘটেনি কোনখানে কিংবা

কারো অভিনয়ে, এটা মনে ক'রলে ভুল হবে। তাছাড়া, প্রেক্ষকদের দৃষ্টির অন্তরালে নেপথ্যশালায় যে প্রহসনের অভিনয় চলেছিল জনৈক নবীন নটের রূপসজ্জার আতিশয্যকে কেন্দ্র করে, সেটিও কম উপভোগ্য ছিল না। কিন্তু সে ছবিটি তুলে ধ'রলাম না আপনাদের সামনে প্রসঙ্গ-ভঙ্গের ভয়ে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের নিখুঁত অনুকৃতিই তখন গণ্য হ'তো সাফল্যের নিদর্শনরূপে। সে প্রত্যাশা অনেকটা পূর্ণ হয়েছিল এবারকার অভিনয়ে, আমাদের গর্বমিশ্রিত আনন্দ বোধ এই কারণেই। এর ধারা আজও চ'লছে; কিন্তু আমাদের রঙ্গ-জীবনের রঙ্গশেষ এইখানেই।

শান্তিপুরে স্কুলের পালা শেষ ক'রে কলকাতায় এসে ভর্তি হ'লাম স্কটিশ্ চার্চেস্ কলেজে। বাসা নিলাম আহিরিটোলার আনন্দ খা লেনে মামার বাড়িতে। সরীসৃপাকৃতি সরু এঁদো গলির ওপর ছোট দোতলা বাড়ি। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ। কলেজ করতে হ'তো ঝাড়া দেড় মাইল পথ পায়ে হেঁটে। কষ্ট হতো না একটুও। কলেজ থেকে বাসায় ফিরে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ সেরে নিয়ে আবার বেরিয়ে প'ড়তাম আর একচক্র পথপরিক্রমায়—উদ্দেশ্য সুহৃৎ-সঙ্গম। বাস-এর চলন শুগনো হয় নি শহরে, গোনা গোটা কয়েব রাস্তায় চ'লতো ট্রাম্; তা ছাড়া থলিও খালি। কাজেই বন্ধু-মিলনের পর্বটাও সারতে হ'তো পায়ে হেঁটেই। কলেজ যাওয়া যদি বা বাদ প'ড়তো কোনদিন কোন কারণে, সান্ধ্য-সঙ্গমটা বাদ যেতো না একটি দিনও। অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু দুজন—রমেন আর ভূপেন থাকতো সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট্, আমহার্স্ট্ স্ট্রীট্ অঞ্চলে—দুজনেই প'ড়তো সিটি কলেজে; মিলনের মুখ্যকেন্দ্র ছিল হেদো আর গোলদীঘি; ক্বচিৎ কখনো বীডন্ বাগানেও ব'সতো মজলিস। ভাল খেলা (ফুট্বল) থাকলে ধাওয়া ক'রতাম ক্যালকাটা মাঠে—সেও অন্তত এক পিঠ (আন্দাজ মাইল তিন-চার) পায়ে হেঁটে। এ কালের ছেলেরা বাস্-ট্রামের এই যুগে দূর দূর ঘাঁটি থেকে পায়ে হেঁটে এই পাড়ি জমানোর প্রয়াসকে নিছক বাতিক ব'লেই উড়িয়ে দেবে। অথচ এই দুঃসাধ্য সাধন আমরা প্রায় প্রতিদিন করেছি এবং সস্তায় কিস্তিমাত্ ক'রে পস্তাইনি একটুও। সেকালের সঙ্গে একালের তুলনার সুবিধার জন্যেই ঘটনাটা তুলে ধ'রলাম এখানে, বিশেষের মধ্য দিয়ে সাধারণের ইঙ্গিতই আছে এর মধ্যে। মাঠের আড্ডা উঠে আসতো ঘরে দৈবাৎ কোন কোন দিন—সকলে মিলে চ'লে যেতাম ওয়ান্-হস্টেলে ঘরকুনো পন্নানকে

ঘরের বাইরে টেনে আনতে, কিন্তু পাল্লায় প'ড়ে চাল বদলাবার পাত্র ছিল না সে। হাল ছেড়ে আমরাই শেষটা ব'সে যেতাম তার ঘরে আড্ডা জমাতে।

সেখানে পরান ছাড়া আরো দু'চারজন নতুন বন্ধুর সহযোগে আড্ডাটা হয়ে উঠতো জম-জমাট। তারপর সন্ধ্যা ঘনাবার আগেই বাড়ী ফিরবার তাগিদে ঊর্ধ্বশ্বাসে যে-যার ডেরায় ফিরে যাওয়া। একটা অভাবের বেদনা এই বন্ধু-মিলাপের ফাঁকে ফাঁকে আমার মনে উঁকি দিতো। চিরদিনের ফুটবল খেলার রেওয়াজ যে ছাড়তে হয়েছিল, এর দুঃখ মনের মধ্যে কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করতো। রমেন আর ভূপেনের সে বালাই ছিল না; দুজনের কেউই রীতিমত ফুটবল খেলে নি। রমেন করতো ডন-বৈঠক, প্যারালেল বার, আর ভূপেন দেখতো ম্যাচ। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস প্রভৃতির বিভিন্ন আঙ্গিকের রূপ-কল্প ছিল তার নখ-দর্পণে। দুনিয়াভোর এই সব খেলার রেকর্ড তার ঠোঁটস্থ ছিল। খেলার কথা উঠলে তার মুখে তুবড়ি ছুটতো; তার মেধার পরিধি দেখে আমরা হতবাক্ হয়ে যেতাম। এর থেকে এবং এই জাতীয় আরো দু'একটা দৃষ্টান্ত দেখে আমার ধারণা হয়েছে এই যে, রেকর্ড-পঞ্জী মুখস্ত করে তারাই বেশী, খেলা-ধূলো যারা নিজেরা করেছে কম। খেলার নেশায় যারা মশগুল, রেকর্ড্ ঘাঁটার তাদের ফুরসৎ কোথায়? তবুও এই জাতীয় প্রেক্ষকেরও প্রয়োজন আছে, খেলোয়াড়েরা কেরামতি দেখায় এদেরই মুখ চেয়ে! এদের না হ'লে খেলা জমে না,—সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে ক্রিকেট-ম্যাচ দেখা তপস্যার মত দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। মজলিস্-মাইফেলে সমঝদারের অনুরূপ এরা; এদের কণ্ঠে সুরের নাম-গন্ধও নেই হয়তো, কিন্তু তাল, মান, লয় অথবা সুর-সারের এতটুকু ত্রুটি ঘটলে এই অসুরদের দল প্রলয় ঘটাতে পারে। হাতে তাল বাজিয়ে এরা সমর্থন জানায়; উল্টো মাথা নেড়ে জানায় অসন্তোষ। খেলা দেখার খেলায় মত্ত যারা, খেলা শেখার ধার তারা ধারে না,—তাদের নজর থাকে নজীরের দিকে।

শেখে যারা যত কম, লেখে তারা তত বেশী, এই হ'লো সাধারণ বিধি, ব্যতিক্রম অবশ্য আছে।

খেলাধুলার টিপ্পনী ছেড়ে লেখাপড়ার প্রসঙ্গে এইবার নামি। বলা বাহুল্য, স্কুল-জীবন থেকে কলেজ-জীবনে প্রবেশের এই পর্বটা বেশ একটু রোমাঞ্চকর। অতীতের সঙ্গে অনাগতের, প্রাপ্তির সঙ্গে প্রত্যাশার যোগে কেমন যেন রহস্যময়। সমুদ্র যে দেখেনি আগে, তার কাছে মহাম্বুধির দূরশ্রুত তরঙ্গ-সঙ্গীত যেমন একটা সম্ভ্রমভরা ভয়ের ভাব জাগিয়ে তোলে মনে, এ যেন কতকটা সেই রকম, এ যেন নব পাঠ-পীঠে জীবনের অভিনব উজ্জীবন। পড়া-দেওয়া-নেওয়ার কোন ব্যাপারই নেই এখানে—বহুশ্রুত অধ্যাপকরা শুধু "লেক্‌চার" দেন আর ছেলেরা উৎকর্ণ হয়ে তাঁদের ভাষণ শোনে এবং মূল্যবান অংশগুলি সযত্নে 'নোট' করে নেয়। এই ধরণের অনেক কথা কলেজ-বন্ধুদের মুখে শুনেছি। কলেজে এসে সেই প্রত্যাশা যে পুরোপুরি মিটেছিল তা বললে বেশি বলা হবে ; তবে নূতন পরিবেশে শাসনমুক্ত স্বাধীনতার স্বাদটুকু যে বেশ উপভোগ্য হ'য়েছিল তা নিঃসংকোচে বলতে পারি। বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে অধ্যাপকদের আকৃতি ও প্রকৃতির বৈচিত্র্যের চিত্রও এসে পড়বে অনিবার্যরূপে।

সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন তিনজন,—কালী, নন্দ ও বিহারী পণ্ডিতমশাই। তিনজনই বিশিষ্ট,—অধ্যাপনা এবং চরিত্র-বৈচিত্র্যে। কালী পণ্ডিতমশায়ের বাইরের চেহারাটা ছিল শুকনো খেজুর গাছের মত। ভেতরটাও ছিল খেজুর গাছের মতই রসে টইটম্বুর—দায়ের একটু আলতো কোপেই ঝরঝর করে ঝরে পড়তো রস। এঁর রস-বষণ ছিল না কোন কালের অধীন, ছিল স্বাধীন ও সর্বকালীন। এইখানেই খেজুর গাছের ওপর তাঁর টেক্কা। সংস্কৃত, বাঙ্‌লা, ইংরাজি অবলীলায় অনর্গল বলে যেতে পারতেন, বাগ্‌ধারা ধ্বনিগম্ভীর অথচ শ্রুতিরসায়ন। মনে পড়ছে 'রঘু-বংশম্' কাব্যের 'তস্যাঃ খুরন্যাস-

পবিত্রপাংশুম্' এই বাক্যাংশের প্রতিশব্দ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'পাদপাতপূতরজস্কম্'। পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে কোন ছেলে ক্লাসে ঢুকলে ভৎ'সনাচ্ছলে 'হে উচ্ছৃঙ্খল যুবকবৃন্দ' ইত্যাদি উদাত্ত সম্বোধন দিয়ে স্বরু করে হঠাৎ খাদে অনুদাত্তে নামতেন; ইংরাজি অলংকারের Bathos-এর সুন্দর দৃষ্টান্ত। পণ্ডিতমশায় পাঠনের প্রথমেই অধ্যেয় শ্লোকগুলি পর পর আবৃত্তি করে যেতেন গভীর আবেগভরে। উচ্চারণের দিক দিয়ে তাঁর আবৃত্তিকে নিখুঁত কিছুতেই বলা চলে না; নিতান্তই বাঙ্‌লা ধরণের উচ্চারণ, শ্রুতিরম্য হ'তো শুধু তাঁর দরদের গুণে। রঘুবংশের ক্লাস; শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করে চলেছেন তিনি বই-এর ওপর চোখ না রেখেই। হঠাৎ তাঁর চোখে প'ড়লো পিছনের বেঞ্চের একটা ছেলে তাঁর আবৃত্তিতে কর্ণপাত না ক'রে গল্প জমাবার চেষ্টা করছে তার পাশের আর একটি ছেলের সঙ্গে। দেখামাত্রই আবৃত্তি গেলো থেমে; কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব গম্ভীর ক'রে ছেলেটির চোখের ওপর চোখ রেখে বলে উঠলেন, "ভো ভো অশিষ্ট অনাবিষ্ট বালক, এই কি তোমার রসালাপের সময় হ'লো, বৎস? রে মূঢ়, রসের সুরধুনী বয়ে যাচ্ছে সামনে দিয়ে, আর তোমরা কি না ডুবে আছ তুচ্ছ কথার কূপে? ব্যাখ্যানের প্রাণই যে আবৃত্তি! অন্বয়, অনুবাদ, ব্যাকরণ-অলংকার মায় মল্লিনাথের টীকার ওপর টেক্কা—সবই পাবে, বৎস, 'সারদা'র ছাপা বই-এ, পাবে না শুধু (গলা দেখিয়ে) এই স্বরের সারটুকু; ওটা কান পেতে শুনে নাও সময় থাকতে; কালী পণ্ডিতের গাওনা ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না,—গরম গরম শুনে নাও না।" এই সরেস সরস ভৎ'সনায় একেবারে কুঁকড়ে গেলো ছেলেটি। এর পর আর কোনদিন সে মুখ খুলবার মুখ পায় নি ক্লাসে। রোল-কলের পরে ক্লাসে ঢুকতো যে সব ছেলে, তাদের উপস্থিতি খাতায় লেখা হতো ক্লাসের শেষে। একদিনকার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমার স্কুলের সহপাঠী পরান আগের শনিবারে দেশে গিয়েছিল,

সোমবারে ফিরে কলেজে পৌঁছেছে পণ্ডিতমশায়ের ক্লাস শেষ হওয়ার দু'চার মিনিট আগে। পণ্ডিতমশায় ক্লাস থেকে বেরোতেই পরে-আসা বেশ কয়েকজন ছেলে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো। তিনিও এক একবার তাদের মুখের পানে চেয়ে তাদের নামের ঘরের 'ডট্'-গুলো 'P'তে পরিণত করলেন। সবশেষে পরাণ সাহস ক'রে এগিয়ে গিয়ে ব'ললো 'সার, আমারটা'। পণ্ডিতমশায় মুহূর্ত্তকাল তার মুখের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'তুমি তো আস নাই, বৎস, বৃথা মৃষা-ভাষণে লাভ কি? সত্য কথা বল, আমি তোমার খাতায় উপস্থিতি লিখে নিচ্ছি।" সে তখন মাথা চুলকে আমতা আমতা ক'রে বললো, "আমার অপরাধ নেবেন না সার, বাড়ি গিয়েছিলাম, গাড়ী লেট্ থাকায় ঠিক সময় ক্লাসে আসতে পারিনি।" বলেই সে নতজানু হ'য়ে তার পায়ের ধুলো নিল। পণ্ডিতমশায় তাকে হাত ধ'রে তুলে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন এবং খাতায় তাকে 'উপস্থিত' লিখে নিলেন।

নন্দ-পণ্ডিতমশায় ছিলেন আবার অন্য তন্ত্রের। রস-কসের ধার ধারতেন না। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অধিকার ছিল বোধহয় সকলের চেয়ে বেশি। ইংরেজি জানতেন নামমাত্র, কাজেই বাঙ্‌লার মাধ্যমেই পড়াতেন ক্লাসে। এইভাবেই চলছিল পড়ানো। একদিন হঠাৎ পেছনের বেঞ্চি থেকে একটি চুস্ত্-পায়জামা পরা পাঞ্জাবী-ছেলে দাঁড়িয়ে উঠে ইংরাজিতে বললো, "আমি বাংলা জানি না, ইংরাজিতে পড়ালে সুবিধা হয়।" পণ্ডিতমশায় শুনলেন কথাটা, কিন্তু বিশেষ কিছু বুঝলেন না। তারপর তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, চোখের চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে সামনের একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "উডা বলে কি?" ছেলেটি উত্তর করলো "সার, ও বলছে সব্বনেশে কথা—বলছে ইংরেজিতে পড়াতে হবে।" পাঞ্জাবী ছেলেটির উক্তির মর্মার্থ জেনে নিয়েই তিনি চশমাটা আবার টেনে তুলে নিয়ে স্থিরকণ্ঠে বললেন, "Whole English? Impossible!" এর প্রতিধ্বনিটা

আজও আমার কানে ও প্রাণে লেগে আছে। Whole English শুধু তাঁর নয়, আমাদের অনেকের পক্ষেই কি impossible নয়? অবশ্য 'পিতলের' প্রাচুর্য থাকলে চাতুর্য সহকারে 'whole English' বলা না যায় তা নয়। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছিলাম একবার এক সিনেমার প্রেক্ষাগৃহে। নীরব চিত্রের যুগ, দর্শকদের নিবিষ্ট দৃষ্টি নিবদ্ধ ছায়া-ছবির ওপর, হঠাৎ ওপরের ব্যাল্কনি থেকে মেঝের উপর এসে পড়লো তাম্বূল-রস-রঞ্জিত স্ফূর্তি-সুরভিত মুখামৃতের একটি বৃহৎ বিন্দু এক ভদ্রলোকের একেবারে গা ঘেঁসে, মুখে-মাথায় পড়েনি এই ভাগ্যি। ভদ্রতা রাখা কঠিন হ'লো ভদ্রলোকের, খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উপর পানে হানলেন উষ্মাভরা ভস্ম-করা দৃষ্টি, রোষ-বিস্ফারিত ওষ্ঠাধরের ফাঁক দিয়ে ঝিকিয়ে উঠলো এক ঝলক গরম গরম গোটা ইংরাজি—'Who fells that pitch?' অর্থাৎ 'কে ফেলেছে এই পানের পিচ'। হ্যাঁ, সাহস করে বলতে পারলে বলা যায় 'whole English'। কিন্তু কলেজের নিরীহ অধ্যাপক কোথায় পাবেন এই অসম সাহস? তার কাছে তাই 'whole English সত্যিই impossible। 'বাঙলা কথার ফাঁকে মাঝে মাঝে ইংরেজি বুলির বুকুনি চাও তো দিতে পারি দু'চারটে। কিন্তু আগাগোড়া ইংরাজি নৈব নৈব চ'। সত্যদর্শী ঋষি ছিলেন পণ্ডিতমশায়, এই যুক্তিই তার স্বাক্ষর।

সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ছিলেন বিহারী পণ্ডিতমশায়। শ্যামবর্ণ দীর্ঘকায় পুরুষ। পরণে ধুতি ও সাদা লংক্লথের সার্ট। কালো কার্ দিয়ে বাঁধা একটি পকেট ঘড়ি, গলদেশ বেষ্টন করে বুক পকেট পর্যন্ত লম্বিত। মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠের উপরিভাগ সাতদিনের জমানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফে সমাচ্ছন্ন থাকতো,—একেবারে কদম্ব রোমাঞ্চ। হপ্তায় একটিমাত্র দিন রবিবার ছিল ক্ষৌরকর্মের জন্য নির্দিষ্ট। কাজেই এ পরিস্থিতি ছিল অনিবার্য। দোক্তাসহ প্রচুর পান খেতেন। ক্লাসেও আসতেন পান চিবোতে চিবোতে। সাহেবের

কলেজ হলেও তিনি কোন বাধা মানতেন না। দুদিকের সৃক্কণী বেয়ে আরক্ত তাম্বূলরসধারা নিরন্তর নির্গত হ'তো। সংস্কৃতের অধ্যাপকদের মধ্যে ইনিই ছিলেন একমাত্র এম্. এ.। পড়াতেন ভট্টিকাব্য। পড়াতে পড়াতে কাষ্ঠহাসি হেসে যখন আবৃত্তি করতেন 'সদ্‌রত্ন-মুক্তাফল-ভর্ম-ভূষাং', কিংবা 'আপিঙ্গরূক্ষোর্ধ্বশিরস্তবালৈঃ', তখন মুখমদধারার দু' একটি বৃহৎ বিন্দু মুখ ফস্কে তাঁর সাদা সার্টের বুকের ওপর প'ড়ে তাকে রক্তরাগে রঞ্জিত করে তুলতো। ভট্টিকাব্য পড়ালেও ব্যাকরণের কচ্‌কচি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতেন না তিনি। অন্বয়-অর্থ, ইংরেজি-অনুবাদ এবং ব্যাকরণের দু'একটি টিপ্পনী আউড়েই অধ্যাপনা-পর্ব শেষ করতেন। 'ফক্কি' দিয়েই তিনি ফতে করতেন, ঝক্কি পোয়াতে চাইতেন না। আমাদের সময় কলেজে বাঙ্‌লা পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল না বললেই হয়। না ছিল পাঠ্যপুস্তক, না ছিল অধ্যাপনার জন্য বিশেষজ্ঞ-শিক্ষকের সংস্থাপন। বাঙ্‌লা পড়ানোর জন্য রুটিনে নির্দিষ্ট থাকতো সপ্তাহে একটিমাত্র দিন, তাও নিতান্তই 'নামকে ওয়াস্তে'। পড়াতেন সংস্কৃতের অধ্যাপকদের মধ্যে কোন একজন, ক্লাসে উপস্থিতিও আবশ্যিক ছিল না। যাদের খুশী তারাই কেবল আসতো, অন্যেরা এটাকে বিশ্রামের ঘণ্টা বলেই মনে করতো এবং কমনরুমে কিংবা কাছের কোন পার্কে আড্ডা দিয়ে উড়িয়ে দিতো সময়টা। নির্ধারিত কোন পাঠ্য না থাকায় আলোচনা চ'লতো সাধারণভাবে সাহিত্য সম্পর্কে এবং তাও কোন নিয়ম-ক্রমে নয়, অধ্যাপক মহাশয়ের মেজাজ ও মর্জি মোতাবেক। অনুশীলনের জন্য পৃথক্ কোন ক্লাস না থাকায় রচনা-চর্চারও অবকাশ ছিল না কোন। পরীক্ষার সময় স্কুলে-শেখা পুঁজি ভাঙ্গিয়েই কাজ চালাতো ছেলেরা। কলেজ-পর্যায়ে সে যুগের এই দায়-সারা অধ্যাপন-ব্যবস্থার তুলনায় বর্তমানে যে এদিক দিয়ে প্রভূত উন্নতি হ'য়েছে তা অসংকোচে বলা যায়। সেকালের সেই কুণ্ঠিত মুষ্টিভিক্ষার স্থানে একালের এই উদার সদাব্রত

যে ভাষা-ভারতীকে জনচিত্তে একটি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাতে সন্দেহ নেই। এই মাতৃপূজার প্রধান পুরোধা ছিলেন মনস্বী আশুতোষ, দেশবাসী চিরদিন তাঁকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে।

রাজভাষা ইংরাজিই ছিল তখন সুয়োরানী, মাতৃভাষা বাঙ্‌লা ছিল কতকটা দুয়োরানীরই মত—তেমনি অনাদৃত, তেমনি উপেক্ষিত। পরিতাপের কথা, এই অবজ্ঞা এসেছিল শুধু সাগরপারের সাহেবদের কাছ থেকেই নয়; দেশী সাহেবরা টেক্‌কা দিতেন এঁদেরও। "কাল্‌চার" মানেই হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল কথায় কথায় নিখুঁত উচ্চারণে ইংরিজি কপ্‌চানো, আর সাহেবী কায়দায় ওঠা-বসা, চলা-ফেরা। মহাকবি মধুসূদনও এই বিজাতীয় সংস্কৃতির স্রোতেই গা ভাসিয়ে ছিলেন গোড়ার দিকে। নিজের ভুল বুঝে সময় থাকতে ঠিকপথে ফিরতে না পারলে বাঙ্‌লা সাহিত্যের যে কী বিরাট ক্ষতি হ'তো, তা ভাবতেও ভয় হয়। এর পরের যুগে সাহেবিয়ানার উন্মাদনা একটু পাতলা হ'লেও ঘোরটা পুরোপুরি কাটেনি। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমরা বিলাত-ফের্‌তা ক'ভাই' গানটিই এর প্রমাণ। আমাদের সময় ঘোরটা কেটেছে আরো খানিকটা—দেশের মন মোড় ফিরেছে ভাষা-সাহিত্যের দিকে; কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থায় মাতৃভাষার স্থান তখনও নিতান্ত সংকুচিত। ইংরাজির প্রতাপ ও প্রভাব তখনও প্রবল। ইংরাজির অধ্যাপনার জন্য কলেজে কলেজে সে কী রাজকীয় আয়োজন। মিশনারী কলেজ আমাদের, তাই আয়োজনটাও ওজন-ছাড়া; আধ ডজন ইংরাজি অধ্যাপক। এছাড়া লেজুড় হিসাবে ছিলেন দুজন কৃতী বাঙ্গালী অধ্যাপক। এঁদের মধ্যে অধ্যাপন-নৈপুণ্যে সেরা ছিলেন ডেভিস্ সাহেব। সার্থক অধ্যাপকের প্রায় সমস্ত গুণের অধিকারী হয়েও তিনি ছাত্রপ্রিয় হতে পারেন নি শুধু তাঁর উগ্র উন্নাসিকতার জন্যে। শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কে হৃদয়ের যোগটাই যে বড় কথা, শিক্ষক হয়েও এ শিক্ষা তিনি পাননি, সেই কথাই এইবার বলব।

ডেভিস সাহেবের ছিল ছিপছিপে একহারা চেহারা; দুধে-আলতা রঙ্, মাথায় ভ্রমরকৃষ্ণ কেশপাশ,ডানদিক ঘেঁসে সিঁথিকাটা। এক কথায় প্রিয়দর্শন কান্তিমান্ পুরুষ। অধ্যাপনায় তাঁর সুনাম ছিল। উচ্চারণ ছিল তাঁর সুস্পষ্ট। তাঁর মুখের প্রতিটি শব্দ আমরা বুঝতে পারতাম। স্বরাঘাত, শ্বাসাঘাত ছিল নিখুঁত, আবৃত্তি ছিল অনবদ্য। তাছাড়া, ব্যাখ্যানও ছিল বিশদ। পড়াতেন অ্যাডিসনের "Coverly Papers"। একদিন ক্লাসে ঢুকেই তাঁর নজরে প'ড়লো ব্ল্যাক-বোর্ড-এ বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—Biblical interpretation of the Bible by the Biblical Davis; দেখেই তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়লেন, সাদা মুখ লাল হয়ে উঠলো; ছাত্রদের লক্ষ্য ক'রে ছাড়লেন কয়েকটি মর্মঘাতী বাক্য-বাণ। ছেলের দলও গেলো ক্ষেপে, সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে গেলো জুতো খস্‌খস্ আর সিটি ও ক্যাট্-কল, ক্লাস হয়ে উঠলো 'বেড্‌লাম্'-এর সগোত্র। রাগে ফুলতে ফুলতে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন সাহেব। ছেলেরাও ওঁকে জব্দ করার ফন্দী আটতে লাগলো। স্থির হলো, পরের দিন ক্লাসে জানানো হবে তাঁকে সমুচিত সংবর্ধনা। হলের 'ভেস্‌টিবিউল'-এর দিকে লেক্‌চার-গ্যালারির পাশের সব দরজাই রাখতে হবে বন্ধ করে শুধু প্রবেশদ্বার ছাড়া। অন্যদিকের জানলাগুলোও বন্ধ রাখা হবে প্রবেশদ্বারের সামনের জানালা ছাড়া। শুভদিন সমাগত হ'লো। প্ল্যান্-মাফিক সব ব্যবস্থা প্রস্তুত। সাহেব ইংরেজ-বাচ্চা, জিদী ও জবরদস্ত, সহজে হটবার পাত্র নন। ঢুকলেন ক্লাসে, হুকুম করলেন জানলা-দরজা সব খুলে দিতে। কিন্তু কে কার কথা শোনে? ক্যাট্-কল আর বিনামার ঘষণে ক্লাস-রুম হয়ে উঠলো দ্বিতীয় রৌরব। ফাট্‌কা-বাজারের হট্টগোল কোথায় লাগে এর কাছে? অধ্যক্ষ ওয়াট্-সাহেব আশে-পাশে ঘোরাঘুরি করেও শেষ পর্যন্ত ঢুকতে সাহস করলেন না ক্লাসে। হালে পানি না পেয়ে শেষটা পাঠালেন জনপ্রিয় তরুণ অংকের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষকে, তিনি

ঢুকতেই চকিতে সব স্তব্ধ হয়ে গেলো; উপ্‌চে-পড়া উচ্ছ্বাস থিতিয়ে গেল যেন মন্ত্রের প্রভাবে। তিনি ছেলেদের দিয়ে দরজা-জানালা সব খোলালেন। ডেভিস্‌ সাহেবকে বললেন সে দিনের মত ক্লাস ছেড়ে দিতে। অবস্থা সঙ্গীন বুঝে সাহেব রণে ভঙ্গ দিলেন। এর পরে ছেলেদের কাছে তার আচরণের জন্যে দুঃখ প্রকাশ ক'রে তিনি রেহাই পেলেন।

ইংরাজির আর একদল অধ্যাপক ডগ্‌লাস্‌, স্কট্‌ল্যাণ্ড্‌ থেকে আনকোরা আমদানী। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হ'তো খানদানী মানুষ। লম্বা-চওড়া চেহারা, চিত্র-নক্ষত্র ডগ্‌লাস্‌ ফেয়ারব্যাঙ্কের মতই, কিন্তু স্বভাবে তাঁর প্রাণ-শক্তির একান্ত অভাব। নড়তে হয় বলেই যেন নড়তেন, ক্লাসে আসতে হয় তাই আসতেন, পড়াতেন টেনিসানের কবিতা-সংগ্রহ। 'ইউলিসিস্‌' স্বদেশে স্বগৃহে ফিরেও আবার ছুটে বেরিয়ে পড়বার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করছিলেন; ডগ্‌লাস সাহেব তাঁর জাড্যের প্রতি বিতৃষ্ণার কাহিনী শোনাতে শোনাতে বারেবারেই হাই তুলতেন, মনে হ'তো একটা বালিশ পেলে বাত বন্ধ করে কাত হন। একদিনের একটা মজার ঘটনা বলি। অধ্যাপক সাহেব পড়াতে পড়াতে তন্দ্রাতুর নেত্রে দেখলেন—গ্যালারির ওপর-সারির একটি ছেলে হাই-বেঞ্চে মাথা রেখে দিব্যি ঘুমচ্ছে—ভাত-ঘুম আর কি! অধ্যাপকমশায় দৃশ্যটা দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি কত কস্‌রত ক'রে ঘুম এড়াবার চেষ্টা করছেন, আর ছেলেটা কিনা নাক ডাকিয়ে দিব্বি ঘুমচ্ছে! তিনি তার পাশের ছেলেটিকে ইংগিত ক'রে বললেন, 'ওকে ঠেলে তুলে দাও।' জোরসে এক খোঁচা দিতেই ঘাড় তুলে সে বিরক্তিমাখা নিদ্রাতুর চোখে একবার খোঁচা-মারা ছেলেটির দিকে বারেক দৃষ্টি হেনে আবার কাত হবার তাল ক'রছে, হঠাৎ চোখ পড়লো তার সাহেবের চোখে। দ্বিতীয় দফা শোবার মোকা ফসকে গেলো অগত্যা। সাহেব নিজের মন দিয়ে বুঝলেন তার দুঃখ। কিণ্ডারগার্টেন ভঙ্গিতে ইঙ্গিতে বললেন,

হাই বেঞ্চে কনুই রেখে হাতের তেলোয় ভর দিয়ে ঘুমতে, আর সেই ভঙ্গিতেই র'য়ে গেলেন নিজেও,—যেটুকু আরাম পাওয়া যায় এই ফাঁকে। এর পরেই নিদ্রাতুর ছেলেদের কাঁদিয়ে সাহেব রেঙ্গুনের সরকারী কলেজে চাকরী নিয়ে চলে গেলেন।

অধ্যাপক এস্. কে. রায় পড়াতেন ইংলণ্ডের ইতিহাস। পড়াতে পড়াতে মাঝে মাঝেই পিছন ফিরে বোর্ডে কি সব লিখে যেতেন, আর সেই ফাঁকে ছেলের দল বিনামা-বিনোদ সুরু করে দিত। ফিরে এসে চেয়ারে বসতেই চেহারা বদলে যেতো ক্লাসের; একটু আগেই যে এত সোরগোল হয়ে গিয়েছে, তা বোঝে কার সাধ্য? 'ভাজা মাছ উল্‌টে খেতে জানে না' এমনি নির্বিকার ভাব তাদের। কিন্তু আবার যেই পেছনে ফেরা, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে গেলো সেই সনাতন জুতো-খস্‌খস্। না লিখেই অধ্যাপক রায় রাগে মুখ লাল করে আসনে এসে বসলেন আর রোষ-প্রফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলেন 'You know this rubbing of feet can easily be stopped.' কিন্তু কে কার কড়ি ধারে? দিনের পর দিন এই প্রহসনেরই অভিনয় চলতে লাগলো। ছাত্রদের মেজাজ-মর্জি একটুও বদলালো না। ঠাট্টা-প্রুফ্ চামড়া না হ'লে গাঁট্টা-প্রুফ্ ছেলেদের সামলানো শক্ত। অধ্যাপকদের খাত ছাড়লেও হাল ছাড়লে চলে না। ঠুন্‌কো লোকের ঠাঁই নেই এই দুনিয়ায়, টন্‌কো লোকই খেপে টঁ্যাকে। অধ্যাপক রায় ছিলেন এর জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

এই প্রসঙ্গে অর্থনীতির অধ্যাপক কিড্ সাহেবের কথা মনে পড়ছে। আমাদের পড়াতেন বাইবেল। লম্বাটে মুখ, ওষ্ঠের ওপরে প্রায় প্রজাপতি আকৃতি ছাঁটা গোঁফ। নিরীহ ভদ্রলোক, আচারে-আচরণে খাঁটি পাদ্‌রী। ছেলেরা তাঁকে পছন্দই করতো, তবুও মাঝে মাঝে তাঁর ধৈর্য পরীক্ষা করার জন্যেই ছুঁচের খোঁচা দিতে ছাড়তো না। একদিন কয়েকজন ফক্কড় ছেলে তাঁর ক্লাসে ঢুকবার আগেই কিছু ঘাস-পাতা আর ছোলা-মটর তাঁর টেবিলের

ওপর সাজিয়ে রেখে তলায় চক্ দিয়ে লিখে রাখলো—"Mr 'Kid', will you please partake of the repast ?" প্রস্তুতি-পর্ব শেষ ক'রে তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো তাঁর আসার। একটু পরেই ক্লাসে ঢুকে টেবিলের কাছে যেতেই তাঁর নজরে পড়লো ভোজ্যসম্ভার আর তার তলায় লেখা সুভাষিতের প্রতি। মুহূর্তের মধ্যে তার সাদা মুখ রাঙা হয়ে উঠলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাগটা সামলে নিয়ে রসিকতাটা বেমালুম হজম করে ফেললেন। তারপর ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন-মুখে শান্ত-কণ্ঠে বললেন, 'I have already taken my breakfast. You had better take it.' জোঁকের মুখে নুন প'ড়লো, বোমা-ফাটা প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা করে যারা রুদ্ধ-নিশ্বাসে অপেক্ষা করছিলো, তারা তাঁর আবেগ-সংবরণের শক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে পরে আর তাঁকে ঘাঁটাতে চেষ্টা করেনি। এমনি পরীক্ষায় অধ্যাপকদের পড়তে হয়, বখাট্‌রা শিক্ষকদের খাটো করবার জন্যে এইরকম ফন্দীর ফাঁদ পাতে। যাঁরা মাথা ঠিক রাখতে পারেন, শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই হয় জয়। দু-একটা আক্রমণ কৌশলে কাটিয়ে উঠতে পারলেই বাস্, রাস্তা একদম সাফ্,—কেল্লা ফতে।

আর একটা মজার ঘটনা বলি। অর্থনীতির অন্যতম অধ্যাপক ওয়াট্‌সন সাহেব। ভীষণ ষণ্ডা, তার ওপর একটু পাগ্‌লাটে ধরণের। লাল-মুখ, ঠিক যেন গোরা-পল্টন। একদিন একটা কাণ্ড ক'রে বসলেন। কলেজের উত্তর-দিকের রাস্তাটা ধ'রে জৈনদের একটি জাঁকালো শোভাযাত্রা প্রতি রাস-পূর্ণিমার দিন দুপুরে বরাবর পরেশ-নাথের মন্দিরের দিকে চলে যেতো। ওরকম দৃশ্য আমি খুবই কম দেখেছি। শান্তিপুরের ভাঙারাসের মনোরম মিছিলও এর কাছে হার মানে। ঢাকার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমীর মিছিল আমি দেখিনি, কাজেই তুলনামূলক বিচার আমার এখ্‌তারের বাইরে। পার্শ্বনাথের এই চোখ-ঝল্‌সানো মিছিল দেখবার জন্য কাতার দিয়ে রাস্তার

দু'ধারে লোক দাঁড়িয়ে পড়তো। দূর দূর স্থান থেকেও বহু লোক এসে জমায়েত হ'তো। ফলে শোভাযাত্রার মত লোকযাত্রাও কম দর্শনীয় হ'তো না। কৌতূহলী ছেলের দলও ক্লাস পালিয়ে কতক রাস্তার পাশের পাদ-পথে এসে দাঁড়াতো, আর কতক বা গেটের উত্তরদিকের সারবন্দী একতলা ঘরগুলোর ছাদে উঠে পড়তো। যেবারের কথা বলছি সে বছর গোলা-ফেরাবার জন্য কয়েক সার গিঁটে বাঁশ দেওয়ালের গায়ে লাগানো ছিল। ওয়াট্‌সন সাহেব দূর থেকে লক্ষ্য করলেন, কতকগুলি ছেলে পর পর বাঁশ বেয়ে ছাদের ওপরে উঠছে। কি খেয়াল হ'লো, তিনি নালি করে ছুটে এলেন আর সামনের বাঁশটায় এক হেঁচ্‌কা টান মারলেন। হুড়মুড়িয়ে বাঁশটা গেলো পড়ে আর সেই সঙ্গে চড়ন্ত একটি ছেলে দুরন্ত বেগে আপ্‌সে প'ড়লো মাটির ওপর। নীচে ছিল যে সব ছেলে তাদের মধ্যে কয়েকজন এক একটি বংশ-দণ্ড নিয়ে তেড়ে তাড়া করলো সাহেবকে। সাহেবও পড়ি কি মরি করে সটান ছুটে চললেন সামনের দিকে। সাহেবের তখন ক্ষ্যাপামি ছুটে গিয়েছে, মারের ভয়ে তিনি কাঁটা। ডাণ্ডা এমনি জিনিস। ঠাণ্ডা করার অমন ওষুধ আর নেই। কলেজের সহাধ্যক্ষ সর্বজনবরেণ্য দেবকল্প অধ্যাপক আরকোহার্ট সাহেব 'করিডোরে' দাঁড়িয়ে দেখছিলেন এই অভিনব দৃশ্য। হাত তুলে তিনি ধাবমান ছেলেদের নিবৃত্ত হবার ইঙ্গিত করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিধিৎসু ছেলের দল মন্ত্রশান্তের মত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলো, আর বংশ-বীর ওয়াটসন সেই ফাঁকে উরু-ভঙ্গের আগেই রণে ভঙ্গ দিয়ে সরে পড়লেন। ক্ষতি করার ক্ষমতাই এই বাধ্যতার হেতু, তা ভাবলে ভুল হবে। ক্ষমতা নয়, ক্ষমাই ছিল এই শক্তির নিভৃত উৎস। মনীষা ও মনুষ্যত্বের অপূর্ব সমন্বয় হয়েছিল এই শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানসাধকের চরিত্রে; তিনি ছিলেন একাধারে সুহৃৎ, শিক্ষক ও গুরু। আচার্য স্টীফেন্‌-এর মানস-সন্ততির অন্যতম ছিলেন তিনি—অর্ধশতাব্দী ধ'রে ছাত্র-পরম্পরা তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছে।

এই সূত্রে অধ্যক্ষ ওয়াটের একটি সংক্ষিপ্ত চরিত্রালেখ্য রেখে যাওয়া উচিত মনে করি। লম্বা-চওড়া, লালচে সাদা মুখ, নীলাভ নেত্র তারকা, এক ঝোপ সাদা গোঁফ নাকের নীচে। ওঠা-বসা, চলাফেরা সবই সামরিক কায়দায়। পরিচয় না জানলে অধ্যক্ষ বা অধ্যাপক বলে চেনা অসম্ভব। শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ না হয়ে সৈন্যাধ্যক্ষ হ'লেই তাঁকে মানাতো ভাল। নামে রসায়নের অধ্যাপক হ'লেও আমাদের সময় তিনি অধ্যাপনার ধার দিয়েও যেতেন না। তার পড়ানোর ইতিহাসটা সম্ভবত আগের শতকের শেষের দিকের ব্যাপার। তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী তখন কলেজে কেউ ছিল না। ডি. ডি. অর্থাৎ Doctor of Divinity ছিলেন, কিন্তু চেহারা ও চাল-চলনে তার চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যেত না। পড়াশুনার দেখাশুনা অধ্যাপক আরকোহার্টই করতেন। ওয়াট্ সাহেবের কাজ ছিল চিঠিপত্র সই-সাবুদ করা, কলেজের বাইরে ঘুরে ঘুরে কোথায় রঙ্ চটলো, জমাট খসলো, এইসব দেখে দেখে বেড়ানো। আর ভেতরমহলে কোণে-কানাচে উঁকি-ঝুঁকি মেরে খুঁজে বের করা কোন্ দরজার হ্যাস্প্-বোল্ট খোলা, কোন্ জানলার কব্জা ঝোলা, কোথায় দেয়ালের গায় পানের রক্ত-রেখা ইত্যাদি তদারক করে বেড়ানো। বারো আনা 'কেয়ার্-টেকার'-এর কাজ আর কি! অধ্যক্ষ ওয়াট্ অধ্যাপনা ছেড়ে নিয়েছিলেন পরিচালনার ভার,—ভালোই হয়েছিলো তাঁর পক্ষে এবং ছেলেদের পক্ষে'ও। বেশীদিন তাঁর শিক্ষাধীনে থাকলে ভরাডুবি হতে হতো, তাতে আর ভুল নেই। সাতসমুদ্র পেরিয়ে স্কটল্যাণ্ড থেকে ভারতে না এসে, বয়সকালে সোজা স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডে ঢুকে প'ড়লে ইনস্পেকটার জেরার্ডের মত তাঁর নামও দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়তো নিশ্চয়ই।

এই কলেজের রসায়ন-বিভাগের ওপরই কি একটা অভিশাপ ছিল। অধ্যাপকরা হয় স্ক্রু-আলগা, না হয় আড়-পাগলা। প্রখ্যাত নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ এক সময় ছিলেন এখানে (এর নাম তখন

জেনারেল এসেম্ব্লি) রসায়নের অধ্যাপক। টিঁকতে পারেন নি বেশীদিন; রসাক্ষিপ্ত হয়ে বিদ্যামন্দির ছেড়ে ছুটে ছিলেন নাট্যমন্দিরের দিকে। যেতে বাধ্য হয়েছিলেন বললেই ঠিক হয়। আলিবাবা অপেরাখানা তখন সদ্য-লেখা হয়েছে। অভিনীত হচ্ছে রাতের পর রাত। দর্শক ভেঙ্গে পড়ছে টিকিটের জন্য। মফঃস্বল অঞ্চলেও পৌঁচেছে তার ঢেউ। "ছি ছি, এত্তা জঞ্জাল," "বাজে কাজে মিনসেকে", "বোঁ বন্ বন্ সোঁ সন্ সন্" তখন বন্‌বন্ করে ঘুরছে লোকের মুখে মুখে। আব্‌দাল্লা আর মর্জিনা যথাক্রমে ন্যাপা (নৃপেন) বোস্ আর কুসুমকুমারী। তালিম দিয়েছেন স্বয়ং নাট্যকার। শুনেছি বিদ্যাবিনোদ নাচতেন ভালো। ক্লাসে ছেলেরা একদিন ধরে বসলো, "লেক্‌চার তো স্যার রোজই শুনি, আজ একফেরা আব্‌দাল্লার নাচ হ'য়ে যাক"। "কি যে তোরা সব বলিস? পাগল হলি নাকি?" যতই তিনি 'না হুঁ, না হুঁ' করেন ততোই ছেলেরা আরো চেপে ধরে। বরফ শেষটা গললো, বাইরের চাপে না অন্তরের তাপে কে জানে? আঁট-ঘাট বন্ধ হ'লো। বিজলীবাতি জ্বলে উঠলো। একটি ছেলের পকেট থেকে ঘুঙুর বেরোলো। আরম্ভ হয়ে গেলো আব্‌দাল্লার প্রচণ্ড তাণ্ডব। কোন একটা টক্ ছেলে টক্ ক'রে বেরিয়ে প'ড়ে শুভ-সমাচারটা প্রচার ক'রে এলো তদানীন্তন অধ্যক্ষের কানে। তিনি দ্রুত ছুটে এসে খড়খড়ির পাখী তুলে দেখেন দস্তুরমত যাত্রার আসর। সঙ্গে সঙ্গে কৈফিয়ৎ তলব, আর পিঠ-পিঠ বিদ্যাবিনোদের পদত্যাগ পত্র পেশ এবং অধ্যাপক জীবনের শেষ। অবশ্য গল্পটা সেই সময়কার এক ছাত্রের মুখে শোনা, কাজেই এর সত্যতা সম্বন্ধে হলফ্ করা সম্ভব নয়।

দেখতে দেখতে বছর প্রায় ঘুরে গেলো। গ্রীষ্মাবকাশের ঠিক আগেই কলেজের বার্ষিক পরীক্ষা সুরু হলো এবং কয়েকদিন পরে শেষও হয়ে গেলো। পরীক্ষা মোটামুটি মন্দ হয়নি। বাড়ি যাবার উল্লাসে উদ্বেল তখন মন। সবশেষের বাইবেল পরীক্ষাটি তখনও

বাকী। ওটা ঐ কলেজে আবশ্যিকেরই কোঠায় পড়ে। কাজেই বসতে হ'লো—প্রশ্ন-পত্র হাতে এলে দেখলাম উত্তরপত্র দাখিল করা মিথ্যা। অগত্যা অবতার-বরিষ্ঠ যীশু-খৃষ্টের একটি প্রশস্তি লিখে হাত গুটিয়ে বসে আছি আমি, পাশের ছেলেটি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো, "কি-রে তোর হয়ে গেলো ?" আমি উত্তর দিলাম "হাঁ, প্রথম ঘণ্টা পড়ার অপেক্ষা করছি। বাজলেই বেরিয়ে পড়বো"। আরক্ষক ছিলেন স্কটল্যাণ্ড থেকে নতুন আমদানী—অংকের অধ্যাপক জি. এস. মিল্। প্লাট্ফর্মের ঠিক নীচে টেবিলের ওপর কনুই-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। টক্‌টকে লাল মুখের রঙ্, ঢঙ্টা গোরা সৈনিকের মত। গায়ে সেই গরমেও পুরু-পট্টুর কোট-প্যাণ্ট—প্রথম মাসের বেতন পেলে বোধহয় সুতী কাপড়ের হাল্কা পোষাক কিনবেন। অধ্যাপক দূর থেকে আমাকেই দেখলেন কথা বলতে, নালিশ করে ছুটে এসে ব'ললেন "Have you finished ?" জবাবে আমি বললাম "Yes sir", তিনি হাত পাতলেন, আমিও 'খত্র'খানি তার প্রসারিত শ্রীহস্তে তুলে দিয়ে পরীক্ষার প্রহসনের দায় থেকে নিষ্কৃতি পেলাম। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শেষ পযন্ত কলেজও ছাড়তে হলো ; ভর্তি হলাম সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে। সাহেবী-শাসনের আওতা থেকে পণ্ডিতী-শাসনের আওতায় গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বোধহয় ক্ষতির চেয়ে লাভই হয়েছিল এতে বেশী। হট্টগোলের রাজ্য থেকে এই প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে এসে কলেজ-জীবনে প্রথম পেলাম অধ্যাপকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংস্পর্শের স্বাদ। ছাত্রজীবনে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কি হতে পারে! তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে ঘটনাটা আমার একান্ত অবাঞ্ছিত ছিল, এবং আমার স্কটিশ-লীলার ওপর যবনিকা পড়েছিল একটু বিয়োগান্তভাবেই।

এক কলেজ থেকে আর এক কলেজের আকৃতিগত পার্থক্যটা যেমন স্পষ্ট, প্রকৃতিগত পার্থক্যটা তেমন নয়। একই শিক্ষা-ব্যবস্থার

আওতায় থেকেও অন্তঃপ্রকৃতির বৈষম্যের ফলে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই একটা বিশিষ্ট বাতাবরণ গ'ড়ে ওঠে ; চলতি কথায় এর নাম দেওয়া যায় 'হাওয়া', অধ্যাপক, ছাত্র কেউই মুক্ত ন'ন এর প্রভাব থেকে, বাইরের ঢঙ্ দেখে চেনা যায় না এর ভিতরের রঙটা। এই রঙটা যেখানে হয় কাঁচা, ছাপের ছোপটা সেখানে ধোপে টেকে না। তাই অধ্যাপকদের নামের চেয়ে কোন অংশে কম নয় এই হাওয়ার দাম। পুঁথিগত বিদ্যাকেই যদি শিক্ষার পরাকাষ্ঠা বা পরম প্রাপ্তি ব'লে মনে করা হয় তা'হলে অবশ্য অন্য কথা। শিক্ষায়তনের জমিনে সোনার ফসল ফলাতে হ'লে চাই ছাত্র-শিক্ষকের জীবন্ত যোগ—নিগূঢ় আত্মিক সম্পর্ক। এর অভাবে বিদ্যা হয় বন্ধ্যা। শহরের বুকে যে সব অতিকায় কলেজ গজিয়ে উঠেছে আজকাল, সেখানে আছে কি রাজনীতিমুক্ত এই সুস্থ-শান্ত পরিবেশ ? কলেজ না ব'লে এদের কারখানা বলাই বোধ হয় সঙ্গত। হুবহু সেই চাঁচেই এগুলো ঢালা ;—এখানে স্ট্রাইক আছে, ঘেরাও আছে, তছনছ আছে, বোমা আছে ; পরীক্ষা-পাসের হাতিয়ার আরও আছে অনেক কিছু ; কুলের কথা খুলে নাই-বা বললাম। এক কথায় কারখানাকেও টেক্কা দেয় এরা ! অবিরাম ঘুরে চ'লেছে শিক্ষার চাকা তিন শিফ্‌টে সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত— উদ্দেশ্য, একদিকে শিক্ষিত মুষ্টিমেয় বেকারের কর্মসংস্থান, অন্যদিকে হাজার হাজার ছাপমারা নতুন বেকার সৃষ্টি ! 'উৎপাদন'ই একমাত্র লক্ষ্য ; কাঁচা মাল পাকিয়ে বাজারে ছেড়ে দেওয়া—খদ্দের থাক আর নাই থাক। অবশ্য এধরনের কলেজ একটিও ছিল না আমাদের কালে। আমার আগের কলেজে নিয়ম-শৃঙ্খলা যথেষ্টই ছিল। ছিল না শুধু গুরু-শিষ্যের এই অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা—এই কলেজে এসে অনেক দিন পরে আবার পেলাম এর স্বাদ—কানায় কানায় ভ'রে উঠলো মনটা। সিদ্ধকাম জ্ঞানসাধকদের স্মৃতিপূত এই বিদ্যায়তন ; (দিব্যায়তন !) ;—এর হাওয়ায় যেন মিশে ছিল হোম-হবির গাঢ়-গূঢ় গন্ধ, যা অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হ'য়ে মনকে উজানে টেনে নিয়ে যায়

মুছে-আসা অতীত ঐতিহ্যের অভিমুখে। সংস্কৃত কলেজে এসে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধটাই হ'য়েছিল আমার পরম লাভ— দিক্‌-পরিবর্তনের ফলেই ঘটেছিল এই দৃক্‌-পরিবর্তন !

সংস্কৃত কলেজ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ছে মহেন্দ্রবাবুর কথা,— ন্যায় ও দর্শনের অধ্যাপক। তখন চলেছে তাঁর প্রস্তুতির পালা— প্রতিষ্ঠা এসেছিল এর অনেক পরে। অধিবিদ্যার প্রতি একাগ্র আগ্রহ—দেখে মনে হতো দর্শনই তাঁর জীবন-দর্শন। এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো চুল,—টানাটানা দুটি চোখে স্বপ্নাতুরতা। ঠোঁটের ওপর পাতলা সরু গোঁফ। গোঁফ না বলে গুম্ফাভাস বলাই বোধ হয় ঠিক। চওড়া চোয়ালের দুপাশ ঘেঁসে বন-গুল্মের সারির মত দাড়ির পাড়ি। ছেলেরা আড়ালে তাঁকে তুলনা করতো লর্ড ডাল্‌হৌসীর সঙ্গে ; তারিফ করতে হয় উদ্ভাবনী শক্তির। নাতিসূক্ষ্ম নাসা, মসৃণ-চিক্কণ ত্বক। সব মিলিয়ে শুচি-সৌম্য মুখচ্ছবি ছাত্রদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতো। শুনেছি বাগ্মী হিসাবেও তিনি নাম করেছিলেন পরে। আমরা কিন্তু তার লক্ষণই দেখিনি কোন। মুদ্রা-দোষে ভরা ছিল তাঁর ভাষণ। প্রায় প্রত্যেকটি শব্দের পরেই বসাতেন দু' একটি করে মুদ্রাযতি, 'you see that,' 'you know that,' 'suppose'' 'indeed,' 'well' প্রভৃতির হরির লুট। এই সব "চবৈতুহি"র বহর দেখে সুড়্‌সুড়ি লাগতো আমাদের মনে। কিন্তু, তাই বলে পিঠের ওপর দিয়ে র‍্যাদা চাপোনোর চিন্তা করে কিংবা পিসিমাকে স্মরণ করে হাসি চাপতে হ'তো না। এটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল ক্রমে। ধৈর্য হারালেও শ্রদ্ধা হারাই নি কোন দিন। এমনি বিশিষ্ট ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। আমার সম্পর্কে মাতুল (গৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য) ছিলেন তাঁর প্রাক্তন ছাত্র। তিনি আমাকে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ফলে আমার প্রতি পড়লো তাঁর বিশেষ দৃষ্টি। পড়া তৈরী না করে ক্লাসে যাওয়াই দুঃসাধ্য হ'লো। সেটা শাপে বর হ'লো আমার পক্ষে। অনাবিষ্ট মনে ইষ্ট-চিন্তার

উদয় হ'লো শিক্ষা-গুরুর নিজের নিষ্ঠা দেখে। তিনি পড়াতেন এবং নিজে প'ড়তেন—যুগপৎ ছাত্র ও শিক্ষক ছিলেন তিনি। বস্তুত খাঁটি শিক্ষকমাত্রই তো আজীবন ছাত্র—অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই তাঁদের জীবনব্রত। স্বাধ্যায়-নিষ্ঠ এই জ্ঞান-তপস্বীর দৃষ্টান্ত আমার চোখ খুলে দিয়েছিল। কিন্তু আমি এর কতটুকুই বা প্রতিফলিত করতে পেরেছিলাম নিজের জীবনে? কোথায় সেই মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রেরণা? বেদান্তাদি ভারতীয় দর্শনের পাঠ নিতেন তিনি চতুষ্পাঠীর বিশ্রুত শ্রুতিবিদ্ অধ্যাপকদের কাছে। উত্তর জীবনে তিনি রচনা করেছিলেন ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে বহু গ্রন্থ। সেগুলের মধ্যে ফুটে উঠেছে তাঁর মনস্বিতার মুদ্রাচিহ্ন। মননের অনন্যতা ও প্রকাশের স্বচ্ছতা পরিস্ফুট তাঁর প্রতিটি গ্রন্থে। দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর তার দর্শন পেলাম তাঁর ত্রিকোণ পার্কের আবাস-গৃহে। সহকর্মী এক অধ্যাপকের মুখে খবর পেলাম তার বাসভবনের একাংশ তিনি ভাড়া দেবেন। আমিও তখন হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম একটা আস্তানার। তাই কাল বিলম্ব না করে ছুটে গেলাম গুরু-গৃহের উদ্দেশে। বহু বৎসরের ছাড়াছাড়ির পর হঠাৎ আমাকে দেখে চিনতে পারলেন না। পরিচয় দিতেই কিন্তু বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন আমাকে। অনেক রদবদল হয়েছে চেহারার। শ্মশ্রু-গুম্ফের মুণ্ডচ্ছেদ হয়েছে—সর্বাঙ্গে জরার নোটিশ জারি—চর্মের ললিত লাবণ্যের ওপর পড়েছে লোলতা ও রুক্ষতার ছাপ; যেন এক নতুন মানুষকে দেখলাম। দেখলাম আচার্য পারিবারিক জীবনে পরদা-শাসনের একান্ত অধীন। আচার্যানী স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন তাঁর দাক্ষিণ্য বর্ষিত হবে কোন দক্ষিণীর প্রতি। গুরুর গুরুত্ব ঘরের বাইরে, গুর্বীর কাছে তাঁর গৌরব কানা কড়িরও নয়। মুখের ওপর সাফ বলে দিলেন কোন বাঙালীকে তিনি বাড়ী দেবেন না। এ রকম রূঢ় প্রত্যাখ্যানের জন্যে না আচার্য, না আমি, কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। ফুটো-করা বেলুনের মত চুপ্‌সে গেলো তাঁর মুখটি—একটা

অপ্রতিভভাব ফুটে উঠলো চোখে-মুখে। বেচারী সত্যিই নাচার। অবস্থা বুঝে আর কথা না বাড়িয়ে ছোট্ট একটা 'ও' ব'লে মানে মানে সরে পড়লাম। হাল্‌কা মন নিয়ে এসে ফিরে গেলাম ভারাক্রান্ত মনে। আশাভঙ্গের জন্য নয়, ভার্যার হাতে তাঁর মুলতুবী লাঞ্ছনাটা অনুমান করে। Xanthippe-র হাতে Socrates-এর খোয়ারের কথা মনে পড়ে গেলো।

টোলের অধ্যাপকরা ছাড়া কলেজ বিভাগে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন দু'জন—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ আর সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বিদ্যাভূষণ মশায় আমাদের পড়াতেন না, বি. এ. ক্লাসে পড়াতেন 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। তিনি কাব্যপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, কাজেই সংস্কৃত সাহিত্যের এই সেরা নাটকখানি পড়াতেন বিভোর হয়ে। যে সব মণি-রত্ন এই কাব্য-রত্নাকরের গর্ভে নিহিত আছে, নিপুণ ডুবুরির মত তার অতলে তলিয়ে সেগুলি উদ্ধার ক'রে মুগ্ধ শ্রোতাদের সামনে তুলে ধ'রতেন। তাঁর গলা ছিল খন্‌খনে ও কিরকিরে, কিন্তু ভাষায় ছিল লালিত্য ও দীপ্তি। শুশ্রূষু ছেলেরা তাঁর পড়ানোর প্রচুর প্রশংসা করলেও ঝুনো টুলো-পণ্ডিতরা অবজ্ঞাভরে বলতেন, "পোড়া কপাল, ওর নাম আবার পড়ানো? ব্যাকরণের ও জানে কি? হাঁটু-জলে সাঁতার কাটছে। সাদা সরবতের কারবারী যে, কৃৎ-তদ্ধিতের পেস্তা-বাদাম-বাটা দেওয়া প্রপানকের স্বাদ জানবে কি করে?' ইত্যাদি। রস-উপোসী, ব্যাকরণ-বাঘ ছেলের দল কিন্তু উল্টো কথা বলতো। বিদ্যাভূষণ ছিলেন স্বভাবত ধীর-স্থির ও মোলায়েম; বুদ্ধি-দীপ্ত, চোখে-মুখে হাসিটি লেগেই থাকতো। প্রখ্যাত সম্পাদক, রসিক সাহিত্যিক ও বাগ্মী পাঁচকড়ি বন্দ্যো রঙ্গভরে তাঁর নাম রেখেছিলেন 'দেখোন-হাসি'। এই পাঁচকড়ি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে খবরের-কাগজ-ভেণ্ডারের একদিনের একটি হাঁক আজও মনে গাঁথা আছে—"লায়েক, বাবু, লায়েক! পাঁচকোড়িবাবু গাঁজা খাইয়ে বীষম গালাগালি করিয়েসে।" ইনিই সেই মহাজন যিনি সার্

আশুতোষের নাম করণ ক'রেছিলেন "গুঁপো-সরস্বতী" এবং আশুতোষ তলব ক'রে কৈফিয়ত্ চাওয়ায় গললগ্নীকৃতবাস হ'য়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বলেছিলেন, "আপনি স্বয়ং আশুতোষ, দেশের মুকুটমণি, তাই আপনাকে নিয়ে একটু রঙ-তামাসা করতে হয় কাগজের পসারের খাতিরে; আসলে এটা হলো ব্যাজস্তুতি—নিন্দাচ্ছলে প্রশস্তি-কীর্তন, ছোট করার ভান করে বড় করা। আমাদের মত ছোট লোকের ছোট কথা কি বড় লোকে গায়ে মাখে ?"

এরপরে স্থরেন পণ্ডিতমশায়ের সম্বন্ধে দু'চার কথা বলতে হয়। ইনি ছিলেন অধ্যক্ষ মশায়ের সতীর্থ, একই বছরে দুজনে এম্. এ. পরীক্ষা পাশ করেন। ইনি আমাদের 'রঘুবংশ' পড়াতেন গতানুগতিক পদ্ধতিতে। অধ্যাপনার বৈশিষ্ট্য না থাকলেও চেহারার বৈশিষ্ট্য ছিল যথেষ্ট। গায়ের রঙ ফর্সা, অস্বচ্ছ ছোট ছোট চোখ, মাথাজোড়া টাক—নিভাজ ও নির্ভেজাল, আদি ও অকৃত্রিম—মাজা আয়নার মত তার জলুস ; সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাগিয়ে নেওয়া যায়। টাকের রঙে মুখের রঙে বেমালুম মিলে গিয়েছে ; খুব কাছে না গেলে তফাতটা মালুম হয় না ; সঙ্গমে গঙ্গা যমুনার মত। ভেদ রেখাটা দূর থেকে দুর্লক্ষ্য। রগের দু'ধারে আর শিরঃ-চূড়ার ঠিক ওপরে মরুভূমির সীমান্তে মরুদ্যানের মত কয়েক গুচ্ছ কেশ। সেকালের টাকীরা টাক-ঢাকা টুপীর হদিশ জানতো না—এটা পুরোপুরি পোস্ট্-গান্ধী যুগের আবিষ্কার। এ যুগে 'টাকী' মাত্রেই গান্ধী-পন্থী ; এক ঢিলে দুই-পাখী মারার অভিনব কৌশল এটা। ইংল্যাণ্ডে এলিজাবেথের যুগে পরচুলার প্রচলন ছিল। কেশ-বৈরল্যের জন্যে কাউকে টাকে হাত দিয়ে হা-হুতাশ করতে হতো না। শুনেছি মহাকবি সেকস্পীয়রের মাথায় এক বিরাট টাক-শাল ছিল, তাই তো তার নীচের মহলে নবনব ভাব-মুদ্রার সৃজন সম্ভব হয়েছিল ! বল্ড্উইন টাকের জোরেই বাজি-মাত্ ক'রেছিলেন কিনা জানি না,

তবে সুরেন পণ্ডিতমশায় যে তা পারেন নি সেটা হলপ্ ক'রে বলতে পারি। কর্ম-জীবনে তাঁর আসন 'অচল-প্রতিষ্ঠ' ছিল, যেখানে আরম্ভ সেইখানেই শেষ। টাকবীর গোল্ড্‌স্মিথ্‌ জীবদ্দশায় না হোক জীবনান্তে অন্তত নাম করেছিলেন, পণ্ডিতপ্রবর সুরেন্দ্রনাথের ভাগ্যে বোধ হয় তাও জোটেনি। সব সংস্কৃতাধ্যাপকদের মত তিনিও ইংরাজির অনুরাগী ছিলেন—ভয় ছিল পাছে ছাত্রেরা নেহাত পণ্ডিত বলে ভুল করে,—পাছে দেব-ভাষার বিজ্ঞতা রাজ-ভাষার অজ্ঞতার পরিচায়ক বলে গণ্য হয়। একবারের একটি ঘটনা আমার এই উক্তির যুক্তি হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রশ্নপত্রে 'Explain in English the idea contained in the following Slokas.' —এই ধরণের একটি প্রশ্ন ছিল। আমি বেকুবী ক'রে বাহাদুরী নেবার জন্যে ইংরেজির বদলে সংস্কৃতে ব্যাখ্যা লিখেছিলাম! তিনি আমার উত্তর সঠিক এবং ভাষা নির্ভুল হ'লেও আমাকে ২৫ মার্কের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড অশ্বডিম্ব দিয়েছিলেন। এ বিচারকে অবিচার আমি বলবো না, তবুও মনে হয় সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি-পরীক্ষার জন্যই যখন পরীক্ষা, তখন অতটা নিষ্ঠুর না হ'লেও, রাজভাষার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হতো না। যা হোক, অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ইংরেজি-জানা সংস্কৃত অধ্যাপকদের রাজভাষা সম্বন্ধে একটা বিশেষ দুর্বলতা ও হীনম্মন্যতা আছে, এবং সেটা অনেক সময় উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এজন্যে দোষও দেওয়া-যায় না তাদের ; চোখের ওপরই দেখা যাচ্ছে অতি বড় পণ্ডিতও বিদ্বৎ-সমাজে 'কল্‌কে' পান না, ইংরেজির গন্ধ না থাকলে। তবুও তাঁদের অবগতির জন্যে নিবেদন করবো আমার জানা দু' একটি তথ্য, যা এর বিপরীত সত্যটাই প্রমাণ করে। আমি অন্তত দু'জন প্রাচীন অধ্যাপককে জানি যাঁরা সংস্কৃতের সেরা এম্. এ. হওয়া সত্ত্বেও আজীবন ইংরেজি-সাহিত্যেরই অধ্যাপনা ক'রেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের অধ্যাপনার খ্যাতি সারা শহরময় এতই ছড়িয়ে পড়েছিল যে সাত কলেজের ছেলেরা এসে ভীড়

করতো তাঁদের ব্যাখ্যান শুনবে ব'লে। আমি মেট্রোপলিটান-এর বিশ্রুত অধ্যাপক কুঞ্জ নাগ, আর রিপন-এর জানকী ভট্টাচার্যের কথা ব'লছি। জানকীবাবুর সেক্‌স্‌পীয়রের ব্যাখ্যান শুনবার জন্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের সেরা ছাত্ররাও রিপনে ভিড় জমাতো। সেকালে এক বিষয়ের এম্‌. এ. অন্য বিষয়ের অধ্যাপনা করছেন—নিয়মের এই ব্যতিক্রম খুবই দেখা যেতো। মেট্রোপলিটান-এর এস্‌. রায় অংকের এম্‌. এ. হয়েও চিরকাল অনার্স পর্যায়ে সংস্কৃত সাহিত্য-ব্যাকরণই পড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর মত পাণিনি-নিস্নাত পণ্ডিত সেকালেও বেশী ছিল না। ঐ কলেজেরই দর্শনের অধ্যাপক জে. আর. ব্যানার্জি দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিও পড়াতেন নিয়মিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকেও বিধি-ভঙ্গের অজুহাতে কড়া অনুশাসন জারি করা হতো না। যে কলেজের প্রসঙ্গক্রমে এই সব কথা বলা হোলো, সেই সংস্কৃত কলেজেই অধ্যাপক মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বিষয় সংস্কৃত ছাড়া ইংরাজি, দর্শন ও প্রয়োজন হলে, ইতিহাসও পড়াতেন। আমি বহুবার দেখেছি তাঁকে, কিন্তু তার পাদমূলে পাঠ নেবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। মাথা হেঁট করে চলতেন, চোখে চশমা, মুখে ফরাসী-ছাঁদে-ছাটা কাঁচা-পাকা দাড়ি। সেই হেঁট মাথার সামনে শ্রদ্ধায় মাথা হেঁট করতো না এমন ছাত্র কমই ছিল। বস্তুত, বহুজ্ঞতা পল্লব-গ্রাহিতা ব'লে চিহ্নিত ও নিন্দিত হচ্ছে এই বিশেষজ্ঞতার যুগে। ডি. ফিল্‌-এর পেলার ঠেলায় অনেক অল্পজ্ঞ ব্যক্তিও উপরে উঠে যাচ্ছেন অবলীলাক্রমে। তাই বহুবিদ্যাবিদ মনস্বী সুধীর দুর্ভিক্ষ একালে। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর কিংবা ব্রজেন্দ্রনাথের মত মনীষী আজ কোথায় যাঁদের মনীষা-ময়ূখে আর্যযুগের নাগার্জুনের মহিমাও ম্লান হয়ে যায়? জাতীয় অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, ডঃ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বহুভাষাবিদ্‌ হরিনাথ দে, ডঃ নলিনীমোহনের মত মানুষও আর দেখা যাচ্ছে কই? তক্‌মার জোরে বহু-হাতুড়েই আজ ডাক্তার!

ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন দু'জন—নরেন চক্রবর্তী ও শ্যামাচরণ

মুখোপাধ্যায়। প্রথমজন সম্বন্ধেই আমার দু'-এককথা ব'লবার আছে। রসভরা অথচ রাশভারী কান্তিমান্ এই মানুষটি। আমাদের পড়াতেন Rowe and Webb-এর টেনিসনের কাব্য-সংকলন। সুললিত ভাষায় সুন্দর ব্যাখ্যান। এতদিন দেখেছি, পড়ানো হয়ে দাঁড়ায় পোড়ানোরই সামিল—কান-জুড়ানো, মন-মাতানো পড়ানোর স্বাদ এই প্রথম পেলাম। আবৃত্তির দীপ্তিতে, বিশ্লেষণের বিশেষত্বে একটা আবহ-সৃষ্টি হতো পাঠ-কক্ষে—সন্ধানী দৃষ্টির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠতো সৌন্দর্য-সন্ধিগুলি। এর চেয়েও উন্নততর অধ্যাপনা-নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়েছি স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে। আমি মুখ্যত বিশ্রুত ইংরেজি-কবি শ্রীঅরবিন্দের অগ্রজ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের অধ্যাপনার কথা মনে রেখেই এই মন্তব্য ক'রছি। এক কথায়, এই বিদগ্ধ কবি-অধ্যাপকের প্রতিটি উক্তিতে এমন মাধুরী-মাখানো থাকত যে, তার স্বাদ যে পায়নি তাকে তা' বোঝানো শক্ত। আমরা যখন তাঁকে পেয়েছি, তখন তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য ও জরাজীর্ণ; লিফ্‌টে উপরে উঠে বারান্দা দিয়ে টুক্‌টুক্ ক'রে হেঁটে এসেই হাঁপিয়ে চেয়ারে ব'সে দু' একমিনিট দম নিয়ে শুরু করতেন "রোল্-কল্। কণ্ঠস্বর এতই মৃদু যে কান পেতে না শুনলে তা ধরা যায় না। এরপর আরম্ভ হ'তো অধ্যাপনার কাজ, পাঠ্যগ্রন্থ ছিল সুইন-বার্ন্‌-এর গ্রীক-আধারে আরোপিত নাট্য-কাব্য "Atlanta in Calydon"। দুরূহ গ্রন্থ; প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ও পুরাণ-কাহিনীর অনুবৃত্তি কথায় কথায়। সযত্ন-চয়িত শব্দ-সম্ভারে গম্ভীর ও গুরুপাক। ধ্বনি-ধন্য শব্দের বাহনে শ্রুতি-সুন্দর ছন্দের এই শোভাযাত্রায় উদ্দিষ্ট অর্থটি কোথাও অস্পষ্ট, কোথাও অনুদ্দিষ্ট। প্রত্যেক সার্থক সৃষ্টিরই দুটি দিক আছে—আংগিক ও আর্থিক। আলোচ্য নাট্যকাব্যখানিতে অংগরাগটাই বড় হয়ে অর্থের দিকটা ঢেকে ফেলেছে। ফলে, নাট্য কর্মটা গৌণ হয়ে সুর-ধর্মটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। টেনিসন যথার্থই বলেছেন, "সুর একটি বেণুর মত, ফু' লাগলেই বাঁশি হয়ে বেজে ওঠে।"

সুইন্‌বার্ন্‌-এর সবলতা ও দুর্বলতা দুই নিহিত আছে এই সহজাত সুর-সচেতনতার মধ্যে। কোরাস্‌গুলির মাধুর্য ও সৌকুমার্য তিনি অনুভব করেছিলেন কবির প্রাণ দিয়ে এবং সেই অনুভূতির বাণীরূপটি হয়ে দাঁড়াতো দ্বিতীয় সৃষ্টি। এই কাব্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে বিদগ্ধ বিশ্লেষক শুধু তার নিহিতার্থ উদ্ধার করেই নিরস্ত হতেন না, ভাষ্যের সঙ্গে বার্তিকও জুড়ে দিতেন। শ্রুতির সায়ণের মত, কালিদাসের মল্লিনাথের মত তিনিও এই কাব্যের নিহিত অর্থটি তাঁর মানসসৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলতেন। আর যে ভাষায় সেই ভাষ্য উপস্থাপিত হ'তো, তার তুলনা মেলে না; এক কথায় অনবদ্য ও অনন্য। তাঁর সূক্তি-মুক্তাবলীর দু'-একটা টুকরো আজও আমার মনের গভীরে গাঁথা আছে। পরীক্ষা-পাগল ছেলেরা পাসের পাস্‌পোর্ট এঁর থেকে পেতো না। তবুও একথা বললে বেশী বলা হবে না যে তারা উৎকর্ণ হয়েই এই অপরূপ আলাপ শুনত। ভায়োলেট্‌ ফুলের বিশেষণ হিসাবে "glowing" শব্দটি সুপ্রযুক্ত হয়েছে কিনা, সেক্‌স্‌পীয়র, মিল্‌টন, গ্রে প্রভৃতি থেকে নজির তুলে তুলে চুল-চিরে বিচার করতেন তিনি। অথচ আশ্চর্য এই, তবুও ছাত্ররা হাই তুলে তুড়ি বাজাতো না। কান পেতে সেই অনতিস্ফুট অথচ অনির্বচনীয় বচন-সুধা পান করতো। সুইন্‌বার্ন্‌-এর ছন্দের তরঙ্গ তাঁর ভাষার ভেলায় ভেসে এসে শ্রোতার মনেও তরঙ্গ তুলতো। নিজে না মজ্‌লে কি অন্যকে মজানো যায়? অধ্যাপক চক্রবর্তীর প্রসঙ্গে ফিরে আসার আগে অধ্যাপক-চক্রের আরও কয়েকজন শ্রুতকীর্তি সাধকের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, যাঁরা অধ্যাপক এম্‌. ঘোষের সমকক্ষ না হ'লেও তার কাছাকাছি ছিলেন। নক্ষত্রের চারপাশে উজ্জ্বল গ্রহ-পুঞ্জের মত দেদীপ্যমান ছিলেন এঁরা,—এঁদের প্রভা ও প্রভাবে আলোকিত হয়েছিল তখনকার শ্রেষ্ঠ পাঠ-পীঠগুলি। আমি বিশেষ করে অধ্যাপক জয়গোপাল ব্যানার্জী, প্রফুল্ল ঘোষ, রবি ঘোষের নাম মনে রেখে একথা বলছি। এঁরা ছিলেন একাধারে

সাধক ও শিক্ষক—বিদ্যার্থীদের নমনীয় মনকে আদর্শের ছাঁচে ফেলে নতুন করে গড়ে তুলতেন। যুগ যুগ ধরে এঁদের নাম লোক-শ্রুতির মত ছাত্র-সন্ততির অন্তরে জাগরূক থাকবে। আমার মতে অধ্যাপক নরেন চক্রবর্তীও এই বরেণ্য শিক্ষককুলেরই সমগোত্র। সুযোগের শুভযোগ না ঘটায়—অবশ্য তাঁর বিদ্যার পরিমাপ করার মত বিদ্যা আমার নেই—স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যাপনার অধিকার তিনি পাননি। তাই তাঁর খ্যাতির ব্যাপ্তিও স্বভাবতই সীমাবদ্ধ ছিল, নতুবা তিনিও অনুরূপ গৌরবের অধিকারী হতেন তাতে সন্দেহ নেই।

কাছে যাঁদের পেয়েছিলাম আর দূর থেকে যাঁদের দেখেছিলাম, জীবন-সন্ধ্যায় নির্জনে স্মৃতি-রোমন্থনে ব'সে তাদের অনেকের কথাই আজ মনে পড়ছে। কিন্তু কলমের কালি দিয়ে তাদের সকলের শুভ্র-সুন্দর মহিমার রেখা-চিত্র আঁকা তো সম্ভব নয়। তাই অল্প দুচার জন তীর্থ ও সতীর্থ, যাঁদের কতকটা নিকট সম্পর্কে এসেছিলাম, তাঁদের প্রসঙ্গেই দুচার কথা বলে এই পরিচ্ছেদের ছেদ টানব।

আই. এ পাশ করার পর আমার কলেজ জীবনে আবার পট পরিবর্তন হ'লো। এবার সংস্কৃত কলেজ থেকে 'সিটিতে'—গোল দিঘির উত্তর পার থেকে দক্ষিণ পারে। সিটি কলেজ তখনও মিরজাপুর স্ট্রীটের পুরান বাড়ীতে। জমানা বদল হ'য়েছিল অ্যামহার্স্ট স্ট্রীটের নতুন বাড়িতে কেশব-রামমোহনের খাস-মহলে এর বছর দেড়েক পরে। গোড়া থেকেই মনটা উড়ু উড়ু ক'রছিল সিটি কলেজের দাঁড়ে চ'ড়বার জন্যে; দু'জন একান্ত বন্ধু ও-প্রান্ত থেকে 'সিটি' দিয়ে ডাক দিচ্ছিল, 'এসো এসো' ব'লে। অবশেষে বাবাকে রাজী করিয়ে ঢুকে প'ড়লাম সিটিতে 'জয় ব্রহ্ম' ব'লে; ওখানে তো আর দুর্গা-কালী চলবে না! কলেজের অধ্যক্ষ প্রখ্যাত ইংরাজির অধ্যাপক আচার্য হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। রক্ত-করবীর রাজার মত ক্লাসের সময়টি ছাড়া তিনি থাকতেন নেপথ্যে তিরস্করণীর অন্তরালে।

সাধারণ ছেলেরা তার দর্শন ক্বচিৎ পেতো। দপ্তরের কাজকর্ম সবই করতেন গণিতের বিশ্রুত অধ্যাপক সহাধ্যক্ষ কে. পি. চট্টরাজ। আনাভিলম্বিত কিঞ্চিৎ-কুঞ্চিত কাঁচা-পাকা দাড়ি, মূর্তিমান্ হুতাশনের মত প্রদীপ্ত মূর্তি। উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা জামদগ্ন্যের রেখা-চিত্রটি দেখেছেন তো? আমার বিশ্বাস অধ্যাপক চট্টরাজকে মডেল করেই তিনি এঁকেছিলেন তাঁর ছবি। চট্টরাজকে সাহায্য করতেন সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; ইনিও গণিতের অধ্যাপক, পরে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ হ'য়েছিলেন। কাজেই দু'চারটে সই-সাবুদ করা ছাড়া পরিচালনার আর কোন কাজই অধ্যক্ষ মৈত্রকে করতে হ'তো না। তার ঘরের বারান্দার দিকের দরজাগুলো সবই বন্ধ থাকতো একটা ছাড়া। তার ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত ঝুলতো এক পুরু কাপড়ের পর্দা; এক রকম অসূর্যম্পশ্যই বলা চ'লে। অথচ আশ্চর্য এই যে অতিবড় দুরন্ত ছেলেও তাঁর ঘরের কাছে পৌঁছে পা টিপেটিপে পার হয়ে যেতো—টু শব্দ ক'রতে সাহস করতো না। এমনি বৈদ্যুতিক ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব। এত ছেলের কলেজেও একটা পরিচ্ছন্ন পরিমণ্ডল সর্বদা বিরাজ করতো। এই প্রভাবের উৎস ছিল তাঁর বিদ্যা ও চরিত্রবল। 'সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্'—এই ছিল তাঁর সাধন-মন্ত্র এবং এই সত্য-সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ ক'রেছিলেন। দীর্ঘ-আয়ত দেহ, গুম্ফ-গুম্ফিত প্রসন্ন-প্রশান্ত মুখশ্রী; উপরের গাম্ভীর্যের নীচে স্নেহ ও ক্ষমার ফল্গুধারা। একদিনের একটা ঘটনা থেকেই তার প্রমাণ পেয়েছিলাম। পুরান কলেজের সামনে লম্বা একফালি জমি পাদ-পথ পর্যন্ত প্রসারিত। একদিন একটি ছেলে গোলদিঘির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে তার এক সঙ্গীর সঙ্গে বিভোর হয়ে গল্প করছিল। বন্ধুর মুখ ছিল গোলদিঘির দিকে আর সে-মুখে ছিল ধূমায়মান এক সিগারেট। অধ্যক্ষ মৈত্র কলেজে ঢোকার সময় দূর থেকে দেখলেন গল্পে মশ্‌গুল এই রত্নযুগলকে। তিনি প্রায় তাদের

গায়ের ওপর এসে পড়ায় চুরুট-পাণি ছেলেটির চটকা ভাঙলো: সে মুক্তির সন্ধানে মুক্তকচ্ছ হয়ে গোল-দিঘির দিকে দিলো এক চোঁ চাঁ দৌড়! রাস্তা পার হ'য়ে রেলিং ডিঙিয়ে বীরপুঙ্গবের সেই সকরুণ পলায়নের দৃশ্যটি আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। পেছন-ফেরা ছেলেটি পালাবার পথ পেলো না। প্রবীণ অধ্যক্ষ এমনি জোরে তার একটি বাহু চেপে ধরলেন যে তার অবস্থা হ'লো যাঁতা-কলে-পড়া ইঁদুরের মত। ধরা-পড়া ছেলেটিকে তিনি নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। নেপথ্যে কি কথাবার্তা হলো জানা গেলো না, কিন্তু এর একটু পরেই নোটিশ বেরোলো দু-জনেরই দশটাকা ক'রে ফাইন্ হ'য়েছে। জরিমানা দাখিল করতে হবে সাত দিনের মধ্যে। মহা ফাঁপরে প'ড়ে গেলো ছেলে দুটি। হিতৈষী বন্ধুরা ব'ললো, "আরে এতে ঘাব্ড়াচ্ছিস কেন? ফাইন্ এখুনি মকুব হ'য়ে যাবে দু'চার ফোটা চোখের জলে। স্রেফ্ অনুতাপ আর অনুশোচনা! আতেলা মাথার চুল উস্কো করে কড়া একটিপ 'র' নস্যি টেনে চক্ষু-করমচা ক'রে চ'লে যা। আরে, তোর আর ভাবনা কি? প্রফুল্ল-নাটকের যোগেশের পার্ট্টা এক্স্পার্ট-এর মতই প্লে করেছিলি তুই। বুড়োকে ভোলানো ও গলানোর আর্ট তো তোর মুঠোর মধ্যে। তোর ঐ ন্যাকা-চৈতন বন্ধুটিকে পক্ষপুটে ঢেকে হীরোর অভিনয়টা তুই-ই করে যাবি। চোখের জল আর পায়ের ধুলো, এ দুটোই হ'লো শাস্তি এড়াবার প্রশস্ত রাস্তা।" যথা প্ল্যান্ তথা কাজ। কাঁচু-মাচু মুখে অধ্যক্ষের কক্ষ থেকে বেরিয়ে দুটো ক'রে সিঁড়ি টপ্কে নীচের তলায় নেমে হাসিতে ভেঙ্গে প'ড়লো সেই নাটুকে ছেলেটি আর তার লাজুক লেজুড়টি। বেকসুর খালাস। হাসির ধমক কাটলে সেই কাহিনীই তারা ইনিয়ে বিনিয়ে শুনিয়ে দিল। তরঙ্গ-ভঙ্গের তলে অতল সুধা-সমুদ্র। তৃতীয় বার্ষিক ইংরাজি অনার্স্ ক্লাস, গুটি পঁচিশ-ত্রিশ ছেলে। অধ্যক্ষ মৈত্রের সঙ্গে নব-প্রবিষ্ট ছাত্রদের প্রথম সাক্ষাৎ! তিনি ক্লাসে ঢুকতেই সসম্ভ্রমে সকলে উঠে

দাঁড়ালো। তাদের বসবার ইঙ্গিত করে তিনি আসন গ্রহণ করলেন! কে কোন কলেজ থেকে এসেছে, আগের পরীক্ষায় ইংরাজিতে কে কি নম্বর পেয়েছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদ চলার পর তিনি জানতে চাইলেন Encyclopaedia কার কার আছে। বেবাক ছেলে নিরুত্তর। কারুরই নেই—এই সিদ্ধান্তই যখন স্থির হতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় পেছনের বেঞ্চ থেকে একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে গর্বোৎফুল্ল মুখে জানালো Encyclopaedia তার আছে। কোন সংস্করণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিল 'Pears'। অধ্যক্ষ মহাশয় স্মিতমুখে একটু বিদ্রূপের ভঙ্গিতে ব'ললেন 'splendid !' চাপা হাসির একটা হল্‌কা ব'য়ে গেলো ক্লাসের ওপর দিয়ে। ছেলেরা বুঝলো একেবারে 'গোবিন্দদাস' নন তিনি। বাঁশের নীচে রসের সঞ্চয় আছে। ওয়াটার্লু যুদ্ধের তারিখ সম্বন্ধে একবার একটি ছেলে একেবারে নির্ভুল উত্তর দেওয়ার ফলে বলেছিলেন, 'Glad to hear it." ভঙ্গিটা এক্ষেত্রেও একটু তির্যক। সে যুগের যে সব আচার্যদের দেখার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছে তাঁরা সকলেই ছিলেন পুণ্যদর্শন। উপনিষদ্ ব্রহ্মবাদ ছিল এঁদের প্রেরণার উৎস। প্রতীক-উপাসনা কিংবা মূর্তি-পূজার প্রতি ছিল এঁদের বিজাতীয় বিদ্বেষ—দুর্গা কালীর নাম শুনলে এঁরা নাকি কানে আঙুল দিতেন। এই উৎকট গোঁড়ামির জন্যই গোঁড়া হিন্দুরদল তাঁদের নাম দিয়েছিল 'কালাপাহাড়' (iconoclast); মূলে হিন্দু হয়েও তাই তারা বৃহত্তর হিন্দু-গোষ্ঠী থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন এবং এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যে তারা গর্ব অনুভব করতেন। শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব প্রভৃতি যেমন নিজের নিজের পূজা পদ্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ ক'রে নিজেদের হিন্দুধর্মেরই শাখা ব'লে পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন,—এরা তা' চান নি কয়েকটি বিশেষ কারণে—এঁরা আনতে চেয়েছিলেন প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন। পাশ্চাত্ত্য ঢঙে এর রঙ্ ফেরাতে চেয়েছিলেন রাতারাতি। বর্ণাশ্রম (জাতি-প্রথা) মানতেন না; খাদ্যাখাদ্যের বিচার করতেন না—নিষিদ্ধ মাংসও

গায়ের ওপর এসে পড়ায় চুরুট-পাণি ছেলেটির চটকা ভাঙলো : সে মুক্তির সন্ধানে মুক্তকচ্ছ হয়ে গোল-দিঘির দিকে দিলো এক চোঁ চাঁ দৌড় ! রাস্তা পার হ'য়ে রেলিং ডিঙিয়ে বীরপুঙ্গবের সেই সকরুণ পলায়নের দৃশ্যটি আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। পেছন ফেরা ছেলেটি পালাবার পথ পেলো না। প্রবীণ অধ্যক্ষ এমনি জোরে তার একটি বাহু চেপে ধরলেন যে তার অবস্থা হ'লো গাঁতা কলে-পড়া ইঁদুরের মত। ধরা-পড়া ছেলেটিকে তিনি নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। নেপথ্যে কি কথাবার্তা হলো জানা গেলো না, কিন্তু এর একটু পরেই নোটিশ বেরোলো দু-জনেরই দশটাকা ক'রে ফাইন্ হ'য়েছে। জরিমানা দাখিল করতে হবে সাত দিনের মধ্যে। মহা ফাঁপরে প'ড়ে গেলো ছেলে দুটি। হিতৈষী বন্ধুরা ব'ললো, "আরে এতে ঘাব্ড়াচ্ছিস কেন ? ফাইন্ এখুনি মকুব হ'য়ে যাবে দু'চার ফোটা চোখের জলে। স্রেফ্ অনুতাপ আর অনুশোচনা ! আতেলা মাথার চুল উস্কো করে কড়া একটিপ 'র' নস্যি টেনে চক্ষু-কর্মচা ক'রে চ'লে যা। 'আরে, তোর আর ভাবনা কি ? প্রফুল্ল-নাটকের যোগেশের পার্ট্টা এক্স্পার্ট এর মতই প্লে করেছিলি তুই। বুড়োকে ভোলানো ও গলানোর আর্ট তো তোর মুঠোর মধ্যে। তোর ঐ ন্যাকা-চৈতন বন্ধুটিকে পক্ষপুটে ঢেকে হীরোর অভিনয়টা তুই-ই করে যাবি। চোখের জল আর পায়ের ধুলো, এ দুটোই হ'লো শাস্তি এড়াবার প্রশস্ত রাস্তা।" যথা প্ল্যান তথা কাজ। কাঁচু-মাচু মুখে অধ্যক্ষের কক্ষ থেকে বেরিয়ে দুটো ক'রে সি ডি টপ্কে নীচের তলায় নেমে হাসিতে ভেঙ্গে প'ড়লো সেই নাটুকে ছেলেটি আর তার লাজুক লেজুড়টি। বেকসুর খালাস। হাসির ধমক কাটলে সেই কাহিনীই তারা ইনিয়ে বিনিয়ে শুনিয়ে দিল। তরঙ্গ-ভঙ্গের তলে অতল সুধা-সমুদ্র। তৃতীয় বার্ষিক ইংরাজি অনার্স্ ক্লাস, গুটি পঁচিশ-ত্রিশ ছেলে। অধ্যক্ষ মৈত্রের সঙ্গে নব-প্রবিষ্ট ছাত্রদের প্রথম সাক্ষাৎ ! তিনি ক্লাসে ঢুকতেই সসম্ভ্রমে সকলে উঠে

দাঁড়ালো। তাদের বসবার ইঙ্গিত করে তিনি আসন গ্রহণ করলেন। কে কোন্ কলেজ থেকে এসেছে, আগের পরীক্ষায় ইংরাজিতে কে কি নম্বর পেয়েছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদ চলার পর তিনি জানতে চাইলেন Encyclopaedia কার কার আছে। বেবাক ছেলে নিরুত্তর। কারুরই নেই—এই সিদ্ধান্তই যখন স্থির হতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় পেছনের বেঞ্চ্ থেকে একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে গর্বোৎফুল্ল মুখে জানালো Encyclopaedia তার আছে। কোন সংস্করণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিল 'Pears'। অধ্যক্ষ মহাশয় স্মিতমুখে একটু বিদ্রূপের ভঙ্গিতে ব'ললেন 'splendid !' চাপা হাসির একটা হল্‌কা ব'য়ে গেলো ক্লাসের ওপর দিয়ে। ছেলেরা বুঝলো একেবারে 'গোবিন্দদাস'-পন্থ তিনি। রাশের নীচে রসের সঞ্চয় আছে। ওয়াটার্লু যুদ্ধের তারিখ সম্বন্ধে একবার একটি ছেলে একেবারে নির্ভুল উত্তর দেওয়ার ফলে বলেছিলেন, 'Glad to hear it." ভঙ্গিটা এক্ষেত্রেও একটু তির্যক। সে যুগের যে সব আচার্যদের দেখার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছে তারা সকলেই ছিলেন পুণ্যদর্শন। উপনিষদ্ ব্রহ্মবাদ ছিল এঁদের প্রেরণার উৎস। প্রতীক-উপাসনা কিংবা মূর্তি-পূজার প্রতি ছিল এঁদের বিজাতীয় বিদ্বেষ—দুর্গা-কালীর নাম শুনলে এঁরা নাকি কানে আঙুল দিতেন। এই উৎকট গোঁড়ামির জন্যই গোঁড়া হিন্দুরদল তাঁদের নাম দিয়েছিল 'কালাপাহাড়' (iconoclast); মূলে হিন্দু হয়েও তাই তারা বৃহত্তর হিন্দু-গোষ্ঠী থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন এবং এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যে তারা গর্ব অনুভব করতেন। শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব প্রভৃতি যেমন নিজের নিজের পূজা পদ্ধতি ও আচার অনুষ্ঠান অনুসরণ ক'রে নিজেদের হিন্দুধর্মেরই শাখা ব'লে পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন,—এঁরা তা' চান নি কয়েকটি বিশেষ কারণে—এঁরা আনতে চেয়েছিলেন প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন। পাশ্চাত্ত্য ঢঙে এর রঙ্ ফেরাতে চেয়েছিলেন রাতারাতি। বর্ণাশ্রম (জাতি-প্রথা) মানতেন না; খাদ্যাখাদ্যের বিচার করতেন না—নিষিদ্ধ মাংসও

সুসিদ্ধ হ'লে আত্মসাৎ করতেন সিদ্ধ-হস্তে; খৃষ্টানদের মত রবিবারে রবিবারে জোট বেঁধে উপাসনা-মন্দিরে গিয়ে নিরাকার নির্বিশেষ পরব্রহ্মের চরণে সবিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে কোটি কোটি প্রণতি জানাতেন; স্ত্রী-জাতির 'নাইট্-এরাণ্ট্'-সুলভ একটা অবাস্তব অত্যুগ্র সম্মান-বোধ এদের অনেকেরই ছিল, তাই সামনের পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে ফর্দা ক'রে দিয়েছিলেন এঁদের বিচরণক্ষেত্র এবং এই freedom-এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দিয়েছিল 'free-love'—স্বাধীন প্রেমের অবাধ নীতি,—বাণিজ্যের ভাষায় laissez-faire. বলা বাহুল্য, বিবর্তনের বর্তমান পৈঠায় এর সবগুলিই উগ্র আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে এ যুগের হিন্দু-সমাজে। 'ব্রাহ্ম' নামটাও তাই ক্রমশঃ ব্রহ্মের মতই উহ্য হয়ে আসছে। আমার মনে হয়, এই আচারের দিকটাকে কেন্দ্র করেই ব্রহ্মবাদীদের মধ্যে প্রথমে মতান্তর এবং এর থেকে 'মনান্তর' উপস্থিত হয়। ফলে নবোদ্ভিন্ন ব্রাহ্ম-মন্দির ত্রিধা-বিভক্ত হয়ে আদি, সাধারণ ও নব-বিধান এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ পরিগ্রহ করে। আমাদের সমসাময়িককালে তন্ত্রের 'ওপর 'থিসিস্' লিখে ডক্টরেট্-পাওয়া কালী-মন্দিরে-কপাল-ঠোকা ব্রহ্মবাদীকেও দেখেছি। একটা বিষয়ে একাট্টা ছিলেন তিন দলই। নীতি-নিষ্ঠা পরাকাষ্ঠায় পৌঁচেছিল এঁদের মধ্যে; এটা মাত্রা ছাড়িয়ে যেতো সময় সময়; দস্তুরমত একটা complex-এ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এটা। দু'-একটা সত্য ঘটনার দৃষ্টান্ত দিলেই সেটা মালুম হবে। একটা মজার ব্যাপার চাউর হ'য়ে গিয়েছিল আমাদের ছাত্র-সমাজে। আপনারাও হয়তো সেটা শুনে থাকবেন। একদিন থিয়েটারগামী পথচারী কোন ভদ্রলোক অধ্যক্ষ মৈত্র মহাশয়কে সামনে পেয়ে 'ষ্টার্ থিয়েটার' কোথায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি রেগে মেগে প্রথমে বলেন, 'জানি নে'। কিন্তু দু'চার পা এগিয়ে যাওয়ার পরই তাঁর মনে হ'লো যে এটা তো সত্যভাষণ হ'লো না। থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে পিছন ফিরে তিনি

চিৎকার ক'রে হাত তুলে তাকে ডাকতে লাগলেন। ভদ্রলোক কাছে এলে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, "ষ্টার থিয়েটার কোথায় আমি জানি, কিন্তু ব'লবো না"। ঘটনাটা যে রটনা নয় তাঁর নিজের সাক্ষ্যই তার প্রমাণ। শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ডঃ প্রাণধন আচার্য প্রভৃতি যে সব ব্রাহ্ম-আচার্যকে আমি দেখেছি, এঁরা সকলেই ছিলেন আচার্য মৈত্রেরই সগোত্র। পুণ্যশ্লোক রামতনু লাহিড়ী সম্বন্ধেও অনুরূপ একটি গল্প প্রচলিত আছে। পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'বঙ্গের রত্নমালা' বইটিতে এটি বিবৃত হ'য়েছে। একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়িয়েই বন্ধুকে টানতে টানতে পাশের এক গলির মধ্যে ঢুকে একরকম দৌড়েই বেশ কিছু দূর গিয়ে থামলেন আর দম নিতে লাগলেন। বন্ধু তো অবাক্ তাঁর এই কাণ্ড দেখে। কৌতূহলী হয়ে কারণ জানতে চাইলে লাহিড়ী মহাশয় ব'ললেন, "আমারই রাস্তারই উল্টো দিক থেকে একটু দূরে এক ভদ্রলোককে আমাদের দিকে আসতে দেখো নি? ওকে দেখেই তো আমি ছুটে পালিয়ে এলাম, পাছে ওর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। ও আমার কাছে কয়েকমাস আগে কিছু টাকা ধার করে অভাবে প'ড়ে। শোধ দেবার তারিখ পেরিয়ে গেছে অনেকদিন হ'লো। দেখা হলেই 'আজ দেবো, কাল দেবো' ব'লে লজ্জা পায়। তাই তো পালিয়ে এসে ওকে মিথ্যা বলার দায় থেকে মুক্তি দিলাম।" প্রশ্ন হ'লো, "টাকাটা ছেড়ে দিলেই তো পারেন!" উত্তর এলো, "না না, তা হয় না। ও যে তাহলে নিজেকে ছোট ভাববে। আমি কি এ অসম্মান ওকে করতে পারি?" অধমর্ণের মান বাঁচাতে উত্তমর্ণ পালিয়ে বাঁচছে, এ নজীরের জুড়ি আছে কি? এই উগ্র নীতি-বোধের এক হাস্যকর নমুনা পেয়ে ছিলাম এক বিশ্রুত ব্রাহ্ম অধ্যাপকের কাছে। ইনি সম্ভবপক্ষে বয়সে ছোট এবং বড় সকলকেই সম্মানসূচক 'আপনি' সম্বোধন করতেন; কিন্তু কিছুতেই কাউকে মুখ ফস্কে 'তুমি' ব'লতে পারতেন

না, অথচ এ সব স্থলে 'আপনি' ব'ললেও বেতালা ও বেয়াড়া শোনায়। এই উভয় সংকটে প'ড়ে তিনি কর্তৃবাচ্যই ছেড়ে দিয়েছিলেন,—কর্ম- ও ভাববাচ্যে কাজ চালাতেন। এ সব স্থলে কাউকে বসতে বলতে হ'লে ব'লতেন, 'বসা হোক'। এই ভাবে 'করা হোক', 'লেখা হোক' ইত্যাদি প্রৌঢ়োক্তি অহরহই শোনা যেতো তার মুখে। এই বাচ্যান্তরে শ্রোতার মনে যে ভাবান্তর হতে পারে, ভুলেও তা ভাবতেন না। এমনি মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল তাঁর অভ্যাস। 'মানময়ী গার্লস্ স্কুলের' অভিনয় দেখতে ব'সে তাঁর ভিরমি যাবার জো আর কি! আর সাধারণ রঙ্গ-পীঠকে তো এদের অনেকেই সমাজ-দেহের বিষদুষ্ট অঙ্গ বলে মনে করতেন—এর থেকে নিজেরা থাকতেন এবং বাড়ির ছেলেমেয়েদের রাখতেন সহস্র-হস্ত দূরে। কারণটা বোধ হয় এই যে তখনকার নাট্যসম্প্রদায়গুলি গঠিত ছিল নটীদের দিয়ে। তাই সাধারণ নাট্য-পীঠে উচ্চ-কোটির নাটকগুলির অভিনয় দেখাও দুর্নীতি ব'লেই গণ্য ছিল। শ্রব্যকাব্য হিসাবে যেগুলি তাঁদের নিরিখেও পাংক্তেয় ছিল,—যেমন রবীন্দ্রনাথের অনুপম নাট্য-কাব্য 'চিত্রাঙ্গদা',—রঙ্গপীঠে উঠে দৃশ্যকাব্যের রূপ নিলেই তারা অপাংক্তেয় হয়ে পড়তো। রঙ্গাভিনয়ের শিল্পের দিকটাকে আড়াল ক'রে নাট্য-সংস্থায় বার-নারীদের অস্তিত্বের চিন্তাটাই বড় হ'য়ে দেখা দিত তাঁদের দৃষ্টির সামনে। বিদেশী-মঞ্চের অভিনয় দেখে তাঁদের রোমাঞ্চ হ'তো, সে দেশের নটীদের প্রশংসায় তাঁরা পঞ্চমুখ হ'তেন, দেশের মঞ্চগুলি কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি-প্রসাদ থেকে হ'তো বঞ্চিত। পশ্চিমের উন্মুখতা দিয়েই বোধ হয় পূর্বের বিমুখতা ঢাকতে চাইতেন তাঁরা। কলা-শিল্পের এই মূল্যায়নের এই অভিনব মানকে শ্লীলতা ও শ্রীলতার ভান (prudery) ছাড়া আর কোন্ নাম দেওয়া যায়? আমার সতীর্থ ব্রাহ্ম-বন্ধুদের মধ্যে অন্তত একজনকে আমি দেখেছি, ফাঁক পেলেই ফিকির খাটিয়ে 'পিট্'-এর ফোকরে গিয়ে ঢুকতে। এ প্রসঙ্গ এই পর্যন্ত। এবার বোধ হয়

অধ্যক্ষ মৈত্রের অধ্যাপনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে দু' এক কথা বলা অসঙ্গত হবে না। ঘণ্টা পড়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি ক্লাসে এসে হাজির হ'য়েই হাজিরা নিতেন। পিছনে থাকতো জাহাজের পিছনে লংবোটের মত বিখ্যাত বাহক 'সম্পৎ'। এই ব্যক্তিটি ছিল অধ্যক্ষের 'উপলক্ষণে তৃতীয়া'। জটা দেখে যেমন তাপসকে চেনা যায়, সম্পৎকে দেখেও তেমনি জানা যেতো তাঁর অস্তিত্ব,—বস্তুত, 'সম্পাদ্ভিঃ (গৌরবে বহুবচন) অধ্যক্ষম্ অপশ্যম'—ব'ললে সত্যের বিন্দুমাত্র অপহ্নব হয় না। আপদে-বিপদে, জয়ে-বিজয়ে তাঁর পরম সম্পদ্ ছিল এই 'সম্পৎ'। ভবকে যেমন ভাবা যায় না নন্দীকে বাদ দিয়ে, তেমনি অধ্যক্ষ মৈত্রকেও কল্পনা করা যায় না এই সম্পৎকে বাদ দিয়ে। একঘণ্টায় অন্তত তিনবার স্মরণ করতে হ'তো তাকে নানা আকারের ও প্রকারের ভারী ভারী কোষগ্রন্থ আনবার জন্যে। ছাত্ররা কোন প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিতেন সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু জবাবটার জন্য তাকে জবাবদিহি ক'রতে হয় এই ভয়ে কিংবা সত্যভ্রষ্টতার ভয়েই হয়তো, উত্তরের সাঁচাইটা যাচাই ক'রে নিতে ছাড়তেন না। শেষটা কতকটা সত্য-"মেনিয়া"র মত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর—সত্যের শুচিবাইও বলা যেতে পারে একে। এত বাই যাকে পেয়ে বসে, চলার পথে পদে পদে হোঁচোট খেতে হয় তাকে। অধ্যক্ষ মৈত্র ছিলেন এর জীবন্ত দৃষ্টান্ত। কেবল অন্যের প্রশ্নের উত্তর দেবার বেলায় নয়, কোন বিষয়ে নিজের সংশয় হ'লেও হনূমানকে গন্ধমাদন (বই এর পাহাড) ঘাড়ে করে আনতে হ'তো। মারুতির মতই লঘুগতি ছিল এই বাহন। দু'তিন মিনিটের মধ্যেই এনে ফেলতো গোটা ওষধি-পর্বতটা। 'সন্ধানী' লতাটির সন্ধান করতে বেশ কিছু সময় লাগতো। এই চালে চলার ফলে অধ্যাপনার লয়ও ছিল খুবই বিলম্বিত। কোর্স শেষ কখনই হ'তো না। তবে এটা ঠিক যে, যেটুকু শেখা যেতো তার বনিয়াদটা বেশ পোক্ত হ'তো। শিক্ষা-জীবনে এর চেয়ে বড় লাভ আর কি আছে? জমার ঘরে ছিঁটে-

ফোঁটা পড়লেও দানে দানে তা একটু একটু ক'রে বেড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সঞ্চয়টা নেহাত মন্দ দাঁড়ায় না।

আমার চতুর্থ বার্ষিকের শেষের দিকে স্যাড্‌লার-কমিশন্ তখন কলেজে অধ্যাপকদের অধ্যাপনা-পদ্ধতি পরীক্ষা করে বেড়াচ্ছেন। নোটিস্ বেরোলো আমাদের কলেজে তারা পায়ের ধূলো দিচ্ছেন অমুক তারিখে। ব্যাপার কি ঘটে দেখবার জন্যে আমরা এক পায়ে খাড়া। দেশ-বিদেশের বহু-শ্রুতকীর্তি শিক্ষাবিদ্ আছেন এই দলে—দলপতি সার্ মাইকেল স্যাড্‌লার, সঙ্গে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সার্ আশুতোষ,—পরনে সাদা থান ধুতি, লংক্লথের লংকোট, আর সাইড-স্প্রিং দেওয়া চীনা 'শু'। অধ্যক্ষ মৈত্রকে জানানো হ'লো, কমিশন্ তাঁর পাঠন শুনতে চান, হয় এখানে না হয় স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে। বিশ্রুত বর্ষীয়ান অধ্যাপক প্রস্তাবটা, অপমানকর মনে করে সাফ্ জানিয়ে দিলেন তাঁর অক্ষমতা। এই non-commission-এ commission ক্ষুব্ধ হ'লে আশুতোষ শুনেছি মুখের মত জবাব দিয়ে তাঁদের স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। 'চৈলাদের চৈলাই আগে সামলান, 'ওস্তাদের এলেম দেখবেন পরে।' ভাষাটা অবশ্য আমার, তবে ভাবটা ভব্যভাবে অনেকটা এই রকমই! মুখবন্ধেই মুখ বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল তাঁদের, তাঁরা আর উচ্চবাচ্য করেন নি। এ পরিচ্ছেদের ছেদ পড়ে এইখানেই। সে যা হোক্, শোনা গেলো আরও কয়েকদিন তাঁরা ঘোরাফেরা করবেন আমাদের কলেজে অধ্যাপকদের 'নলেজ' যাচাই করতে। কাল নাকি আসবেন অধ্যাপক গুহের (রজনীকান্ত) ইংরাজি ক্লাসে। গুহের গুহা থেকে গুহাহিত কিছু বেরোয় কিনা দেখবার জন্যে ছাত্ররা সকলেই খুব কৌতূহলী। ড্রেসটা কি রকম হবে তা নিয়েও জল্পনা-কল্পনা চলছে ছেলেদের মধ্যে—সেই সনাতন তাকিয়ার খোলের ওপর নীলরঙের সাদা-জরির-ডোরাকাটা পুরু কাপড়ের গলা-আঁটা লম্বা কোটটা বজায় থাকবে, না, শোভা পাবে শোভন কোন বিশেষ পোশাক এই বিশেষ উপলক্ষ্যকে লক্ষ্যে রেখে,

এই হলো বিতণ্ডার বিষয়। আমি কিন্তু ওসব জটিলতার মধ্যে না গিয়ে বলেছিলাম উনি 'casual leave' নেবেন। খড়ি পাততে হয় নি, বুঝেছিলাম সহজ জ্ঞানের সাহায্যে। ইংরাজি ভাষাটা বিলাতের হলেও উচ্চারণপদ্ধতি ও বাগ্‌রীতি ছিল তাঁর নিজস্ব। নির্ভাজ ও নির্ভেজাল বরিশালী টান। 'Sir, the fan has stopped.' ছাত্রের এই উক্তির উত্তরে যিনি সহজ স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'spontaneously ?' কিংবা খাঁটি বাঙলা শব্দ লাঠিকে ইংরাজি নাম ধাতুতে পরিণত করে,'He lathied the man.' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করতেন অকুতোভয়ে, সেই বীর-সত্তমের প্রশংসাও করতে হয় অকুণ্ঠ-কণ্ঠে। ভাষা-জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা এর কারণ নয়, ইংরাজিতে অধিকার ছিল তার অনেকের চেয়েই বেশি : একটা রঙ্গ-রঙ্গীন অবলীলার ভাব লুকিয়ে থাকতো এই রমণীয় এবং স্মরণীয় উক্তিগুলির মধ্যে। পরের দিন আমাদের আচপাটই শুধু সার! বেহাল হ'লেও বহাল আছে হাট ; ভোলও ফেরান নি। 'casual'ও নেন নি, তবে ম্যালেরিয়ার ধমকে বেজায় কাবু। ইজি-চেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে সে কী uneasy ভাব! ফলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো অধ্যাপক পি. এন. চ্যাটার্জিকে। বেশ ভালই পড়ালেন তিনি। ওদিকে অধ্যাপক গুহের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। সাপও ম'রলো, লাঠিও ভাঙলো না। এ কলা' কি 'তুলা' আছে ? এর দশ পনেরো বছর পরের কথা। আমার সতীর্থ নির্মল চক্রবর্তীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। আমরা দু'জনাই তখন অধ্যাপক,—নির্মল সিটি কলেজে, আমি কৃষ্ণনগরে। পরস্পর কুশল-বিনিময়েরও আগে নাটকের prelude-এর মত নির্মল ব'লে উঠলো, "একটা খুব দামী খবর জানাচ্ছি তোমাকে, মন দিয়ে অবধান করো।" সাগ্রহে তার মুখের পানে চাইতেই বিশ্রদ্ধ গম্ভীর স্বরে বললো, 'খবরদার, খবরটা ফাঁস করে ফেলো না যেন। অধ্যাপক গুহের সেই সনাতন আজি-কাটা লংকোটটা আজও আছে,মাঝেমাঝে গায়ে চড়ে।' শুনে তো আমি আর নেই। ব'ললাম, 'বলো কি ?'

তারপর এই নিয়ে দুই বন্ধুতে পথের মাঝখানে সে কি হাসাহাসি! পথের লোকে হয় তো ভাবলো, এরা পাগল নাকি? এই খোশ খবরটা শুনে আপনারাও খুশী হবেন আশা করি। কথায় বলে, খোশ খবরের ঝুটোও ভালো,—এতো তাহা সত্যি।

মনোবিদ্যা পড়াতেন অধ্যাপক এস্. সি. সেন। এঁর বই-এর ভেলায় চ'ড়েই ডুবতে ডুবতেও আমরা ওপারে উঠেছিলাম। বইখানি নিম্নাধিকারী ছাত্রদের পক্ষে খুবই উপযোগী ছিল। অধ্যাপক সেন কিন্তু গ্রন্থি বেঁধে চলতে পারেন নি ইংরাজির সঙ্গে। ইংরাজি তখন শিক্ষার বাহন, কাজেই এ ভাষার ভার তাঁকে বহন করতেই হ'তো। ভাষাটা খুঁড়িয়ে চলতো বলে ভাবটা সব সময় ঠিক খাড়া থাকতে পারতো না। একদিনের একটা ছোট্ট মজার ঘটনা বলি। ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত-স্থলে তিনি বললেন, "You are passing by the road, suppose a tiger suddenely comes jumping on you, then what will you do?" সকলেই চুপ। একটু থেমে উত্তরটা ব'লে দিলেন তিনি নিজেই—'You will shudder, doing—অর্থাৎ এমনি ক'রে, ব'লেই ঊর্ধ্বাঙ্গের এমন একটি দৃষ্টি-মিষ্টি মোচড় দিলেন যে তার কাছে উদয়শংকরের লীলায়িত অঙ্গচ্ছন্দও হার মানে। লোক ছিলেন সদাশিব; শুনেছি প্রথম হ'য়েছিলেন এম্. এ. পরীক্ষায়, কিন্তু তেমন নাম করতে পারেননি অধ্যাপক হিসাবে তাঁর কুন্থন-কুণ্ঠিত ভাষার জন্যে। ইংরাজি না ব'লে তাকে তার দাগরাজি বলাই বোধ হয় সঙ্গত। বাচিকের ঘাটতিটা তিনি সেরে নিতেন আঙ্গিকের ভঙ্গি দিয়ে। বোঝা কিছু কম যেতো না, তবু কেমন মন খুঁত খুঁত করতো!

সিটি কলেজ প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট ঘটনার কথা মনে প'ড়ে গেলো। আমি তখন চতুর্থ বর্ষে, থাকি কলেজের অনুমোদিত একটি ছাত্রাবাসে, নতুন কলেজের খুব কাছেই। দোতলা বাড়ি, ত্রিতলে মাত্র একখানা ঘর, সেটি অধীক্ষকের জন্য নির্দিষ্ট। অধীক্ষক ছিলেন নির্মল

সিদ্ধান্ত, স্কটিশ-চার্চ কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক। একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সেই কথাই এবার বলবো। আবাসিকদের মধ্যে ছিলেন আমার সহপাঠি পৃথ্বীশ দাশগুপ্ত, ইনি পরে Accountant General হয়েছিলেন। আর ছিল কুমিল্লা জেলার একটি ছেলে, নাম নগেন দাস। কালো কোলো ছিমছাম ছেলেটি, স্বাস্থ্যবান ও বর্ষীয়ান্। শুনেছিলাম বছর ছ'-সাত ধরে আই.এ.-র দেওয়ালে তাল ঠুকছে, কিন্তু নিষ্ক্রমণের পথ পাচ্ছে না। মাঝে মাঝে পড়া ছেড়ে দেয়, ঠিক পরের বছরই আবার তেড়ে ধরে। বস্তুত, কতো ঘাটের জল খেয়ে যে সে সিটির পাটে এসে ঠেকেছিল, সে গুহ্য তথ্য সে ছাড়া আর কেউই জানতো না। বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল। মাসে মাসে রেস্তও আসতো মন্দ নয়। নতুন নতুন বই ও নোট-বই কিনে ব্রাউন-পেপারের মলাট দিয়ে ওপরে সযত্নে ক্ষোদিত অক্ষরে নিজের নাম ও বই-এর নাম লিখে অইলক্লথে ঢাকা মেজের ওপর সাজিয়ে রাখতো। বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতো সর্বদাই। কিন্তু তাকে পড়তে দেখেছি খুব কমই। বাট্লার কিংবা ক্রপ্-এর ক্ষুরে নিজের হাতে পরিপাটি করে প্রত্যহ দাড়ি কামাতো, চাকর ঝাঁট দিয়ে যাবার পরও নিজের হাতে আর একবার ঝাটা চালাতো। বিজলীর ব্যবস্থা ছিল না, উৎকৃষ্ট ডোমওয়ালা বাতিদান ব্যবহার করতো। গানের গলা ছিল তার মধুর ও উচ্চ। মীড়-মূর্চ্ছনা, গিটকিরি-গমক নিখুঁত, আর সব চেয়ে বড় কথা কণ্ঠে ছিল মাধুর্যের সংগে অপূর্ব ঐশ্বর্য—মিঠে অথচ মেঠো নয়। প্রভাতে, প্রদোষে দোতলার ছাদে উঠে যখন গলা ছেড়ে গান ধরতো, তখন অতি বড় অ-সুরও কান পেতে সেই তান শুনতো। গলার আদলটা ছিল অনেকটা ভবানী দাস অথবা মৃণালকান্তির মত। খাদ এবং চড়ি দুই সপ্তকই অবলীলায় লীলায়িত হতো তার কণ্ঠস্বর। সুরপ্রসঙ্গ এই পর্যন্ত। আমার স্কুলের এক সহাধ্যায়ী বন্ধু এই সময় এসে দ্বিতীয়বর্ষ বিজ্ঞানের ক্লাসে ভর্তি হ'লো

—নাম পূর্ণচন্দ্র প্রামাণিক। ছাত্রাবাস ভর্তি, খালি একতলায় নগেনের ঘরের একটা সীট্। তার গোপন ইচ্ছা সে একাই ঘরটা ভোগদখল করে। আমি সুপারকে ব'লে তার ঘরেই পূর্ণর থাকার ব্যবস্থা করে দিলাম। নগেন মুখে স্পষ্ট প্রতিবাদ করলো না বটে, তবে তার ভাবগতিক দেখে বুঝতে বাকি রইলো না যে ব্যবস্থাটা সে মনে মনে অনুমোদন করে নি। এক ঘরের মধ্যে দুজনা রইলো বটে, তবে সম্বন্ধটা দাঁড়ালো দুই সতীনের মত। নগেন কথা বলে না পূর্ণর সঙ্গে, পূর্ণ বহু চেষ্টা করেও হার মানলো। বিচ্ছেদটা চরমে উঠলো ক্রমে, বিছানার চাদরেক পর্দা পড়লো ঘরের মাঝখানে। পূর্ণচন্দ্র হ'লো রাহুর পূর্ণগ্রাস। নগেন এর পরে উঠে পড়ে লাগলো তার শত্রুতা সাধতে। নিরীহ ও নাচার পূর্ণ আমাকে এসে ব'ললো, "আমার তো ভাই, আর এখানে থাকা চলে না। দেখেশুনে অন্য কোথাও উঠে যাই, কি বলো?" আমি ব'ললাম "তা কেন? এই অন্যায় জিদের কাছে নতি স্বীকার? কদাচ নয়। আমি জানাচ্চি ঘটনাটা সিদ্ধান্ত মশায়ের কাছে, তার সিদ্ধান্তই তো চূড়ান্ত হবে।" তাকে ব্যাপারটা খুলে বলতে তিনি বললেন "একখানা দরখাস্ত লিখে আমায় দাও, দেখি বিহিত কি করা যায়"। পূর্ণ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে একখানা দরখাস্ত পেশ করলো। সিদ্ধান্ত মশায় নিজে রায় না দিয়ে ব্যাপারটা কলেজ কর্তৃপক্ষের গোচর করলেন। দু'-একদিনের মধ্যেই তদন্তে এলেন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্ম-আচার্য অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায়। অকুস্থলে গিয়ে দেখলেন চাদরের পর্দা, নগেন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারলো না। সবদিক বিবেচনা করে আচার্য রায় রায় দিলেন—পর্দা খোলো, নয়তো ডেরা তোলো। অধীক্ষক সিদ্ধান্তও সহায়ক বিচারকরূপে তাঁকে সমর্থন ক'রলেন। এরপর কিছুদিন কলকণ্ঠ নগ-বিহঙ্গের বুলি বন্ধ হয়ে গেলো আমের বোল-খাওয়া বোবা কোকিলের মত; তার প্রাণগলানো গান আর গেলো না শোনা।

আমি অধ্যাপক-পদে প্রথম বহাল হই কৃষ্ণনগর কলেজে এবং এই কলেজেই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বাইশটি বছর কাটে, হয়তো চাকুরি-জীবনের বাকী ক'টা বছরও কাটতো, কিন্তু একটা পদোন্নতিকে উপলক্ষ্য করে স্থানত্যাগ করতে হয়েছিলো! পল্লীর নিস্তরঙ্গ শান্ত জীবনের পরে শহরের ঢেউ-এ নাকানি-চোবানি খেতে হবে তা' জানতাম, তাই এই উদ্‌গতিকে সদ্‌গতি বলে মানতে পারিনি মনে মনে। দু'তিন বছর অন্তর ঠাঁই বদল করতে হয়েছে সরকারী কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে এমনও অনেকে আছেন। কাজেই যাঁরা সারা চাকরি-জীবনটাই এই একই কলেজে কাটিয়ে গিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে তুলনা করে দুঃখ পাই কেন? মুসলমানদের একটি পরবের নাম—'সব্‌-ই-বরাত্‌'; মূলে এর মানে যাই হোক, মানুষের জীবনে বরাত্‌ ছাড়া আর কিই-বা আছে? সুতরাং আসন্নকে প্রসন্ন মনে মেনে নেওয়াই তো ভালো। সে যা হোক, বিলাপ নয়, আলাপই আমার লক্ষ্য; আর অপলাপ ছাড়া আলাপ জমে না, তা তো জানেন —এই কারণেই এই লেখার নাম দিয়েছি অপলাপ। নিরেট সত্যি বেশিক্ষণ সহ্য করা যায় না—দু'-পাঁচ মিনিট শুনতে শুনতেই হাই ওঠে। তাই অস্‌কার ওয়াইল্ড্‌ মিথ্যার অবক্ষয়ের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন তাঁর 'Intentions' গ্রন্থে। মিথ্যাই তো শিল্পের জননী। সত্যের চেয়ে সত্যতর এই মিথ্যা—বাস্তবের মরু-প্রান্তরে কল্পনার মন্দাকিনীধারা। এ মনকে ভোলায় এবং দোলায়—দুঃসহকে সহনীয় করে। আমার এই সত্য উক্তিগুলির মধ্যে কল্পনার রঙ যদি কোথাও লেগে থাকে, তবে সে খাদটুকুকে আপনারা সাধ করে বাদ দেবেন না। খাঁটি সোনায় খাদ না মিশলে কি গহনা গড়া যায়? শিল্পও এই গিনি সোনার অলংকার—এতে খাদের মিশেল চাই—চাই রসনা-রসানের মার্জন। ভূমিকা ছেড়ে এইবার ভূমিতে নামি।

আমি যখন কলেজে ঢুকি তখন এখানে ইংরাজির অধ্যাপক

ছিলেন তিনজন। বিভাগের প্রধান ছিলেন ঘোষ সাহেব। এর আগেও নাকি আর একদফা এখানে ছিলেন ; সেবারে সস্ত্রীক, এবারে একক। স্ত্রী প্রখ্যাত সাহিত্যিকা। নানা ঘাটের জল খেয়েছেন অধ্যাপক ঘোষ। পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু কোথাও গিয়ে নাম করতে পারেননি উৎকেন্দ্রিকতার জন্যে। গুম্ফ-শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ-মণ্ডল, মোটাসোটা ঢিলেঢালা শরীর, নাক দিয়ে জল ঝরতো প্রায় বার-মাসই। অবিন্যস্ত, অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ, কলেজে আসার সময় সঙ্গে থাকতো একজন অনুচর। মাথায় তার বই-ভর্তি একটা মাঝারি-গোছের টিনের স্যুটকেস্। স্যুটকেস্‌টি অধ্যাপকদের জন্যে নির্দিষ্ট টানা-ওয়ালা কাঠের দেরাজটার মাথায় নামিয়ে দিয়ে সে ফিরে যেতো এবং সময়মত আবার এসে সেটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতো। বিশ্রামকক্ষের আরাম-কেদারা দু'খানার একখানাতে গুরুভার দেহ এলিয়ে দিয়ে দু'তিনখানা খবরের কাগজেব মধ্যে যে কোন একখানা তুলে নিয়ে চোখের সামনে ধরতেন। বিশেষ পড়তেন বলে মনে হয় না। হয়তো রোদের আলোটুকু আড়াল করবার জন্যেই আশ্রয় নিতেন এই প্রক্রিয়ার। কারণ, সেদিনকার কোন খবর নিয়ে কোন কথাবার্তা হলে তিনি সোজা হয়ে বসে কান পাততেন এবং শিশুর কৌতূহল নিয়ে শুধু শুনতেন না, প্রশ্নাদিও করতেন। ভাব দেখে মনে হতো না যে ব্যাপারটার বিন্দুবিসর্গও এর আগে তাঁর গোচরে এসেছে। অথচ আশ্চর্য হবেন শুনলে যে অমৃতবাজার, স্টেট্‌স্‌-ম্যান, ফরোয়ার্ড্ প্রভৃতির প্রত্যেকটিই তিনি নিত্য নিতেন এবং নিতেন দু'তিনখানা করে এই ভয়ে যে, একখানা খোওয়া গেলে যদি আর একখানা না পাওয়া যায় ! কি পুরুষার্থ চরিতার্থ হতো এতে,তা তিনিই জানতেন। কারণ ধর্মের মত খেয়ালের তত্ত্বও "নিহিতং গুহায়াম্" ! ক্লাসে যাবার আগে মিনিট কয়েকের জন্যে একবার ল্যাভেটরিটা ঘুরে আসতেন—প্যান্টের বোতাম লাগাবার কথাও মনে থাকতো না সব সময়। ফলে, যে করুণ-মনোহর পরিস্থিতির উদ্‌ভব হয়েছিল

একবার—কালির তুলি দিয়ে সেই তুলনাহীন ঘটনার ছবি তুলতে গেলে তা শালীনতার সীমা ডিঙিয়ে যাবে। যা হোক, মূত্রলোক থেকে মর্ত-লোকে এসেই চাবি লাগিয়ে খুলতেন স্যুটকেস্‌টা, তারপর সরু মোটা মাঝারি একগোছা বই বেছে নিয়ে ডালা বন্ধ করে খোপ থেকে খপ্‌ করে হাজিরা-খাতাখানা তুলে নিয়ে রওনা হতেন ক্লাসের দিকে। ক্লাসে ঢুকে বই-এর বোঝা টেবিলের ওপর নামিয়ে চেয়ারে বসে স্থুরু করতেন রোল্‌-কল্‌। পড়ানোর খোলে চাঁটি পড়তো অতঃপর। পাঠ্যবইখানা খুলে গড়গড় করে রীডিং প'ড়ে যেতেন কিছুক্ষণ; সঙ্গের বইগুলো থেকে কাগজের নিশানা দেওয়া পৃষ্ঠাগুলো খুলে দাগ-দেওয়া জায়গাগুলো আউড়ে যেতেন। ব্যাখ্যা ছিল সংক্ষিপ্ত, পাঠন-প্রণালী প্রক্ষিপ্ত। কাজেই ভালো ছেলেরাও ভালো করে শুনতো না, ক্লাসে হৈ-হট্টগোল লেগেই থাকতো। তাঁর মত আমার ক্লাস্‌ও থাকত শেষের দিকে, তাই মোলাকাত হতো প্রায় প্রতিদিনই। এই কারণে আমার সঙ্গে ভাবও জমেছিল অল্প-দিনেই। খুব বিশ্রব্ধভাবে আলাপ করতেন আমার সঙ্গে। পরম বিদ্বান্‌ হয়েও আমার মত অল্পবিদ্য নাবালককে (তাঁর তুলনায় আমি তখন নাবালকই) মন্ত্রিরূপে গ্রহণ করেছিলেন অসংকোচে। একদিন শেষ ক্লাস সেরে বিশ্রাম ঘরে ফিরে দেখি তিনি ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে চোখে চশমা এঁটে একখানা সরকারী পরিপত্র মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন। আমার দিকে চোখ পড়তেই খাড়া হয়ে উঠে ব'সে পরিপত্রখানা সামনে ফেলে দিয়ে বললেন, "কি উত্তর দেওয়া যায় বলুন তো?" আমি তখন ডেলি-প্যাসেঞ্জার, শান্তিপুরের ট্রেন ধরার তাড়া ছিল। তাই তাড়াতাড়ি বললাম, "বলুন না বিষয়টা কি? পারি তো জবাব দেবো।" তিনি বললেন "ডি. পি. আই. জানতে চান, ইংরাজির পাঠ্যতালিকায় বাইব্‌ল্‌ থাকা উচিত কি না। আপনি কি বলেন?" আমি না ভেবে চিন্তেই বলে ফেললাম, "থাকাই তো উচিত। ইংরাজি সাহিত্যে বাইব্‌ল্‌-এর নজীর

তো কথায়-কথায়। বইখানাকে ধর্মগ্রন্থ হিসাবে নেবার দরকার কি? তা ছাড়া এর ভাষার দিকটাও ফেলবার নয়, অমন সরল মধুর ভাষা কি আর হয়?" "তাই লিখে দি, কি বলেন।" "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই লিখে দিন"—বলেই পুঁথি-পত্র গোছ-গাছ করে পথে পা বাড়াবার তালে আছি, ঠিক সেই সময় মুখেই বাধা পড়লো। ঘোষমশায় আলমারি থেকে কয়েক তা ফুলস্ক্যাপ্ কাগজ ক্ষিপ্রহস্তে বার করে নিয়ে পিছন থেকে ডাক দিলেন। গুরুকল্প অধ্যাপক, বলাই বা যায় কি? মোগলের হাতে প'ড়ে খানাই খেতে হলো— বসে পড়তে হলো তাঁর সামনের একখানা চেয়ারে। দোয়াতে কলম ডুবিয়ে নিয়ে ঠায় বসে রইলেন, রেখাপাতের নামও করলেন না। অধীর হয়ে আমি বললাম, 'লিখুন', উত্তর এলো, 'বলুন'। আমি তো অবাক; ওঁকে আমি বলে দেবো, তবে উনি লিখবেন! জোনাকী দেবে চাঁদকে আলো—কৃপণ করবে দাতাকে দান! কিন্তু উপায় নেই, ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র আধ-ঘণ্টা বাকী, শেয়ারের গাড়ীতে গেলেও লাগবে অন্তত মিনিট পনেরো। মুখে মুখে যা মনে এলো তাই বলে গেলাম, সুবোধ সুশীল বালকের মত তিনিও অবিকল তাই টুকে নিলেন। পরের দিন সেটাই বাড়ি থেকে এনে তাঁর ঢাকা কলেজের ছাত্র অর্থনীতির অধ্যাপক প্রসাদ-বাবুকে দেখালেন। তিনি অনুমোদন করলে পাঠিয়ে দিলেন অধ্যক্ষের বরাবর। আর একদিন অফিসে গিয়ে দেখি অধ্যাপক পি. কে. ডি. টাইপরাইটারের সামনে বসে কি টাইপ করছেন। জিজ্ঞাসা করতে ইঙ্গিতে বললেন, পরে বলবেন। এর খানিক পরে শৌচাগারে গিয়ে দেখি বেসিনের সামনের দেওয়ালে সাঁটা রয়েছে ছোট্ট এক টুকরো কাগজ, তাতে টাইপ অক্ষরে লেখা, 'Blowing of nose is strictly prohibited.' বুঝতে দেরি হলো না কার উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিপত্র রচিত। ঘোষ সাহেবের বারো-মাসই সর্দি, সে কথা আগেই জানিয়েছি। তিনি শৌচাগার ব্যবহার করার পর,

সেখানে ঢোকে কার সাধ্য। সিক্‌নি-কফে মেঝের তো কথাই নেই, সামনের দেওয়াল পর্যন্ত মসীচিহ্নিত, দুর্গন্ধে রুমাল চাপা দিতে হয় নাকে। একদিন হঠাৎ "কাত্যায়ন, নাড়ী দেখতে জানো?"-ভঙ্গিতে ডানহাতের কব্জিখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখুন তো।' আমি হাত দেখতে জানিনে বলাতেও তিনি মানলেন না। হাত আমাকে দেখতেই হলো! বললাম, "কফাশ্রিত নাড়ীটা একটু কুপিত, বায়ুর প্রকোপও কিঞ্চিৎ হয়েছে মনে হচ্ছে।" "রাতে কি খাওয়া যায় বলুন তো?" ব'ললাম, "শুক্‌নো-শাক্‌না খাওয়াই ভাল। দু'খানা ঘি-না-মাখানো রুটি, আর এক কাপ গরম গরম দুধ খেয়ে শুয়ে পড়বেন।" পরের দিন আর কলেজে এলেন না। উদরাময়-বাবদ ছুটি চেয়ে দরখাস্ত পাঠিয়েছেন। লোকমুখে শুনলাম ব্যবস্থামত পথ্যের কোন ত্রুটি হয়নি, তবে রুটির মাত্রাটা মাত্র ডজন-দু'য়ে ঠেকেছিল এই যা। পেট ছেড়েছিল কি অমনি? ধাত ছাড়েনি এই ঢের! একবার ঘোষ সাহেবকে, কবিরাজকে দেখাতে তিনি পরীক্ষা করে ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করলেন; বিশেষ করে বলে দিলেন, শুধু ওষুধ খেলেই চলবে না, পথ্যের দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে রীতিমত। যকৃৎটা বিকৃত হয়েছে কি না! পথ্যতালিকা থেকে পেঁপেটা যেন বাদ না পড়ে। ফলে পরের দিন বাজারে গিয়ে এক ঝুড়ি কাঁচা পেঁপে কিনে আনলেন। আজ বাজারে উঠেছে, পরে যদি না পাওয়া যায়—এই ভয়েই এই সাগ্রহ সংগ্রহ। শুনেছি, মা বাতাবীলেবু খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বাজার ছেঁকে গোটা-পঞ্চাশেক বড় বড় বাতাবীলেবু এনে হাজির করেছিলেন। যুক্তি এক্ষেত্রেও একই;—আজ পাওয়া যাচ্ছে, কাল যদি পাওয়া না যায়! পথ্যের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু নেপথ্যে অপথ্যও নেহাত কম চললো না; সুতরাং বুঝতেই পারছেন ফলটা কি দাঁড়াতো। শীতকালে সান্ধ্য-স্বাস্থ্য-ভ্রমণে বেরোতেন প্রায় প্রতিদিনই,—বেরিয়ে পড়তেন বেশ একটু রোদ থাকতেই। সঙ্গে

থাকতো পা পর্যন্ত লম্বা এক পেল্লায় ওভার-কোট আর পুরু পশমের এক গলাবন্ধ ; সঙ্গে যেতো এক বিশ্বস্ত অনুচর—দাউ-দাউ করে জ্বালা একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে ; লুণ্ঠনের ভয়ে কি না কে জানে ? ভ্রমণ শেষ করে বাড়ী ফিরতে বেশ একটু রাত হয়ে যেতো। কাজেই আলোর প্রয়োজনটা একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়, কিন্তু আয়োজনটা অত আগে-ভাগে করা হতো কেন, ঐখানেই যতো খট্‌কা। ঝড়ের ঝাপটায় দেশলাই যদি নিভে যায় তখন ? তৈরী হয়ে বেরোনোই ভাল নয় কি ? পারেন তো খণ্ডন করুন এই অখণ্ডনীয় যুক্তি।

ছোটভাই এসেছেন কৃষ্ণনগরে দাদার কাছে। পরিক্রমায় বেরোবার সময় বারবার বলে দিয়েছেন দাদাকে, বন্ধু প্রসাদবাবুকে রাতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করতে। পথে পা বাড়িয়েই বেমালুম ভুলে গিয়েছেন ঘোষ সাহেব। রোঁদ শেষ করে বাড়ি ফিরবার সময় সামনে প্রসাদবাবুর বাড়িটা দেখেই বিজলী-ঝলকের মত মনে পড়লো নেমন্তন্ন করার কথাটা। রাত তখন ন'টার কাছাকাছি। ভায়া কি মনে করবে, এই ভেবে সেই রাতে ঢুকলেন প্রসাদবাবুর হাতার মধ্যে। বারান্দায় উঠেই 'প্রসাদ', 'প্রসাদ', বলতে বলতে তাঁর শোবার ঘরের দরজার গায়ে বসালেন গোটা-তিনেক মোটা হাতের কড়া কিল। প্রসাদবাবু, সেদিন শরীরটা ভাল নয় বলে গিন্নীকে কিছু খাবেন না জানিয়ে, সকাল সকাল লেপের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। শীতের রাতে তন্দ্রার মুখে তপ্ত-শয্যা ছেড়ে ওঠা যে কি ব্যাপার, তা ভুক্তভোগীরা ভাল করেই জানেন। কিন্তু, গুরুর গুরু আহ্বান। কিলের ডাকে উঠে খিল খুলে দিতেই হলো। "সার্, এতো রাতে, কি খবর ?" উত্তর এলো, "একটা বড় ভুল করে ফেলেছি। বেড়াতে বেরোবার সময় নেপাল বলে দিয়েছিল—নেপাল এসেছে জান তো ? —তোমাকে আজ রাতে খাবার নেমন্তন্ন করতে। খেতে খেতে পুরানো বন্ধুর সঙ্গে পুরানো দিনের কথাবার্তা হবে, এই ছিল তার ইচ্ছে। বড্ডো ভুল করে ফেলেছি। তোমার বাড়ি দেখেই মনে

পড়লো কথাটা। নাও, তৈরী হয়ে নাও চট্ করে, আমার সঙ্গে যেতে হবে।" "বলেন কি সার? আমি তো আজ রাতে কিছু খাবো না, শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছিল বলে সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিলাম।" "না, না, তা হয় না, প্রসাদ, ভায়া ভারী রাগ করবে। তোমাকে যেতেই হবে, নইলে আমি বাড়ী ঢুকতে পারবো না।" গুরুর আদেশকে তো আর লঘু করা যায় না—অগত্যা অসুস্থ শরীরে দেহে পোষাকের বোঝা চাপিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা রাতে পায়ে হেঁটে পাকা তিন পোয়া পথ পাড়ি দিতে হলো প্রসাদবাবুকে। বাড়ি পৌঁছে ঘরে ঢুকে প্রসাদবাবুকে দেখিয়ে বললেন, "এই নাও নেপাল তোমার বন্ধুকে, আজ রাতে ও তোমার সঙ্গে খাবে।" নেপাল, বললেন, "তাই তো কথা ছিল, কিন্তু আপনার আয়োজন কোথায় দাদা? রান্নাবান্না কিছুই তো হয় নি। খাবে কী?" "সে তুমি ভেবো না। কাছেই বাজার, এখুনি পাঠিয়ে দিচ্চি রঘুকে, মাংস কিনে আনবে। তারপর গন্‌গনে আচে মাংস সেদ্ধ হতে আর কতক্ষণ লাগবে? বড় জোর ঘণ্টা দুই-আড়াই—চালটা নতুনই আছে, চট্ করে গ'লে যাবে। ও-বেলার ডালটা তাতিয়ে নিয়ে যা হোক একটা ভাজা করে নিলেই দিব্বি খাওয়া হবে। এই তো সবে সাড়ে-নটা, সাড়ে-বারোটার মধ্যেই আহারে বসা যাবে। তোমরা দু'জনে আলাপ করতে থাকো, আমি ওদিককার ব্যাপারটা দেখছি।" এই বলে 'রঘু' 'রঘু' করে হাকডাক সুরু করে দিলেন। দোকান-পাট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, রঘুর জানা একজন কসাই দোকানেই শুতো,—সে ঝাঁপ বন্ধ করেনি তখনও, তাকে খোসামোদ করে সকাল-বেলাকার বাসি খাসীর মাংস খানিকটা সংগ্রহ করে অনুরক্ত রঘু বিরক্ত মনে বাড়ি ফিরলো। মাংস পাওয়া গিয়েছে দেখে কর্তা কিন্তু খুব খুশী। তদারক করে, তাগিদ দিয়ে রঘু ও ঠাকুরকে অস্থির করে তুললেন তিনি। বাসি-মাংস সেদ্ধ হতে কি চায়? ঘণ্টা তিন-চার ধস্তাধস্তির পর আধ-সেদ্ধ অবস্থাতেই উনুন থেকে নামাতে

হলো ডাঙায়। আয়োজনপর্ব শেষ হলে ক্ষুধার তাড়নে নয়, ভদ্রতার প্রয়োজনে ভোজনে বসতে হলো প্রসাদবাবুকে বাড়ির দু'জনার সঙ্গে। ড্রয়িংরুমের ঘড়িতে তখন বাজছে ঢং ঢং করে তিনটের ঘণ্টা। মাংসে তখনো কাঁচা গন্ধ ছাড়ছে। রবারের মত দাঁতের চাপে ব'সে, দাঁত তুলে নিলেই আবার ফুলে উঠছে। ফলে ভোজ্য সবই ফেলা গেলো, পেটে পৌঁছলো না। উঠে আঁচিয়ে বৈঠকখানায় বসে আস্ত একটা হ্যাভানা শেষ করতেই পূব-আকাশে আলোর আভাস দেখা গেলো। নীড়ের মধ্যে থেকে সন্থ-ঘুম-ভাঙা পাখীর জড়িমা-মাখা সুরের প্রসাদ রাত-জাগা প্রসাদবাবুর কানে ঘুম-পাড়ানি গানের মত সুধা-বর্ষণ করতে লাগলো। চেয়ারে হেলান দিয়েই চোখ জড়িয়ে আসতে চায়। ঘোর কাটিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন প্রসাদবাবু। মাস্টার-মশায় তখন সুখ-সুপ্ত—পাশের ঘর থেকে তাঁর নাকের ডাক শোনা যাচ্ছে। বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাড়ির মুখে। পথে প্রায় রাত্রিচর এক স্বাস্থ্যান্বেষীর সঙ্গে দেখা হতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ এতো সকালেই যে!" "হ্যাঁ, আজ একটু সকালই বটে, আপনাকে 'বীট্' করতে পারিনি তবু, আপনি আমারও আগে।"

ঘোষ সাহেবের স্ত্রী শিক্ষিতা ও সাহিত্যিকা ছিলেন, একথা আগেই জনিয়েছি। তিনি তখনকার ছোট-বড় অনেক পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত গল্প-উপন্যাস লিখতেন এবং লিখে নামও করেছিলেন। লেখা চেয়ে সম্পাদকরা চিঠিপত্র লিখতেন, গুণগ্রাহী পাঠকেরা তারিফ করে পত্রাদিও দিতেন। পতিদেবতা চুরি করে সে সব চিঠি পড়তেন। সাহিত্য-সভার নেতৃত্ব করবার অনুরোধ নিয়ে তরুণের দলও দর্শন দিতেন মাঝে মাঝে। আর্যপুত্র ভার্গার এই স্বতন্ত্রতা পছন্দ করতেন না মনে মনে। কিন্তু সাহস করতেন না প্রতিবাদ জানাতে। দূষিত বাষ্প সেফ্‌টি-ভ্যাল্‌ভ্ দিয়ে বেরিয়ে গেলে মনটা কতকটা হাল্‌কা হয়, ঘোষ সাহেব তা' পারতেন না। ফলে, সংশয়ের

বিষ-বাষ্পে জর্জরিত হতেন রাত্রিদিন। শেষটা তাঁদের দাম্পত্য-সম্পর্কটা এতই তিক্ত হয়ে উঠেছিল যে, কেউ কাউকে মুহূর্তের জন্যও সহ্য করতে পারতেন না। বিচ্ছেদ-বিধি তখনও প্রবর্তিত হয় নি, কাজেই নাচার। Sadism বা ধর্ষকামতা ব'লে একটা মানসিক ব্যাপার স্বীকৃত হয়েছে মনোবিকলন বিজ্ঞানে, এই অবস্থায় প্রণয় পরিণত হয় ধর্ষণে। এর নিদর্শন আমরা দেখেছি পদ্মলোচনের প্রতি বগী-বিন্দীর সম্মার্জনী-মার্জনে। রক্তরাগরঞ্জিত পদ্ম তবুও অনুরাগ-ভরে মার্জনা করেছিলেন এই রত্নযুগলকে। পত্নীব্রত পতির সেই অলৌকিক প্রণয়-কাহিনী দীনবন্ধুর জবানিতে আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন। ঘোষ সাহেবের ক্ষেত্রে এই ধর্ষকামতার প্রকাশ ঘটেছিল এর বিপরীত ক্রমে। প্রকাশের প্রকারেও একটু প্রভেদ ছিল। কলেজ যাবার সময় একটি ঘরে সযত্নে তালা বন্ধ করে রেখে যেতেন তাঁর ভার্য্যারত্নকে, কৃপণ যেমন করে সিন্দুকে বন্ধ করে রাখে তার মূল্যবান ধনরত্ন। গৃহিণী জানতেন কর্তার কলেজের কাজ কখন আরম্ভ, কখন শেষ। ব্যূহ-বদ্ধ অভিমন্যু জানতেন না নিষ্ক্রমণের পথ; ইনি সেটা ভালভাবেই জানতেন। ঘরের আর একটি অর্গলিত দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে দুপুর বেলায় নিত্য-কৃত্যগুলি সেরে কর্তা ফেরার আগেই ঘরে ঢুকে খিল এটে বসে থাকতেন। প্রয়োজন মত কখনো একটু গড়িয়ে নিতেন কিংবা দু'কলম লিখে নিতেন। ঘোষ সাহেব গৃহে ফিরে ঘরের ভেতর পত্নীকে আসন-নিষণ্ণ দেখে প্রসন্নমনে তালা খুলে দিতেন। প্রহার তবু সহ্য হয়, কিন্তু প্রহরা অসহ্য। তাই দ্বিতীয় দফায় যখন কৃষ্ণনগরে আসেন, তখন এসেছিলেন একক ও অসঙ্গ। নিত্যপরিকরের মধ্যে ছিল ঠাকুর, চাকর আর একটি ঠিকে ঝি। এরাও হয়তো টিঁকতো না, কিন্তু প্রাপ্তিটা পুরোমাত্রায় হতো বলে কর্তার খেয়ালটাকে খেয়াল করতো না। এই ভাবেই চলেছিল এখানকার জীবন-যাত্রা। নাটকের চরম সন্ধিটির কথাই আমি জানি, গ্রন্থি-মুক্তি ও সমাপ্তির খবর আমি রাখি না।

Kleptomaniac-দের কথাটা শুনেছেন নিশ্চয়। লক্ষ টাকা সামনে প'ড়ে থাকলেও এরা ছোঁবে না, কিন্তু যারই হোক, পছন্দসই জিনিস দেখলেই না বলে ছোঁ মেরে তুলে নেবে। আমার ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের শোনাই। পূজোর ছুটির আর দেরি নেই। 'ভারত-প্রদক্ষিণ' বলে একখানা বই সংগ্রহ করেছি—ছুটিতে কাছাকাছি কম খরচে কোথায় যাওয়া যায় দেখবার জন্যে। কলেজের বিরাম-কক্ষে ব'সে অবসর-সময়ে সেটার পাতা ওল্টাচ্ছি, এমন সময় অধ্যাপক সত্যশরণবাবু এসে আমার পাশের চেয়ারে বসলেন। বললেন, "অত মন দিয়ে কী পড়ছেন?" উত্তরে আমি বললাম, "ও কিছু নয়, একখানা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।" যারা কখনো কোথাও যায় না ভ্রমণ-কাহিনী তারাই পড়ে বেশি; না দেখা দেশের কথাই শুনেছি লেখা যায় ভালো, কল্পনার কলমেই তো গল্প জমে। আপণে বাতায়ন-সজ্জা দেখেই তো ভোগ শেষ করে বেশির ভাগ লোক;—প্রাপণের আনন্দের চেয়ে দর্শনের আনন্দ নেহাত কম নয়। সেই কারণেই সত্যশরণবাবু দেখতে চাইলেন বইখানা, দিলাম তাঁর হাতে তুলে। অল্পক্ষণ পাতা উল্টিয়ে, নাড়াচাড়া করে বললেন, "বইখানা দু'চারদিনের জন্যে নিয়ে গেলে কি আপনার কোন অসুবিধা হবে?" বললাম, "না, না, নিয়ে যান না?" নিয়ে গেলেন তিনি এবং ঠিক চারদিনের মাথায় কলেজেই সেটা ফেরত দিলেন। আমি টেবিলের ওপর বইখানা রেখে ক্লাসে গেলাম, ফিরে এসে দেখি সেটা উধাও। সত্যশরণবাবু এলে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁকে তিনি কিছু জানেন কিনা! বললেন "না, তো!" ঘরের বেয়ারা আসতে তাকেও জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু হদিস মিললো না। আমাকে ব্যস্ত হ'য়ে খুঁজতে দেখে সত্যশরণবাবু বললেন, "তালা দেওয়া না থাকলে একবার ঘোষ সাহেবের বাক্সের ডালাটা তুলে দেখুন না। মিলতে পারে।" তালাটা ভাগ্যক্রমে খোলা অবস্থাতেই লাগানো ছিল বাক্সের গায়ে। ক্ষিপ্র-হস্তে খুলে

ফেললাম ডালাটা। হাত গুণতে পারেন না কি সত্যশরণবাবু? ওপরেই "ভারত-প্রদক্ষিণ।" পাওয়া মাত্রই সেটা সরিয়ে রাখলাম নিজের ঝোলায়—বসে রইলাম বইটি অলক্ষ্য হওয়ায় ঘোষ সাহেবের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার জন্য। ক্লাস থেকে ফিরে বাক্সের ডালাটা তুলেই ঘোষসাহেব দেখলেন, "চিড়িয়া ভাগা।" হারানিধির সন্ধানে উদ্‌ভ্রান্তের মত ইতি-উতি দ্রুত দৃষ্টিসঞ্চালন করলেন ক্ষণকালের জন্যে। কিন্তু সামনে আমাকে দেখেও কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলেন না; কারণ তিনি জানতেন বইখানি আমারই। এমন অদ্ভুত মানুষ আর দেখেছেন? ঘোষ সাহেবের চরিত্রচিত্রণ করতে ব'সে এঁরই কাছাকাছি আর একটি চরিত্র পরদার আড়াল থেকে বারবার উঁকি দিচ্ছে। ইনি ছিলেন তখনকার দিনের একজন বিশ্রুত সুধী—কলকাতার সেরা কলেজের সেরা অধ্যাপক। ইংরাজি সাহিত্যে এর অধ্যাপনার প্রশস্তি ছিল ছাত্রদের মুখে মুখে। কিন্তু পুঁথি ঘেঁটে ঘেটে হয়ে গিয়েছিলেন পুঁথির পোকা, তাই রেখে যেতে পারেন নি সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতির অনুরূপ কোন স্মরণীয় অবদান। এটা দেশবাসীর, বিশেষ করে ছাত্রসমাজের পক্ষে সামান্য ক্ষতি নয়। পড়া ও পড়ানোর চিন্তায় ডুবে থেকে সময় পাননি লেখায় হাত দেবার। আসল কথা, প্রকৃতিস্থ বলতে যা বোঝায় তা তিনি ছিলেন না একেবারেই; 'angularity' অর্থাৎ স্বভাবে ভারসাম্যের অভাব ছিল প্রচুর। ক্লাসে এলেন না, এলেও হয়তো গা লাগিয়ে পড়ালেন না, আবার মরজি হতো তো আরজি ছাড়াই রবিবারেও ক্লাস নেবেন বলে নোটিস্ দিলেন এবং একাসনে বসে একাদিক্রমে চার ঘণ্টা ধ'রে চরকা চালালেন। অবশ্য সে ভাষণ ও ব্যাখ্যানের তুলনা নেই—যেমন প্রাঞ্জল তেমনি রসোজ্জ্বল। তবুও খুব ভাল ছেলেরাও এই একটানা মধুবর্ষণে 'ত্রাহি ত্রাহি' না হোক 'উঠি উঠি' করতো মনে মনে, কিন্তু ওঠার নামও করতেন না তিনি, শ্বাসযন্ত্র নিস্তেজ না হওয়া পর্যন্ত নিরস্ত হতেন

না—চলতো non-stop trans-Atlantic flight.' এটাকে ঠিক প্রকৃতিস্থতা বা balance বলা চলে কি? পথে বেরোলেই তাঁর সঙ্গে (সঙ্গে না বলে অঙ্গে বললেই বোধহয় সঙ্গত হয়) থাকতো একটি ছাতা। কড়া রোদ বা বৃষ্টির সময় ছাড়া মাথায় উঠতো না সেটা—see-saw-র মত দোদুল্যমান্ থাকতো তাঁর কাঁধে। অদ্ভুত balancing, খুব দ্রুত হেঁটে গেলেও 'অচ্যুত' এই ছত্রটি স্কন্ধ-চ্যুত হতো না কখনো। মেয়েদের হাঁড়ি-দৌড়ের কসরতও এর কাছে হার মানে। শারীরিক balancing-এর এমন একজন নিপুণ শিল্পী, এমন একজন সুধী ও সুদক্ষ শিক্ষক যে মানসিক ভার-সাম্য হারাতে পারেন তা ভাবাও শক্ত। প্রকৃতির freak বা খাম-খেয়াল ছাড়া আর কি বলা যায় একে? সরকারী শিক্ষা-বিভাগে দু-একজন আলাভোলা ও আড়-পাগলা বাদ দিয়ে এ পর্যন্ত আমার জানা যে কয়জন স্থিতধী অধ্যাপক কক্ষকেন্দ্র থেকে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, আশ্চর্যের কথা, তাঁরা সকলেই ইংরাজি বিভাগের লোক এবং তাঁদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। ব্যাধিটা মনোরোগবিজ্ঞান শাখার এলাকায় পড়ে; এর নিদান সম্বন্ধে বিধান দিতে পারেন বিজ্ঞানীরাই। পরে সুযোগমত আমার দৃষ্ট ঈষৎ-"স্পৃষ্ট" (touched) দু'একজন সহযোগী অধ্যাপকের বিচিত্র-চিত্র আপনাদের সামনে ধরবার ইচ্ছা রইলো।

এইবার আর একজন শ্রুতকীর্তি অধ্যাপকের চরিতামৃত উপহার দেব আপনাদের। এঁর নাম মাখনবাবু। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র—পরে নিজের কলেজেই গণিতের অধ্যাপক হয়ে আসেন কটকের র‍্যাভেন্‌শ' কলেজ থেকে বদলি হয়ে এবং এখানেই কায়েম হন। নদীয়া জেলার লোক, বাড়ি-ঘর করে বসবাস করেছিলেন কৃষ্ণনগরেই। মক্ষি-চুষ কঞ্জুস ছিলেন প্রথম-জীবনে, উত্তর-পর্বে খুশীমত খরচ করতেন খেয়ালের বশে। তা' বলে চাল বদলায় নি —পাড়ের রঙ্ পাকা। পথে-ঘাটে পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা

হলেই সুরু হয়ে যেতো কথার জাবর-কাটা, ঘণ্টা-তিনেকের দায়ে নিশ্চিন্দি। কৌশল করে কেটে পড়তে না পারলে কাজের দফা গয়া। ইংরাজিটা জানতেন কম, বলতেন হরদম্। কথায় কথায় সগর্বে শুনিয়ে দিতেন র‍্যাভেন্‌শ' কলেজে পায়াটা তাঁর কত ভারী ছিল। বলতেন, "While I was in Ravenshaw College, Cuttack, I was both a physician and a mathematician'—অর্থাৎ পদার্থবিদ্যা ও গণিত দুইই পড়তাম। দোষ তাঁর নয়, ভাষার। রেডিওর দোকানের এক ভদ্রলোক একবার বলেছিলেন, "আমি একজন radiologist." তাঁরই বা দোষ কি? ইংরাজি ভাষাটাই গোলমেলে, তাই তো যতো গোলমাল—সামাল দিতে কামাল হয়ে যায় মানুষের মগজ। অংক পড়াতেন, কিন্তু বোর্ডে উঠতেন না কখনো: মন্ত্রের মত আউড়ে যেতেন গণিতের হীং-ক্রীং। টেম্পো অত্যন্ত দ্রুত, লিখে উঠতে পারতো না খুব ভাল ছেলেরাও। "লিখতে পারি নি, আর একবার বলুন সার্।" বললেই ঝটিতি উত্তর আসতো, "Wait for the next train" অর্থাৎ আসছে বছর আবার হবে, এবছর আর নয়—ভানুমতীর খেল্ এইখানেই শেষ। মাঝে মাঝে 'home-task' দিতেন। পরের দিন ক্লাসে জিজ্ঞাসা করতেন, "Have you brought your home-task?" কেউ আনতে পারেনি জানালে সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিতেন, "then brought it to-morrow." এইভাবে রাজভাষার হত্যা সাধন করেও পরম নির্বিকার! আসলে টেন্স্-এর সেন্স্ তাঁর আদৌ ছিল না; 'weak' এবং 'strong' verb-এর প্রভেদ মানতেন না; তাই অসংকোচে বলতে পারতেন, 'Any how the train must be catched." বাস্তবিক অবাক হয়ে যেতে হয় এই ভেবে যে, অংক যার মাথায় এতো খেলে, ভাষার বেলায় সেটা একটুও খেলে না কেন? তাঁর একটা মুখ্য মুদ্রাদোষের কথাও বলা প্রয়োজন, নইলে প্রত্যবায় হবে। খুব ঘেঁসে এসে মুখের কাছে মুখ রেখে

ছাড়া তিনি কথা বলতেন না এবং কথা বর্ষণের সঙ্গে নিষ্ঠীবন-বৃষ্টিও নেহাত কম হতো না। ছেলেবেলায় মা হয়তো মাঝে মাঝে মাজিয়ে দিতেন দাঁত; নিজের হাতে সে দুষ্কর্ম তিনি করেন নি কখনও। ফলে হরিদ্রাভ একটা ছোপে দন্ত-রুচি রুচির হয়ে উঠেছিল। স্পষ্টবাদী কেউ তাঁকে সেটা জানিয়ে দিলে স্বচ্ছন্দে বলতেন, "বাঘে কি দাঁত মাজে? কেঁদো কেঁদো মোষের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে কড়-মড় করে হাড় চিবিয়ে খায়। মাজার দরুণই তো ক্ষয়ে ক্ষয়ে দাঁতগুলো হয় কাত, দাঁত ঠিক রাখতে চাও তো তাতে দিও না হাত।" ধুতি-পাঞ্জাবী প'রে তখন, কলেজ করা চলতো না। মাখন বাবু আসতেন সাদা পাত্লুনের ওপর কালো-রঙের চোগা-চাপকান চড়িয়ে; সঙ্গে থাকতো লম্বা দড়ি-বাঁধা একটি গোমাতা, কিংবা গো-বৎস। কলেজের মাঠে মেহগিনি গাছের গুঁড়িতে সেটিকে বেঁধে চলে যেতেন কলেজে; কাজ সেরে বাড়ি ফিরতেন আবার সেটিকে নিয়ে। এটা ছিল তাঁর নিত্য-কৃত্যের মধ্যে। তাঁর গোরু-ভক্তি অনেকের গুরু-ভক্তিকে ডিঙিয়ে যেতো। শেষ বয়সে যখন আজীবন কৃচ্ছ্র সাধন ও সযত্ন সঞ্চয়ের ফলে ব্যাঙ্কের অংক ছাড়িয়ে গিয়েছিল লক্ষ-মাত্রা, তখন পুষেছিলেন গাই ও বলদে, এঁড়ে ও নৈই-এ, গোটা চল্লিশ-পঞ্চাশ গোরু। গোয়াল ছিল তাঁর বার-বাড়ির বৈঠকখানার সামনের আঙিনায়, চোনায়-গোবরে সর্বদা থক্ থক্ করতো উঠানটা, কাজেই কোন ভদ্রলোক দেখা করতে এলে কথা বলতেন বাড়ির বাইরের রাস্তায় সেস্-পুল বা ড্রেনের পাশে দাঁড়িয়ে। বিরাট বৈঠকখানা করুণনেত্রে সেই দৃশ্য দেখতো। দুধ যা হতো—মণ-খানেকের মত, মাতৃহীন গোবৎসদের ভোগেই তা লাগতো, নিজে কিনে দুধ খেতেন। এমন কাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে ঘটেছে কি? মাখন বাবুর প্রথম-পক্ষ দেহ-রক্ষা করেছিলেন জলাঙ্গীর জলে ডুবে। শত্রুপক্ষ বলে ঘটনাটা ঘটেছিল তাঁর পারিবারিক খাদ্য-নীতির ফলে। কর্ডন ব্যবস্থা কঠোর এবং র‍্যাশন-বরাদ্দ ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। হাত

কিন্তু খুলেছিল ঠেকায় প'ড়ে। সদ্যোনির্মিত বাড়ীখানি ভাবী-পত্নীর নামে লিখে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং হবু শ্বশুরের হাতে সেইকালে কড়্‌কড়ে পনের হাজারটি টাকা গুঁজে দিয়ে করতে হয়েছিল তাঁকে দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ; আগ্রহ ছিল উদগ্র, তাই এই নিগ্রহ। কর্তার বয়স তখন চল্লিশের কোঠায়—রগের দু পাশের চুলে পাক ধরেছে; ক্ষীণতনু পীনাকার ধারণ করেছে। এই উদ্বাহ উপলক্ষ্যে উকীলরা সব দল বেঁধে এক মিছিল বার করার ফন্দি আঁটলেন। প্রশস্তি-সঙ্গীত রচনা করলেন প্রখ্যাত বাস্তুকার-কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ব্যাজস্তুতির ঢঙে কীর্তনের সুরে। নগর-সংকীর্তন বেরোলো খোল আর ক্যানেস্তারার সঙ্গতের সঙ্গে। শহরময় উৎসাহের সে কি উত্তাল তরঙ্গ! মাখনবাবুর মনে এর প্রতিক্রিয়ার কথাটা জানি না। তবে নিরুৎসাহ হলেও যে নিরস্ত হননি—দ্বিতীয় পক্ষ এবং তাঁর কন্যা-সপ্তকই তার প্রমাণ। প্রথম-পক্ষের দুই কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন বেশ খরচ-পত্র করে। সেই উপলক্ষে প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র, বরাসন, সামিয়ানা, জাজিম প্রভৃতি চাইতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তৎক্ষণাৎ কিনে ফেলেছিলেন সব রকমের এক একটি সেট্। পণ করেছিলেন প্রাণ থাকতে দ্বারস্থ হবেন না কারোর কাছে এই সব প্রার্থনা নিয়ে। বড় বড় পারাত, গামলা, ডেক থেকে আরম্ভ করে ইস্তক বরাসন, শামাদান, সামিয়ানা কিছুই বাদ ছিল না। ক্রিয়া-কর্মে এসব জিনিস কেউ চাইতে এলে কখনো না বলতেন না, নিজের না থাকলে গোপনে দোকান থেকে কিনে আনিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। তার কাছে কোনো জিনিস চেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে কেউ, এটা ভাবতেও তাঁর আত্মাভিমান আহত হতো। অথচ স্টেশন থেকে বাড়ি আসবার সময় এক আনা পয়সা বাঁচাবার জন্যে ঘোড়ার গাড়ীর ভেতরে না বসে অম্লান-বদনে কোচবক্সের কোচম্যানের পাশে উঠে বসতেন। একবার একটা ঘটনার কথা আপনাদের বলি। প্রসাদবাবুর বড় মেয়ের

বিয়ে। বেড়াতে বেড়াতে মাখনবাবুর সঙ্গে তাঁর দেখা। কথায় কথায় মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গ উঠতে প্রসাদবাবু জানালেন এই ব্যাপারে উপচার কিছু কিছু দরকার হবে। "কি কি চাই এবং কবে চাই একটা চিরকুটে লিখে লোক দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। ভাবতে হবে না—যথাসময় জিনিসগুলো পৌঁছে যাবে।" বললেন মাখনবাবু। প্রসাদবাবুর তালিকায় অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে গোটা-বিশেক বেঁটে তাকিয়া, তিনটে ড্রাম আর বে-আড়া সাইজের একখানা জাজিমের ফরমাস ছিল। অতগুলো তাকিয়া রাখালবাবুর স্টক ছিল না। ধুনুরি লেগে গেল তাকিয়া তৈরী করতে; লোক চলে গেল সাইজ-মাফিক জাজিম আনতে কোলকাতায়; হাজারি বিশ্বাসের কামার-শালায় সারারাত জেগে ঠায় বসে তৈরী করালেন ড্রাম তিনটি। জাজিম এসে পৌঁছলে, সব জিনিস একত্র করে নিজের খরচায় পাঠিয়ে দিলেন। নেপথ্যের ব্যাপারটা প্রসাদবাবু শোনেন শুভকর্ম শেষ হয়ে যাবার কয়েকদিন পরে। এক আনা পয়সার সাশ্রয়ের জন্যে ঘোড়ার গাড়ীর টঙে চ'ড়ে বসেন যিনি, তার এই খাতির-নদারতী মেজাজটা নজর করেছেন তো? মুগা, মটকা, গরদ প্রভৃতি দামী কাপড়ের কোট পরতেন, কিন্তু কখনো কাচাতেন না; ছিঁড়ে গেলে ছেড়ে ফেলে আর একটা ধরতেন। চেয়ার এগিয়ে দিলেও ধপ করে মেঝের ওপর বসে পড়তেন, শত অনুরোধেও সেখান থেকে নড়তেন না, অগত্যা গৃহস্বামীকেও মেঝের ওপরই নেমে বসতে হতো। রাস্তায় রাস্তায় হট্রা পিটেই বেড়াতেন সারাদিন অবসর নেওয়ার পর। মায়ার টানে কলেজেও হাজির হতেন মাঝে মাঝে। একদিন লাইব্রেরিতে ঢুকে দেখি গ্রন্থাগারিকের পাশে একখান চেয়ারে বসে আছেন; তাঁর এক পাশে অংকের অধ্যাপক সুধাংশু পাণ্ডা, কাছেই দাঁড়িয়ে আছে বেয়ারা আরজান। টেবিলের ওপর তাঁর সামনে উচ্চ গণিতের একখানা গ্রন্থ খোলা; কঠিন গ্রন্থিগুলো খুলে ধরছেন সুধাংশুবাবুর সামনে উৎসাহ ভরে।

উদ্দীপনার আবেশে গ্রন্থাগারিক মহাশয়কে বলছেন, "নগেন, শোনো মন দিয়ে, শুনছো তো?" পেছন ফিরে দণ্ডায়মান আরজানকে বলছেন, "আরজান, তুমিও শোনো, পরে কাজে লাগবে।" আরজান প্রায় নিরক্ষর, আর নগেনবাবু গণিতের ধার ধারেন না কোন কালেই। একেবারে আস্ত 'ইয়ে' আর কি যাকে বলে ; অথচ মস্ত খেতাব, তার ওপর অবস্থত আই. ই. এস্। খোদার কারখানার আজব সৃষ্টি।

একবার পৌরসভার সদস্য এবং পরে পৌর-প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন মাখনবাবু। নিরতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গেই কাজকর্ম দেখাশুনা করেছিলেন। দিনের পর দিন ময়লা-ফেলা গাড়ীর মাথায় ড্রাইভারের পাশে বসে লক্ষ্য করতে লাগলেন ময়লা-তোলা ও -ফেলা বাবদ দৈনিক পেট্রোল খরচা কতটা, দিনের হিসাব থেকে বা'র করলেন মাসের গড় এবং তখনকার বাজার দরে তার ন্যায্য-মুল্য। সংশ্লিষ্ট কর্মীদের টনক নড়লো এইবার। এর ওপর আবার নিজের ঘরে না বসে বসতে লাগলেন করণিকদের ঘরে। তাদের খাতা-পত্র লেখা দেখেন, দরকার না থাকলে ওপর-পড়া হয়ে নিজের হাতে লিখে দেন। করণিকদের অবস্থা হলো সসেমিরা। বাঁ হাতের কাজ চালানো দূরে যাক, ঘরের মধ্যে বিড়ি-সিগারেট ফোকাও বন্ধ হয়ে গেলো। ফাঁফরে পড়ে তারা মুক্তির উপায় খুঁজতে লাগল। অন্যদিকে ওয়ার্ড-সদস্য, ঠিকাদার প্রভৃতিরও ট্যাঁকে হাত পড়লো, "উপর্যুপরি" বন্ধ হবার উপক্রম। চারদিকে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকলো। চক্রান্তের চক্রে পড়ে তাঁকেই শেষটা নাজেহাল হয়ে হাল ছেড়ে দিতে হলো, সেলাম ঠুকে সরে পড়লেন মানে-মানে। অথচ কী না করেছিলেন নগর-সংস্কারের জন্যে—গামলার ময়লা-উপচানোর পর্যন্ত ফয়সালা করেছেন সরেজমিনে নিজে তদন্ত করে ; প্রয়োজন হলে ময়লা-খাটা ফোকর দিয়ে উঁকি মেরে লক্ষ্য করেছেন অবস্থাটা ; অবশেষে অস্তেয়-বিরোধী

আন্দোলনের কবলে পড়ে নাক-কান ম'লে বিদায় নিতে হয়েছিল এই সত্য-সাধক দেশসেবককে। নিজের হাতে কতটা কাজ করতেন তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছিলাম একদিন কি একটা প্রয়োজনে পৌরসভার অফিসে গিয়ে। তখন বেলা আন্দাজ দুটো—দপ্তর বন্ধ, বিজ্ঞপ্তি-ফলকে লটকানো রয়েছে একটা ছুটির নোটিশ্, পৌর-পিতার নিজের হাতে লেখা। হাতের লেখা না চিনলেও, চিনতে দেরী হয় না লেখার হাতটা কার। গ্র্যামারকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেবার সেই সনাতন মেজাজ পরিস্ফুট এর মধ্যে। নোটিস্‌টা প'ড়ে আনন্দ পেয়েছিলাম প্রচুর, তাই তার সবটাই উপহার দিলাম আপনাদের উপভোগের জন্যে ঃ—"The office will remain closed to-day at 1.30 P. M. on account of Kartik Puja half-holidays." এ ভাষার ওপর ভাষ্য অনাবশ্যক। শুনেছি গণিতের ভাষাতেও প্রশ্নাদির উত্তর দিতেন তিনি সব সময়। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের পর তরুণী-পত্নী দেখতে কেমন, এক ভদ্রলোকের এই প্রশ্নের উত্তরে জ্যামিতির ভাষায় জানিয়েছিলেন—Jewess plus Negress bisected অর্থাৎ 'দ্বিতীয়া' অদ্বিতীয়া নন, স্বরূপা ও কুরূপার মাঝামাঝি। এহ বাহ্য। তার অন্তরের অন্দর-মহলের কিছু পরিচয় না দিলে আলেখ্য অসম্পূর্ণ থাকবে। দায়ে-অদায়ে জানা-শোনা কেউ ধার চাইলে হাজার-দু'হাজার টাকা তিনি তৎক্ষণাৎ বার করে দিতেন—সুদ নেই, সর্ত নেই, লেখা-পড়াও নেই—"payable when able"—যখন পারবে, তখন দেবে—এই প্রথায়। ক'জনের এই কলিজা আছে জানি না। এমন অদ্ভুত মানুষ—বাইরে কুরুচি অন্তরে শুচি, অতীব বিনত একান্ত উদ্ধত, এমন উদাসীন-গৃহী সংসারে বিরল নয় কি? তাঁর অপরূপ মুর্তিখানি আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে!

সরল মানুষ সব কালেই বিরল, তবে এখনকার তুলনায় তখন অনুপাত কিছু বেশী ছিল। এর কারণ, বোধহয় শিক্ষায়তনগুলিতে

তখনও রাজনীতি প্রবেশ করেনি—একটা শুচিশুদ্ধ বাতাবরণ বিরাজ করতো এদের ঘিরে। বিবর্তনের বর্তমান পর্যায়ে হাওয়া একেবারে বদলে গিয়েছে, রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়েছে এপারের তটে। সেই প্রচণ্ড সংঘাতে মথিত হয়ে উঠেছে ব্যথিত ভারত। এই ঘূর্ণ্যচক্রের বক্রমুখে পড়ে রাষ্ট্র- ও সমাজ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র আজ বিপন্নস্ত। এ অবস্থায় শিক্ষা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে বাধ্য। এই অষ্টভুজের ভুজ-বেষ্টন শিথিল না হলে জাতির মুক্তি নেই। সমগ্র দেশ আজ সেই মুক্তিদাতার অপেক্ষায় আছে। সততা ও সরলতা এ কালে উপহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই ভয় হয়, যে জ্ঞান-বৃদ্ধ ঋজু মানুষটির মানস-চিত্র আপনাদের সামনে ধরতে যাচ্ছি, তাকে হয়তো আপনারা ভুল বুঝবেন। এই অধ্যাপকটির নাম চারুচন্দ্র গুপ্ত। স্কুল থেকে উন্নীত হয়ে নীত হয়েছিলেন কলেজে। কলেজে এসেও কিন্তু স্কুলের চাল ছাড়তে পারেন নি। পাঠ্য বিষয় ছিল প্রতীচ্য তর্কশাস্ত্র ও নীতিবিদ্যা। সুন্দর করে পড়া বুঝিয়ে দিতেন এবং পরের দিন ক্লাসেই তা আদায় করে নিতেন। পড়ার ব্যাপারে কড়া হলেও মেজাজ ছিল না চড়া। মিষ্ট-মধুর কথা, শিষ্ট-সুন্দর ব্যবহার। ছাত্রদের স্নেহ দিতেন এবং প্রতিদানে পেতেন শ্রদ্ধা। কৃষ্ণনগরে ম্যাট্রিক পরীক্ষার কেন্দ্র বরকালই হয় কলেজে, প্রধানত তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন কলেজের অধ্যক্ষ, প্রশ্ন-সংরক্ষক ও প্রধান-আরক্ষকও থাকেন তিনি। অধ্যক্ষের পক্ষে একা সবদিকে সমান লক্ষ্য রাখা সম্ভব হয় না বলে আরক্ষার দায়িত্বটি একজন অধ্যাপকের ওপর ন্যস্ত করে তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে নিশ্চিন্ত দিবানিদ্রার মৌকা ছেড়ে এ পাহারাদারী সকলে পছন্দ করেন না। অধ্যাপক গুপ্ত তাদের কাজও সানন্দে নিজের কাঁধে তুলে নিতেন। অন্যের পক্ষে যেটা উৎপাত, তার পক্ষে সেটা মৌতাত। অধ্যক্ষের প্রতিভূ হয়ে প্রভুত্বের আসনে বসা, এ কি কম গৌরবের! হলোই বা তা একদিনের জন্যে! পরীক্ষা সুরু হওয়ার

ক'দিন আগে থেকেই 'সাজো সাজো' রব পড়ে যেতো তাঁর বাড়িতে। দেরাজের টানা থেকে টেনে বার করতেন ন্যাপথালীন্-গন্ধী পোষাকী বেশ-বাস ; বৎসরান্তে এই একবার তাদের কারামুক্তি ! বিশুদ্ধ তসরের চোগা-চাপকান, ধোপ পড়েনি বলে রঙ্ও চটে নি ; কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত এই যা। তা' হোক, ওস্তাগরের বাড়ি থেকে একবার ইস্ত্রি চালিয়ে নিলেই দিব্যি চলবে ; 'স্থ' জোড়াটায় কালো 'কোবরার' ছোবল পড়লো, দরবারী তাজটাও বেরেলো, নিখুঁত আয়োজন। পরীক্ষার আগের দিন অপরাহ্ণে, 'মার্কেট-প্লেসে' সোক্রাতিসের মত দাঁড়ালেন অধ্যাপক গুপ্ত 'সিং-দরজা'র মোড় আগলে। সীট্ কোন ঘরে পড়েছে দেখবার জন্যে দলে দলে চলেছে পরীক্ষার্থী ছেলেরা মোড ঘুরে কলেজ ষ্ট্রীট দিয়ে কলেজের দিকে। তিনি এক এক ব্যাচ্ ছেলে কাছে ডেকে আনছেন, আর পরীক্ষা-গৃহে তাদের ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে অশ্রান্তভাবে সদুপদেশ বমন করছেন। "আচ্ছা, খাতা পাওয়ার পর কি করবে বলো তো। হ্যাঁ, নিজের নাম, কেন্দ্রের নাম, রোল নম্বর এ সব বেশ স্পষ্ট করে লিখতে হবে। কিন্তু সাবধান, ভুলেও যেন স্কুলের নাম. লিখে বসো না, পেপার বাতিল হয়ে যেতে পারে তা'হলে। অ্যাডমিট্-কার্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে রোল নম্বর, ভুল হলে ক্ষতি হতে পারে। আর দেখো, দুটি পেন-হোলডার, খান-চারেক নিব সঙ্গে নেবে। ভেঙেচুরেও তো যেতে পারে, বলা যায় না। কি নিব ব্যবহার করো ? জি-রিলিফ, না বল্-পয়েন্ট্ ? হ্যা, হ্যাঁ যে কোনটাই চল্‌তে পারে ; যাতে লেখাটা একটু গোটা গোটা হয়, কলমটাও বেশ সরে—সেই নিবই ব্যবহার করাই ভালো। এই ছাখো, আসল কথাটাই বলতে ভুলেছি ;—খাতাখানা পেয়েই 'ওপরের দিক' থেকে চারটি আঙ্গুল মেপে নিয়ে সেটা মুড়ে ফেলবে, পাশের দিকেও অবিকল একই প্রক্রিয়ায় খাতাটা মুড়ে নেবে, তারপর ভাঁজের দাগ দিয়ে ঘেরা জায়গাটুকুতে এক আঙ্গুল অন্তর লেখার লাইন বসিয়ে যাবে। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় লেখা শেষ করে নীচের ডান দিকের

কোণে পি. টি. ও. অক্ষর ক'টি লিখতে ভুলো না ; ওর মানে—আরও আছে, পাতা ওলটান।" একখানা খাতা তাঁর হাতের কাছেই থাকতো, কথা শেষ করেই কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষভাবে প্রশিক্ষণও দেওয়া হতো। পরিচয়ের আদি পর্বেই নাম-ধাম, স্কুলের নাম, শিক্ষকদের গুণগ্রাম সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিতেন। কেশেভাঙা, বেলপুকুর, মাঝের গ্রাম প্রভৃতি পল্লী-অঞ্চলের ছাত্রদের উপদেশের সঙ্গে রাণাঘাট, শান্তিপুর, নবদ্বীপের ছেলেদের উপদেশে পার্থক্য থাকতো। দলের পর দল ছেলে ধরে অবিশ্রান্ত-ভাবে চ'লতো এই জ্ঞান-বর্ষণ। শ্রান্তির স্বেদের সঙ্গে পুলকের রোমাঞ্চ সঞ্চার হতো প্রথম দিনে। পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত হয়ে অবতীর্ণ হতেন তিনি পরীক্ষা-কেন্দ্রে নির্ধারিত সময়ের অন্তত একঘণ্টা আগে। নেপথ্যে আরক্ষকদের মধ্যে প্রশ্নপত্র ও লেখা পত্র বিতরণ, অধ্যক্ষের বকলমে নিজের নাম স্বাক্ষর প্রভৃতি একটির পর একটি করে যেতেন অনির্বচনীয় নিষ্ঠার সঙ্গে। দম-দেওয়া লাট্টুর মত ঘরে ঘরে ঘোরাঘুরি করতেন সারাক্ষণই, আসনে উপবেশনের অবকাশ পেতেন কমই। পরীক্ষা-শেষের সময় সমাসন্ন হলে পাঁচ মিনিট অন্তর ঘরে ঘরে জানিয়ে যেতেন সঠিক সময়টা—Half an hour more" থেকে সুরু করে বজ্রনির্ঘোষে ঘোষিত হতো এই সটীক 'bulletin' অর্থাৎ সময়-সংবাদ। "Fifteen minutes more, revise your answers." "Ten minutes more, get your scripts stitched, if necessary." "Five minutes more, stop writing, make your papers ready for submission"—ইত্যাকার ঘোষণা ক্রমাগত শুনতে শুনতে একবার একটি স্থানীয় মাতব্বর ছোক্‌রা দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল,—'Please don't shout sir, I feel awfully disturbed,' অধ্যাপক গুপ্ত নির্বিবাদে হজম করেছিলেন প্রতিবাদটা। তা'ব'লে উৎসাহে ভাঁটা পড়ে নি একটুও, হাঁক-ডাক ও বিভূতি-বিলাস তিনি

চিরকাল চালিয়ে গিয়েছেন বিপুল বিক্রমে। ঢালের অন্য পিঠের ছবিটা এইবার দেখুন। বিদ্যাদানের তীব্র ঈপ্সার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতো ছন্দো-বন্ধনের নিবিড় লিপ্সা। এই কাব্য-কণ্ডূতি ছিল তাঁর জন্মগত—কাজের চাপে চাপা পড়তো সময় সময়। কটকে থাকতে যেসব কবিতাহার তিনি গেঁথেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন 'কটক-কন্‌ট্রিবিউশন্'। তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলতে পারবো না। কবিতা-গুচ্ছের মধ্যে মৌলিক-কবিতার সংখ্যা ছিল নাম-মাত্র। অনুবাদ-কবিতাতেই তাঁর হাত খুলতো, আর তাতেই একহাত দেখিয়েছেনও তিনি। টেনিসন্-এর "এনক্-আর্ডেন," "ডোরার" অনুবাদ, মিলটনের "লা অ্যালেগ্রো", "ইল্‌পেন্‌সরেসোর' অনুবাদ 'কৃষ্ণনগর-কন্‌ট্রিবিউশন'-এর অন্তর্ভুক্ত। বিদেশী নামের দেশী নামকরণে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আলেক্‌জ্যাণ্ডার নামটির ধ্বন্যাত্মক অনুবাদ করেছিলেন "অলীক-সুন্দর" আর হারকিউলিসের "হরিকুলেশ"। সত্যিই সুন্দর নয় কি? ডোরাকে করেছিলেন দারা। সদ্যোরচিত অনুবাদের পাণ্ডুলিপিটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, "পড়ে দেখুন তো, অসঙ্গতি কিছু ঠেকলে আমাকে বলবেন। রেখে ঢেকে বলবেন না যেন অর্থাৎ ত্রুটি দেখলেই টু টি টিপবেন।" তা তো আর সম্ভব নয়, একটু চেপে-চুপে রেখে-ঢুকে বলতেই হয়। মন লাগিয়েই পড়ে দেখলাম লেখাটি, ভালোই হয়েছে। আপত্তি করলাম ডোরার দারা নামকরণে। বললাম, "এটা করলেন কেন? ডোরাই তো বেশ ছিল। আজকাল ঘরে ঘরেই তো ডোরা-নোরা, শেলি-নেলির দেখা পাওয়া যাচ্চে। নামটি ছোট্ট এবং মিষ্টিও বটে। তা'ছাড়া দারা নামকরণে আমার আপত্তির কারণ সম্রাট শাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল দারা আর তাঁর নাকি ছিল ইয়া এক দাড়ি। একজন লাবণ্যময়ী ললনার ঐ নাম দেওয়া ঠিক কি? "Did I not, did I not forbid you, Dora!" এই পঙ্‌ক্তিটির অনুবাদে আপনি লিখেছেন, "করি নাই করি নাই,

নিষেধ তোমারে, দারে?" দারের বদলে ডোরে বসালে আর একটু শ্রুতিমধুর হয় না কি? তাছাড়া, সংস্কৃত ব্যাকরণমতে 'দারা' শব্দের অর্থ কলত্র হলেও শব্দটা পুংলিঙ্গ ও বহুবচনান্ত। অতএব সে দিক থেকেও বিচারের প্রয়োজন আছে।" আমার কথা শুনেই চারুবাবু দারার স্থলে ডোরা বসিয়ে লাইনটা সশব্দে আউড়ে আমার প্রস্তাবটা মেনে নিলেন এবং দারা কেটে ডোরা করলেন।

অবসর নেবার কয়েকদিন আগে আমরা তাঁকে বিদায়-সংবর্ধনা জানালাম। কলেজের সামনের বাগানে টেনিস-লনের ওপর জল-যোগ-সহযোগে সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হলো। এই উপলক্ষ্যে আমি একটি গান লিখেছিলাম: স্থানীয় একজন সুকণ্ঠ গায়ককে দিয়ে সেই গানটি গাইয়ে সভার সূচনা করা হলো। অধ্যাপকদের মধ্যে কেউ কেউ তার চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশস্তিসূচক সংক্ষিপ্ত ভাষণও দিলেন। সবশেষে এলো অধ্যাপক গুপ্তের প্রতিভাষণের পালা। কবিতায় ভাষণ লিখে একেবারে ছাপিয়ে এনেছেন, এক এক খণ্ড প্রত্যেককে স্বহস্তে উপহার দিলেন। তাতে আছে সহকর্মীদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে একটি করে "এপ্মক" বা 'ডিস্টিক্': বাক-পরিমিতির পরাকাষ্ঠা—মাত্র দুটি করে লাইনে চরিত্রগুলি চিত্রের মত তুলে ধরেছেন চোখের সামনে। এই অভিনব অভিনন্দনের অনেকগুলি শ্লোকই আগে মুখস্থ ছিল আমার, সবই প্রায় ভুলে যাবার দাখিল: দু' একটি অবিস্মরণীয় লাইন আজও আমার মনের মণি-কৌটায় দুর্লভ রত্নের মত সঞ্চিত আছে। ডালা খুলে বাছাই-করা দু'টো টুকরো ডালি দিচ্ছি আপনাদের। কলেজের দ্বিতীয় (দুজনের মধ্যে) করণিক ছিলেন মাতোয়ার জান্—চল্‌তি চালে 'মটর জান'। ইনি তার ছাত্রও ছিলেন; এঁকে অভিনন্দিত করেছেন মাত্র একটি ছত্রে, "সেলাম মটর জান, যন্ত্রে সুলেখক।" টাইপিষ্ট্ শব্দের এ অভিনব ভাষান্তর আশা করেছিলেন কি? যেমন রঞ্জনা তেমনি ব্যঞ্জনা! এর তুলনা নেই। মোহনবাগানের প্রাক্তন প্রখ্যাত ফুটবল

খেলোয়াড় রূপচাঁদ দফাদার ছিলেন কলেজের ক্রীড়া-শিক্ষক। তাঁর পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখেছিলে, "বর্তুল-ক্রীড়ায় দক্ষ।" ফুটবলের এমন ভাষানুবাদ তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। পড়ানোর নেশা ছিল তাঁর রক্তের সঙ্গে মেশা; তাই হিন্দু-কল্যাণ বালিকা-বিদ্যালয়টি কলেজ পদবীতে উন্নীত হলে এর অবৈতনিক অধ্যক্ষের পদ সানন্দে গ্রহণ করলেন। বেতনভুক্ অধ্যাপকেরাও তাঁর কর্মতৎপরতা দেখে লজ্জায় অধোবদন হতেন। পুলকের প্রথম কারণ অধ্যাপনার সুযোগ-লাভ, দ্বিতীয় কারণ (এইটাই বোধ হয় প্রধান) অধ্যক্ষতার অধিকার-প্রাপ্তি। মাইনে নাই-বা পেলেন, মুন্সেফ তো বটে! জুরির সমন পেলে—রিক্সা ভাড়াটা পাবার আশাও যেখানে নেই—লোকে সেটা এড়াবার ফাঁক খোঁজে। অধ্যাপক গুপ্ত কিন্তু পা বাড়িয়ে দিয়ে ফাঁদে ধরা দিতেন। অমন যে পড়ানোর নেশা তাও যেন ছুটে যেতো। ছুটে গিয়ে ফোরম্যানের সম্মানিত আসনে আরূঢ় হতেন। তাঁর গম্ভীর বিশ্বম্ভর মূর্তি দেখলে মনে হতো এ যেন অন্য এক মানুষ। এ-যেন শিশুর রাজা-সাজা, খেলার ছলে খেয়ালের দেয়ালা। জুরির খেলায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার—স্বভাবত নিরভিমান এই মানুষটির এই সাময়িক অভিমান কোন মানে মাপা যায় জানি না।

এর পরেই বলতে হয় অধ্যাপক কনকবাবুর কথা। দেব-ভাষা ও সাহিত্যের বিদগ্ধ অধ্যাপক ছিলেন ইনি। সাধারণত সংস্কৃত অধ্যাপকরা ইংরাজি বলতে ভালবাসেন একটু; কনকবাবুও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। ইংরাজির খই ফুটতো তাঁর মুখে; দু' তিনটি শব্দের পরে পরেই বসাতেন 'rather' শব্দটি, আর বাঙলা বলতে গিয়ে বেপরোয়া বসাতেন 'যেয়ে'। ছাত্ররা এতে খুব মজা পেতো—সভা-সমিতিতে তাঁর ভাষণ শুনবার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতো। তিনিও ভাষণ দিতে 'ভীষণ' ভালবাসতেন। সভাপতির সংকেত মাত্রই খাড়া হয়ে মেল-গাড়ী চালিয়ে দিতেন। 'যেয়ে'র জয়ধ্বনিতে অনুধ্বাত হয়ে উঠতো সভা-বেশ্ম—করতালিধ্বনিতে

উৎসাহিত হয়ে দুন থেকে চৌদুনে চড়িয়ে দিতেন বক্তৃতার টেম্পো। রোধে কার সাধ্য। 'চাগানে' ও 'খেদানে'—করতালির এই দুটি প্রকারের মধ্যে প্রভেদ করতে পারতেন না, তাই ভাষণও শাসন মানতো না সহজে। বক্তৃতার ফায়ারে ফোয়ারার মুখ খুলে যেতো, বেগ সংবরণ করে কার সাধ্য! অবশেষে বাধ্য হয়ে সভাপতিকে বেল্ বাজাতে হতো। 'rather' ও 'যেয়ে'র প্রকাম-প্রয়োগে প্রীত হয়ে ছাত্রসংসদ দুটি অন্বর্থ নামকরণ করেছিল তাঁর দুজন বিশ্রুত বৈজ্ঞানিকের নামের অনুকরণে—একটি 'সার্ জে. জে.' (টম্সন্), আর একটি 'লর্ড র‍্যাদারফোর্ড'। উদ্ভাবনী শক্তির তারিফ করতে হয়। একবার কলকাতার আমদানি একটি ফেল-মারা ফক্কড় ছোকরা তাঁর ক্লাসে কি একটা 'রিপনী' (অর্থাৎ রিপন্ কলেজ-সুলভ) ইয়ারকি করায় তিনি 'shut up rather' বলে এমন একটি হাঁকাড় ছেড়েছিলেন যে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল বাছাধনের। আর একবারের আর একটা ঘটনাও বেশ উপভোগ্য। স্থির হয়েছিল, স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছেলেদের নিয়ে একটা পিক্‌নিকের আয়োজন করা হবে শহরের সীমান্তবর্তী 'কোম্পানীর বাগানে' শিক্ষক-অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে। ছাত্রে-ছাত্রে সৌভ্রাত্র্য-বন্ধন নাকি দৃঢ়তর হবে এতে করে। যাহোক, প্রাথমিক ব্যবস্থাদি গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে অধ্যক্ষের কক্ষে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা এবং অধ্যাপকরা বসে আছেন গোল-টেবিলের চারপাশে অধ্যক্ষকে ঘিরে। সরকারী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক যতীনবাবু এবং কনকবাবু সামনাসামনি বসে আছেন টেবিলের দু'ধারে। কথা উঠলো, টাকা আসবে কোথা থেকে। নানা জনের নানা মত। ফাণ্ড্-গঠনকে উপলক্ষ্য করে বেধে গেলো কনকবাবু আর যতীনবাবুর বিতণ্ডা। আবেগের বেগে মাতৃভাষা ছেড়ে রাজভাষা ধরলেন দু'জনাই—একটু জোর পাওয়া যায় ওতে। কনকবাবুর 'rather'-এর সঙ্গে টক্কর দিয়ে চ'ললো যতীনবাবুর—

"excuse me, sir." "কে কারে জিনিতে নারে উভয়ে সোসর।" কনকবাবুর "Who is going rather to defray the expenses in this connection rather." উত্তরে যতীনবাবু সুরু করলেন, 'Excuse me, sir, the boys may be taken to the Company's Garden, excuse me sir, and shown round the campus, excuse me sir, just for a pleasure-trip." কেম্ব্রিজ-ফেরত মিস্টার তালুকদার এই তরজার লড়াই শুনে তো হেসেই কুটোকুটি! উপস্থিত অন্যান্য সভ্যেরাও আনন্দ নিতান্ত কম পাননি। অধ্যক্ষ সেন ব্যাপারটা জানতেন বলে পারতপক্ষে তাঁকে বক্তৃতা-মঞ্চে উঠতে দিতেন না; তবুও অধ্যাপকদের মধ্যেই কেউ কেউ নষ্টামি করে তাঁর কানে কানে বলে আসতো, 'সেন সাহেব আপনাকে কিছু বলতে বলেছেন।' আর যাবে কোথায়? বিদ্যুতের বোতাম যেন কে টিপে দিল। সুরু হয়ে গেলো 'যেয়ে'র বুকনি-সমাকীর্ণ বক্তৃতার ভূর্ণধার : হাস্য চাপতে গিয়ে কোঁচার আধখানাই ঢুকে গেলো অধ্যাপক কাহালীর আস্য-বিবরে। ছাত্রদের ঘনঘন হাসির রোলে অধ্যক্ষ সেনের মুখ কালো হয়ে উঠলো। সে খবর কিন্তু কনকবাবুর কানে পৌঁছলো না; অধ্যক্ষের মুখের বিরক্তিব্যঞ্জক কালিমাও তাঁর চোখে পড়লো না। আশ্চর্য মানুষ! একদিন ক্লাসে কনকবাবু উৎসাহভরে পাঠন সুরু করেছেন, হঠাৎ তার নজরে পড়লো পেছনের বেঞ্চির এক কোণে কয়েকটি ছেলে ফিস ফিস করে দিব্যি গল্প জমিয়েছে। পড়া-শোনার কোন গরজই যেন নেই তাদের। এই নিশ্চিন্ত, নির্লিপ্ত ভাব দেখে কনকবাবুর পিত্তি জ্বলে গেলো। তিনি মক্কেলদের আক্কেল দেবার জন্যে ঈষৎ শ্লেষের সুরে বলে উঠলেন,— "বাবারা তোমরা যেয়ে, এখন তো দিব্যি গল্পগাছা করছো যেয়ে, শেষটা যে নয়নজলে ভাসতে হবে যেয়ে সে কথাটি ভুলো না যেয়ে।" বুকনির চুমকি বসানো এই বাক্য-হার উপহার পেয়ে

ছেলের দল তো মহাখুসী। অতি কষ্টে হাসি চেপে তারা সে ভর্ৎসনা মনে মনে উপভোগ করলো। এইতো তারা চায়। তাতিয়ে না দিলে কি আর গালা গলে, না গলা দিয়ে গালের গোলা ছোটে।

একবার শিক্ষাধিকারের অধিকর্তা র‍্যাম্‌স বোথাম্‌ এলেন কলেজ পরিদর্শনে। তাঁর সম্মানে এক চা-চক্রের আয়োজন করা হলো অধ্যক্ষের কক্ষে। সাহেব যখন হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ, কনকবাবু ছিলেন তাঁর সহযোগী। তাই আগ বাড়িয়ে সাহেবের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলেন তিনি। উৎকৃষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বলে বেশ একটু অভিমান ছিল কনকবাবুর মনে। সুরুতেই টান দিলেন সেই সূত্র ধরে। গলা বাড়িয়ে সাহেবের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কতকটা একান্তেই ব'ললেন, "হুগলী কলেজের মাঠে আমাদের সেই ক্রিকেট খেলার কথা তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই?" এই মৃদু গুঞ্জনের উত্তরে গুরু-গর্জনে সাহেব বলে উঠলেন, "Oh yes, Kanakbabu, I distinctly remember it. Your play was more vigorous than scientific." উচ্চহাসি দিয়ে সাহেব শেষ করলেন কথাটা। সে হাসির রেশ ছড়িয়ে গেলো সকলের মধ্যে। জোঁকের মুখে নুন পড়লো, মুখ বন্ধেই মুখ বন্ধ হ'লো কনকবাবুর। আসলে ছিলেন তিনি 'blind-hitter' বলতে যা বোঝায় তাই। অফ্‌-ব্রেক, লেগ-ব্রেক, গুগ্‌লী কিছুই মানতেন না—হুগলী কলেজের এই ক্রিকেট-বীর বেপরোয়া চালিয়ে যেতেন ব্যাট্‌। ব্যাট বলে "সম্পর্ক" হলে আর রক্ষে নেই—নির্ঘাত বাউণ্ডারি, ফস্‌কালেই মুশকিল, ছেত্‌রে যেতো স্টাম্প্‌। একবার একটা খেলায় তাড়া হাঁকড়াতে গিয়ে এমন সপাটে ব্যাট [illegible] বসেছিলেন মাটির ওপর, যে সেই প্রচণ্ড সংঘাতে হ্যাণ্ডেলটা তাঁর হাতেই রয়ে গিয়েছিল, ব্লেড্‌টা ছিট্‌কে ছুটে গিয়েছিল বিশ গজ দূরে মিড্‌-অনের দিকে। বেচারা ফিল্ডস্‌ম্যান্‌ চকিতে ঘাড় কাত করে কান এবং প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

দৃঢ়-পিনদ্ধ, শক্ত-পোক্ত শরীর ছিল তাঁর। শেষ বয়সে তিনি পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী ছিলেন বছর তিনেরও ওপর। এই মানুষেরও যে জীবন-লীলার অবসান হতে পারে এমন শোচনীয়ভাবে, এর চেয়ে মর্মান্তিক কিছু কল্পনাও করা যায় না।

অধ্যাপক কনকবাবু রঙ্গপ্রিয় ও রসরসিকও ছিলেন। এক-দিনকার একটি ছোট্ট ঘটনার কথা আপনাদের শোনাই। গোয়াড়ি শহরে প্রাতর্ভ্রমণের প্রধান পথই হলো 'গেট্‌রোড্'—যেটা কদমতলার মোড় থেকে জলাঙ্গীর ধার দিয়ে বরাবর রেলওয়ে-সেতু পর্যন্ত চ'লে গিয়েছে। একদিন ভ্রমণান্তে বাড়ি ফিরবার পথে দূর থেকে চোখে পড়লো—একক কনকবাবু নীচের মাঠে নেমে উবু হয়ে বসে একমনে কি যেন উৎপাটন করছেন। তাঁর কাছাকাছি পৌঁছে আমরা তাঁর 'ব্যুত্থানে'র অপেক্ষায় পথের ওপরে দাঁড়িয়ে রইলাম। কলালাপের শব্দে ধ্যানভঙ্গ হলো তাঁর। পিছন ফিরে তাকিয়ে আমাদের দেখেই তিনি তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গুটিয়ে গাত্রোৎপাটন করলেন এবং রাস্তার ওপর উঠে এসে আমাদের সামনা-সামনি দাঁড়ালেন। মুখে স্মিত হাস্য, দক্ষিণহস্তে আন্দোলিত সদ্য-সমাহৃত কুশের একটি গুচ্ছ—সাক্ষাৎ কুশধ্বজ! তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, "আজ একক যে!" ত্বরিত উত্তর এলো, "এ হেন্ (a hen) কোথায় পাবো, বলুন ?"—বলে রাখি বয়সে তিনি আমার চেয়ে অন্তত বছর কুড়ি বড়। উত্তরটা শুনে আমি থ' হয়ে গেলাম, রা স'রলো না আর আমার মুখে। আমাদের মধ্যে থেকে কে একজন প্রশ্ন করলেন এর পরে, "কুশ কি হবে, সার্ ?" সকলকে বিস্মিত করে সস্মিত উত্তর এলো, "পার্বণ-শ্রাদ্ধে ওগুলো লাগবে।" যজ্ঞের জন্য ঋষিশিষ্যদের সমিধ-সংগ্রহের কথা কেতাবে পড়েছি। কিন্তু এ যুগে পার্বণ-শ্রাদ্ধের জন্য কুশ-সংগ্রহের এই প্রক্রিয়াটা সত্যিই অভিনব! কুশবিদ্ধ, ক্রুদ্ধ কৌটিল্য কুশবংশ-ধ্বংসের মানসে কুশোৎপাটনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন—ডি. এল্. রায়ের চন্দ্রগুপ্ত-নাটকে

সেটা স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। কিন্তু কুশোৎপাটনের এই বিচিত্র মনোহর কাহিনীটি আজও অলিখিত, তাই লিখে রাখলাম এখানে। এই দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রের দিনে পুরোহিতের দক্ষিণার দায়টা যাঁরা এড়াতে চান, তাঁরা এর থেকে প্রেরণা পাবেন সন্দেহ নেই।

এর পর সংস্কৃতের অধ্যাপক হয়ে যিনি এলেন তিনিও সোনা, তবে কনক নয়, হেম, উপাধি আচার্য এবং শাস্ত্রী। অবশ্য আচার্যানী শ্রীমতী শাস্ত্রী ছিলেন কিনা তা আমি জানি না। শাস্ত্রী পণ্ডিত-কুলোদ্ভব এবং স্বয়ং পণ্ডিত। তাছাড়া ভক্তিশাস্ত্রে নিষ্ণাত পরম ভাগবত। একদিকে জ্ঞানের আম্বব, অন্যদিকে রসের সাগর। জ্ঞানের পানে শাণিত, রসের রসানে মার্জিত ছিল তার বুদ্ধি। তার চরিত্রের একটি কম্র অথচ দীপ্র মাধুর্য তাকে করেছিল ছাত্র-অধ্যাপক সকলেরই প্রিয়। সুস্মিত, সুভাষিত ছিল তাঁর সংলাপ। তার রঙ্গটা বেশি করে জমেছিল আমারই সঙ্গে; কথায় কথায় বলতেন, "উফ্! আপনি কতো-ও জানেন!" কলেজেও আসতেন কৃষ্ণনামাঙ্কিত, মলয়জ-লিপ্ত ললাটে। রসতত্ত্বের অন্দরমহলের গুহ্য খবরও কিছু কিছু পাওয়া যেতো তাঁর কাছে। আর একজনও অবশ্য ছিলেন সহকর্মীদের মধ্যে যিনি ভেখে টেক্কা দিয়েছিলেন এঁকেও। তিলক-শৃঙ্গারের ওপর এর হাতে থাকতো আঙুলে ধরা জপমালাসহ একটি কুঁড়োজালি। ক্লাসে যাবার সময় গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন সেটি। ইনি ছিলেন অর্থনীতির অধ্যাপক—কলেজে ভজন ও অধ্যাপন পাল্টাপাল্টি চলতো। ঝুনো আর্থ-নীতিক অর্থাৎ স্বার্থ-নীতিক হয়েও ইনি ছিলেন পরম প্রেমিক, বৈষ্ণব-প্রীতির মূর্ত প্রতীক। আপনারা হয়তো ভাবছেন এমন দুটি ভাবের সমন্বয় করেছিলেন তিনি কি করে? স্রেফ স্বজ্ঞার জোরে মশাই। অত মালা জপেও যদি ছালা না মেলে, তার চেয়ে জ্বালা আর কি আছে? সবই মিলিয়ে দিতেন সেই নন্দলালা! দেখুন একবার জপের জোরটা। ১৯৪০-৪১ সাল: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জুজুর ভয়ে বিক্রান্ত

বৃটিশ-সিংহ শিরায় শিরায় শংকিত, দানের হাতও স্বাভাবিক কারণেই সংকুচিত। ভোজ্য ও দাহ্য দুয়েরই দারুণ দুর্ভিক্ষ। সাত দুয়োরে ঘুরে অনেক মাথা খুঁড়ে জোগাড় করতে হতো থোড়া থোড়া রসদ। হালটা কতকটা হালের মতই। কিন্তু চাল-চিনি নিয়ে এমন ছিনি-মিনি খেলা তখন ছিল না। এক কথায় চোরাকারবারীদের পুকুর-চুরি এবং গলায় ছুরির রাস্তা এমন হাট করে খোলা ছিল না তখন এখনকার মত। বৈষ্ণব-অধ্যাপক হন্যে হয়ে ধর্না দিতেন পাটে ও পীঠে; বিগ্রহ এমন কি নোড়ানুড়িও বাদ যেতো না; কূল দেখলেই ফুল ফেলতেন, কে জানে কোন্‌টি জাগ্রত! কুঁড়োজালির সঙ্গে সর্বদা থাকতো একটা র‍্যাশনের থলি। র‍্যাশন হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল ব্যসনের মত। এইভাবে মাধুকরী করে যা সংগ্রহ করতেন. এই বৈষ্ণব-মধুকর, তা' অতি-বড় বিষয়ীর উদ্যমকেও বহু যোজন পেছনে ফেলে যেতো। উক্তিগুলো কিছু তেরছা হচ্ছে বুঝছি, কিন্তু আলাপের আসরে সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম তাঁর এই নিষ্ঠার জন্যে। প্রতিষ্ঠা যে তাঁর কাছে 'শূকরী-বিষ্ঠার' মত ছিল না, এইটাই শুধু দেখাতে চেয়েছি। যাক, এবার আবার শাস্ত্রীর প্রসঙ্গে ফেরা যাক্। বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে রসেরও কারবারি ছিলেন তিনি। কাজেই কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকটির প্রতি অনুরাগ ছিল অসামান্য। পড়াতে পড়াতে রসের ফোয়ারা খুলে দিতেন ক্লাসে; হয় তো গান্ধর্বের মধ্যে পরকীয়ার গন্ধ পেয়ে থাকবেন! কেমন পড়ালেন সোৎসাহে শোনাতেন বিশ্রাম-ঘরে ফিরে। শাস্ত্রী শাস্ত্রী ছিলেন না, ব্যাকরণের সঙীন উঁচিয়ে রসের দেউড়ি আগলে রাখা তিনি পছন্দ করতেন না—বাছাই করা দু'একটা টোটকা-টিপ্পনীর 'টিপ্' দিয়েই দায় সারতেন।

শাস্ত্রীজি ফার্সীও জানতেন অল্প-স্বল্প। মাঝে মাঝে বৈঠকে সাদি-হাফিজের বয়েত্ আবৃত্তি করে তাক্ লাগিয়ে দিতেন আমাদের।

চোস্ত্ ছিল উচ্চারণটা, শুনে বোঝা যেতো শিখেছিলেন কোন ভাল মৌলভীর কাছে। জবান্ সাফ্, বাংলার মৌলভীদের মত আড়ষ্ট নয়। সংস্কৃতের সংগে ফার্সীর এই মিলনে আশ্চয হবার কিছু নেই। রসের দিক থেকে হাফিজ-ওমর বৈষ্ণব-মহাজনদেরই সগোত্র। খোস্ মেজাজে মৌজ করে শোনাতেন কবে কোন্ এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ফার্সী বয়েত্ বলে পেয়েছিলেন প্রথম পুরস্কার—সেই কিস্সা। প্রচুর আনন্দ পাওয়া যেতো তাঁর কথা শুনে। তাঁর উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলতাম, 'উফ্, এতো-ও জানেন! এযে দেখছি ধুকড়ির ভেতর খাসা চাল!" রসটা 'রেলিশ্' করতেন রসিক চূড়ামণি। মুসলমানী আদব-কায়দার প্রসঙ্গে একটা ভারী মজার গল্প বলেছিলেন একবার। ভাবের সবটা কেবল বাচিকে প্রকাশ করা যায় না—আঙ্গিকের অংশটা পূরণ করে নেবার বরাত দিলাম পাঠকের 'পরেই। পরস্পর অপরিচিত দুই ভদ্রলোকের মোলাকাত্ হতেই সুরু হলো পরিচয় নেবার পালা। একজন জিজ্ঞেস করলেন—"জনাব কা নাম ক্যা হৈ!" জবাবে জনাব বললেন, 'খাক্ এ দর খাক্—বাসী চুল্লীকা খাক্,—বান্দাকা নাম মহম্মদ্ ইস্হাক্।" পাল্টা প্রশ্ন করলেন ইনি, "জনাব কা নাম?" উত্তর এলে, "গু-এ, দর-গু,—কালী কুত্তিকা গু (থ্যাক্ থু), বান্দা কা নাম মহম্মদ্ ফতু।" বুঝুন ঠেলা; তরজা গানের চাপান-উতোরও এর কাছে হার মানে। নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন শাস্ত্রীজি। শেষ বয়সে শ্রীধাম নবদ্বীপেই বাস করেছিলেন স্বগৃহে। পুণ্যবান্ এই বৈষ্ণব-সাধকের মর-লীলার অবসান হয়েছিলো এই পুণ্য-তীর্থে গঙ্গা-জলাঙ্গীর সঙ্গমে।

১৯৩০ সালের কোন সময়। সংস্কৃতের উপাধ্যাপক হয়ে এলেন চণ্ডীবাবু। সংস্কৃতের পালি-গ্রুপে এম্. এ., প্রথম শ্রেণীর প্রথম, তার ওপর পি.আর.এস্., সাংখ্য-বেদান্ত, পালি-প্রাকৃত, এপিগ্র্যাফি, আই-কনোগ্রাফি ইত্যাদি করে এম্. এ.-তে সংস্কৃতের শাখা-সংখ্যা এ. বি. করে বোধ হয় এম্., এন্. পর্যন্ত পৌঁছেছে। একমাত্র এ. অর্থাৎ

সাহিত্যশাখা ছাড়া অন্যান্য শাখায় ছাত্র-সংখ্যা নগণ্য, কোনটায় আছে, কোনটা বা একেবারে ফাঁকা। নেহাতই শুধু খদ্দেরের আশায় দোকান খুলে বসে থাকা। কাজেই অধ্যাপকের সংখ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্র-সংখ্যার চেয়ে বেশী। হগ্-মারকেটের স্টলের মত ডেকে-আনা খদ্দের (ছাত্র) আছে দু'একজন করে কোন কোন গ্রুপে ; কিন্তু তারা প্রায়ই টেঁকে না শেষ পর্যন্ত ; রুজি-রোজগারের রাস্তা পেলেই স'রে পড়ে। চেয়ারে বসে বসে ঢুলবার এবং লেখাপড়া ভুলবার এমন মোকা কমই মেলে। প্রতি গ্রুপেই এক একজন প্রথম শ্রেণীর প্রথম ; অতএব গোল্ড্ মেডালিস্ট্। স্বর্ণ-পদকের খরচ মেটাতে মেটাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে টান ধরলো। কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন, অতঃপর সব গ্রুপের পরীক্ষোত্তীর্ণদের মধ্যে যে সর্বাধিক মার্ক্ পাবে একমাত্র সেই প্রথম বলে স্বীকৃত হবে এবং সোনার চাকী ঝুলবে তারই গলায়। এইভাবে ব্যয়ভার লাঘব হলো, একপাল প্রথমদের মধ্যে ঠেলাঠেলি ও তালঠোকাঠুকি কমলো। সুখের বিষয়, চণ্ডীচরণবাবু এই নতুন আইনের আওতায় পড়েন নি। কাজেই সোনার পদক তাঁর কণ্ঠে দুলেছিল এবং সরকারী কলেজে চাকরীও মিলেছিল। অবশ্য পদ-প্রাপ্তির ব্যাপারে ভাগ্যদেবীর প্রসন্নতাও ছিল, নইলে কি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনকার একজন প্রখ্যাত আচার্যকে—ইনিও ছিলেন একজন প্রার্থী—ল্যাং মেরে ড্যাং ড্যাং করে ডাঙায় উঠতে পারেন? গভর্নিং বডির সামনে সাক্ষাৎকারে সদস্যদের প্রশ্নের উত্তরে প্রায় নিরুত্তর ছিলেন বলেই নাকি চাকরির রাজকন্যা তাঁর কণ্ঠে বরমাল্য পরিয়েছিলেন। কলির কালিদাস আর কি! শান্তিনিকেতনের একজন বিশ্রুত পালি-অধ্যাপকের প্যালা ছিল পিছনে—তারই ঠেলায় সহৃদয় অধ্যক্ষ তাঁর না-পারাকেই "পরম পারা" বলে ব্যাখ্যা করে তাঁরই হাতে সঁপে দিলেন চাকরির রাজকন্যা। পরশুরামের সেই গর্ভিত উক্তিটি মনে পড়ে, "ধ্যেৎ, 'না' মানেই 'হ্যাঁ' "।

চণ্ডীবাবু কাজে যোগ দিয়েই প্রচণ্ড উৎসাহে অধ্যাপনায় লেগে গেলেন। তাঁর নিজস্ব একটি গ্রন্থাগার ছিল, সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না—বেদ-বেদান্ত, ন্যায়-দর্শন স্মৃতি-সংহিতা, ব্যাকরণ ও কোষগ্রন্থের সুনির্বাচিত সংগ্রহ। পালি-প্রাকৃতের পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থও অনেক ছিল। কোন বিত্তশালী বিদ্যোৎসাহী জমিদারের অর্থানুকূল্যে গড়ে উঠেছিল এই গ্রন্থশালা—জনশ্রুতি এই রকম। চণ্ডীবাবু ধনীর সন্তান ছিলেন না, আমরা অবাক হয়ে ভাবতাম এই অঘটন ঘটলো কি করে। চণ্ডীবাবু এর জন্ম-রহস্যটা ভাঙ্গেননি কোন দিন।

নিকষ-কালো নধর-চিকণ-দেহ, নীলাভ ওষ্ঠাধর, তার আড়ালে সার-বাঁধা দুধ-সাদা দাঁত ঝিকিয়ে ওঠে ঠোঁট একটু নাড়লেই। দাঁড়ানো অবস্থায় ভঙ্গিটা জলভরা-কলসী-কাঁখে পল্লী-ললনার মত। বাসা থেকে কলেজ এবং কলেজ থেকে বাসা দু' দফাতেই বগল ফাঁক যেতো না, ঠাসা থাকতো বই-এ। চলার সময় দু'পায়ের অঙ্গুষ্ঠ দুটি প্রায় গায়ে গায়ে লেগে যেতো, পায়ের পাতা ফেলার কায়দায়। বই বইতে আলিস্যি ছিল না ভদ্রলোকের; নির্বিকারচিত্তে একটি কুলির কাজ করে যেতেন নিত্য দুটি বেলা। দেখে দেখে ছেলেরা তাঁর একটি অভিনব নামকরণ করেছিল—'বগলানন্দ ভারতী'। অর্থ বোধ হয় এই যে, ভারতীকে মগজে না রেখে বগলে রাখতে আনন্দ যাঁর। অধ্যাপক সুধেন্দু চৌধুরী নামকরণটি শুনে খুব খুশী হয়ে বলতেন 'ব্যধিকরণ বহুব্রীহি'। অনেকে আবার ওটাকে বিদ্যার তাপ-মাপার থার্মোমিটার বলে মনে করতো। আমাদের টিপ্পনী করবার কিছুই নেই—'ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ।' তাছাড়া তিনি ফি-হপ্তায় একবার করে কলকাতায় যেতেন এবং সেখানে এক বন্ধুর একখানা অল্-সেক্সান মান্থ্লি যোগাড় করে পাটে পীঠে ফুল ফেলে আসতেন ট্রামে করে। তগ্দীরের জোরে চাকরিটা হাতিয়ে তদবিরের ওপরই খুঁটি গেড়েছিলেন; এ সাধনায় তিনি যে সিদ্ধি-

লাভও করেছিলেন, তা' বিতর্কের অবকাশ না রেখেই বলা যায়। তদ্‌বির-বীরদের মধ্যে নিঃসংশয়ে তাঁর আসন একেবারে প্রথম পংক্তিতে। পোষাক-আশাক ভদ্রস্থ না হলেও ব্যবহার শিষ্ট ও ভদ্র। একটু বেশীমাত্রায় হিসেবী ও সুযোগ-সন্ধানী, এই যা। ভবিষ্যতের সংস্থানের জন্যে পেট মেরে পয়সা বাঁচাতেন। বেতন দু'শোর ঘরে না পৌঁছতেই হাজার ত্রিশ-চল্লিশের জীবন-বীমা করে ফেলেছিলেন; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে জিনিস-পত্র দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হওয়ায় 'দুটো চূড়া ভাজা' খাওয়াও বন্ধ হলো বলে তার পরিতাপের অন্ত ছিল না। ব্যথিত কণ্ঠের সেই বিলাপ যেন আমাব কানে আজও বাজছে! প্রায় প্রত্যহই তাকে উত্যক্ত করবার জন্যে ছেলেরা বোর্ডে এটা সেটা খড়ি দিয়ে বড় বড় হরফে লিখে রাখতো। তিনি দেখেও দেখতেন না অর্থাৎ গায়ে মাখতেন না। একদিন কি খেয়াল হলো, হয়তো ছেলেদের জব্দ ও স্তব্ধ করবার মতলবেই ইংরাজি থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ করতে দিলেন। তার মধ্যে ছিল গোনা তিনটি শব্দের একটি বাক্য—"Do or die."। অনুবাদের ভার চাপানোর পরেও ছেলেরা নির্বিবাদে পরস্পর গল্প গুজব করছে দেখে হঠাৎ একটি ছেলেকে বলে বসলেন, "বলো তো 'Do or die.'—এই বাক্যটার সংস্কৃত কী হবে?" ছেলেটি দাঁড়িয়ে উঠেও মুখ খুলতে ইতস্তত ক'রছে দেখে লজ্জা দেবার জন্যে বললেন, "স্কুলের নীচের ক্লাসের ছেলেরাও যে এটা পারে।" ছেলেটি তখন উল্টে বললো, "সার, ও আমার কর্ম নয়, আপনিই দয়া করে বলে দিন।" অগত্যা চণ্ডীবাবুকে attempt নিতেই হলো। তিনি বার তিন চার 'কুরু বা' 'কুরু বা' করতে করতে মৃ-ধাতুর লোটের মধ্যম পুরুষের একবচনের রূপটা বা'র করবার জন্যে মনে মনে আর্যা আওড়াতে লাগলেন। গলদ্‌ঘর্ম অবস্থা, ওদিকে একটি ডেঁপো-ছেলে ভাজতে সুরু করেছে শুভংকরীর আর্যা—"কুরুবা কুরুবা কুরুবা লিজ্ঞে, কাঠায় কুরুবা কাঠায় লিজ্ঞে।" এই জমাট গুমোট কাটিয়ে আবার

হাসির হাওয়া ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে আর একটি ছেলে কোণের দিক থেকে বলে উঠলো, "আপনি ঘাবড়াবেন না সার, আমি বলে দিচ্ছি, 'কুরু বা মুরু।' দেবভাষার জবাই হয়তো হলো, তবু স্বীকার করতেই হবে 'শুনিতে কি মিষ্ট আহা!' রসধ্বনিটুকু যেন 'কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মরমে পশে'! কথাটা বলতে বলতে পিতৃদেবের মুখে শোনা পাটনা কলেজের ছোটুরাম পণ্ডিতের কীর্তির কথা মনে পড়ে গেলো। ভট্টিকাব্য পড়াচ্ছেন, গোড়ার শ্লোকগুলো সব লুঙন্ত-ক্রিয়া পদে ভরা—সেই সম্বন্ধে আলোচনা চলছে। একটি ছেলে জিজ্ঞেস করে বসলো, "পদ্-ধাতুর লুঙের প্রথম পুরুষ একবচনের পদটা কি, পণ্ডিতমশায়?" ছোটুরাম সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলেন, "কেন? অপাৎসীৎ!" ছেলেটি বললো আমার বইতে তো পেলাম 'অপাদি'। ছোটুরাম বুঝলেন এ বড় কঠিন ঠাঁই। কিন্তু ধৈর্য হারালেন না, স্মিতহাস্যের সঙ্গে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীযোগে হংসাস্য নামধেয় একটি অপরূপ করমুদ্রা রচনা করে নয়নলোভন ভঙ্গিতে এবং আদ অমায়িক কণ্ঠে বলে উঠলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই "ভাগ্‌বান্ পাণিনিমে একটি সূত্‌রা আসে যাহার দ্বারা 'অপাদি'ও হোয় 'অপাৎসীৎ'ও হোয়।" পণ্ডিতজীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের নিদর্শনে মূক হয়ে গেলো ছেলেটির মুখ। বাস্তবিক, সব প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিতে হলে তো অধ্যাপকদের প্রাণ বাঁচে না! যে যেটুকু জানে, জানে না তার চেয়ে অনেক বেশী, এতো নিভাজ নির্ভেজাল সত্য। একজন বাংলার অহিন্দু অধ্যাপকও একবার মহাফাপরে পড়েছিলেন একটা শব্দের অর্থ নিয়ে। রীডিং প'ড়ে পাঠ্য-বিষয়ের ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন—প্রবাহের মুখে এসে পড়লো একটি শব্দের চ্যাঙড়। 'ধূর্জটি' শব্দটি তিনি পেয়েছেন অনেক স্থানে, কিন্তু অর্থটা যাচাই করে দেখেন নি কখনও। আজও সামনের বাধাটাকে পাশ কাটিয়ে দিব্যি বয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু নিজের ফাঁদেই নিজে জড়িয়ে পড়লেন, দুম্ করে একটি ছেলেকে

জিজ্ঞেস করে বসলেন শব্দটির মানে। সে ছেলেটি বলতে না পারায়, পর পর ছেলেদের 'you, you,' করে জিজ্ঞেস করে যেতে লাগলেন। পাঁচ-সাত জন বলতে না পারার পর একটি ছেলে উত্তর করলো, 'শব্দটার মানে তো শিব।' অধ্যাপকও আঁচ করেছিলেন এই রকমই একটা কিছু। ছেলেটির প্রকাশ্য সমর্থনে উদ্দীপিত হয়ে বলে চললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, শিব, শিব, মহাদেব, নটরাজ যিনি তিনবার নৃত্য করেছিলেন।" একটি শান্ত-শিষ্ট জলপানি-পাওয়া ছেলে এই সময় বলে উঠলো, "না সার, তিনবার নয়—চার বার। তিনবার তো সার হয়ে গিয়েছে সেই পুরাণের কালে, আর হালে আপনার এই হাল দেখে আর একবার"……'তার মানে' ?—আহত অধ্যাপকের কণ্ঠে বিস্মিত প্রশ্ন ! কবিগুরুর আশিস-ধন্য লোক-সঙ্গীতের সংগ্রাহক এই অধ্যাপক অতঃপর তাঁর ক্ষুব্ধ অন্তরের বেদনা নিবেদন করেন অধ্যক্ষের কাছে। একটা সোরগোল পড়ে যায় সারা কলেজে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সত্যিই তো, হিন্দু দেব-তন্ত্রের তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম মনে রাখতে গেলে অহিন্দু অধ্যাপকদের তো অধ্যাপনাই ছাড়তে হয়।

আর একজন অধ্যাপকের কথাও বলে নিই এই টানে। ইনিও বাঙ্‌লার। তাঁর নিজের মতে তাঁর অধ্যাপনা না কি অতীব উপাদেয়। ছেলেরা বলতো 'হাই-ক্লাস্‌'। তবু যে ছেলেরা গোলমাল করতো তাঁর ক্লাসে, সে কেবল তাঁর কৃতিত্বে ঈর্ষিত জনৈক সহাধ্যাপকের প্ররোচনার ফলে। এ নিয়ে দলীয় বন্ধুদের গুপ্তচক্রে চক্রান্তও চলতে লাগলো সন্দেহভাজন অধ্যাপকটির বিরুদ্ধে। কিন্তু আর একটি গুরুতর ঘটনার ওপর লক্ষ্যটা স'রে যাওয়ায় ঘোঁটটা তেমন ঘোরালো হয়ে উঠতে পারলো না। সেই কেন্দ্রীভূত ঘটনাটির শ্রুতিরম্য কাহিনীই এবার শোনাবো। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' ছিল তখন বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্য। অধ্যাপকটি রবীন্দ্র-কাব্যের একজন প্রবুদ্ধ ব্যাখ্যাতা—অন্তত তাঁর নিজের ধারণা তাই। কাজেই চিত্র-কাব্যের ভূমিকা হিসাবে আরম্ভ করলেন কবি-মানসের ক্রম-

বিকাশের ইতিহাস। সন্ধ্যা-সঙ্গীত দিয়ে সুরু করে প্রভাত-সঙ্গীত, ছবি ও গানের রাজ্য ছাড়িয়ে 'কড়ি-কোমলে'র দেশে এসে কি খেয়াল হলো, 'কড়ি ও কোমল' নামকরণের কারণটা বিশ্লেষণ করতে গেলেন। ডেকে আনলেন নিজের সর্বনাশ নিজেই। বিদ্যা জাহির করতে গিয়ে ব'নে গেলেন "জাহিল" ; অবস্থাও হয়ে উঠল কাহিল। ব্যাখ্যাটা যে অপূর্বশ্রুত ও অভিনব তাতে সন্দেহ নেই। অভিনবতা, আধুনিকতার অঙ্গ বটে, কিন্তু সেটা উদ্‌ভট কিংবা উৎকটভাবে প্রকট হলে ডেকে আনে সংকট। হলোও তাই। অধ্যাপক তখন কোন দিকে লক্ষ্য না রেখে আবেগের বেগে জ্বালাময়ী ভাষায় বলে চলেছেন, "কড়ি জিনিসটা কঠিন বটে, কিন্তু বাজাতে জানলে সেই কড়া কড়িও কোমল অর্থাৎ মধুর ধ্বনি তুলতে পারে।" বলেই মুঠো হাত মিঠে করে নেড়ে সেই অশ্রুত ধ্বনি-মাধুর্যের একটি ইঙ্গিতময়ী আঙ্গী-ব্যঞ্জনা তুলে ধ'রলেন ছেলেদের চোখের সামনে। পরে আরও এগিয়ে গিয়ে বললেন, "এই কাব্যের প্রতিপাদ্যও তো তাই। এখানে লঘু-লীলায় অবলীলায় ভেসে চলেছে ভাবের গুরুভার। তুলনা নেই এর। বাদকের নিপুণ হাতের গুণেই কঠোরের মধ্যে এই কোমলের সঞ্চার সম্ভব হয়েছে।" অধ্যাপকের সেদিন যেন ভূতাবেশ হয়েছিল। তিনি এর পরে আরম্ভ করলেন ছন্দোবিশ্লেষণ। তাড়া করে ধরলেন 'মানসী'র 'বধূ' কবিতাটিকে। ব্রীড়াবনম্র পল্লীবধূ তাড়া খেয়েও সাড়া দিল না, কিন্তু সাড়া পড়ে গেল সারা ক্লাসে। একটি ছেলে একটু ওপরের থাকের,—বসে খোলা দরজার পাশের একখানা বেঞ্চের এক প্রান্তে, চেয়ে থাকে সব ক্লাসে সব সময়ই আম্র-পনস-দেবদারুদ্রুম-শোভিত প্রকৃতি-চিত্রের দিকে,—যেন পড়া-শোনার কোন গরজই নেই তার ; ঠাণ্ডা, কম-কথা-বলা ছেলে। ছেলেরা সেই 'হাই ক্লাস' পড়া শুনতে শুনতে ঘন ঘন হাই তুলছে। হঠাৎ সেই একপেশে, বারদিশে ছেলেটি দাঁড়িয়ে ঝংকার দিয়ে বলে উঠলো, "Sir, please stop, I can stand this nonsense no longer." মুখ-বোঁজা ছেলেটি

মুখ-খোলায় মূক হয়ে গেলো তরুণ অধ্যাপকের মুখর মুখ। নিজের বক্তব্যগুলো যে শ্রোতব্য, সেটা প্রমাণ করবার জন্যে কিছু বলতে যেতেই আলগা বল্‌গায় পড়লো এক হ্যাঁচকা টান। সামনের বেঞ্চের একটি ভাল ছেলে বললো, "আর ক্ষেমা দিন সার। যা বলে ফেলেছেন, ফেলেছেন তোড়ের মাথায়—ও নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, সার জড়িয়ে পড়বেন আরও।" অতঃপর অধ্যাপক নিরস্ত হলেন কিন্তু তাঁর সাঙ্গপাঙ্গেরা ভয় দেখিয়ে বেনামী চিঠি ছাড়তে লাগলো ছেলেটিকে। মফঃস্বল কলেজের বৈচিত্র্য-বর্জিত পরিবেশে লাগলো অ্যাড্‌ভ্যানঞ্চারের হাওয়া ছেলেটির 'ভেঞ্চার'-এর ফলে। আমার কথায় লক্ষ্য ছাপিয়ে উপলক্ষ্যটাই বড় হয়ে উঠেছে তা বুঝেছি—বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির মত। কিন্তু আলাপে-অপলাপে এটা ঘটেই থাকে। মার্জনা করবেন। আবার ফাতনায় ফিরি ; নতুন করে আবার টোপ গাঁথতে হবে বড়্‌শিতে।

কলেজে প্রতি বছর দুটো করে অভিনয় হতো—একটি বড়, একটি ছোট। তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হতো এমন একজন অধ্যাপকের ওপর, যিনি সব ব্যাপারে উৎসাহী এবং প্রশিক্ষণটাও মোটামুটি চালিয়ে দিতে পারেন। দীর্ঘকাল ধরে যে অধ্যাপকের ওপর এই ভার ন্যস্ত ছিল, কোন কারণে তিনি অধ্যক্ষের বিরাগভাজন হওয়ায় অধিকারীর অধিকারটা সেবার পড়েছিল অধ্যাপক চণ্ডীবাবুর কাঁধে ;—ধাতটা ঘাতসহ হলেও এ ব্যাপারে ভারসহ ছিল না। দু'চারখানা ইংরাজি ও সংস্কৃত নাটক পাঠ্য হিসাবে পড়েছিলেন বটে, কিন্তু রঙ্গাভিনয় বা ছায়াচিত্র কখনো দেখেছিলেন কি না তাও সন্দেহ। সোজা কর্তাকে বলে দিতে পারতেন এটা তাঁর এলাকার বাইরে, সুতরাং এ জোয়াল তার কাঁধ থেকে নামিয়ে নেওয়া হোক। কিন্তু সে পথে তিনি গেলেন না। এ বিষয়ে তাঁর কেরামতি দেখিয়ে একহাত নেবার লোভ সামলাতে পারলেন না। কর্তাভজা তিনি চিরকালই, এই উপলক্ষ্যে সুড়্‌-বুড়্‌

করে আগের সহযোগীকে দুয়ো দিয়ে কর্তার সুয়ো হবার তালও ছিল না তা' নয়। তা'ছাড়া, অধ্যক্ষকে কেন্দ্র করে কক্ষ-পরিক্রমার আনন্দটাও কি কম? কিন্তু লাভের লোভে গোড়াতেই ঠিকে-ভুল হয়েছিল, নতুবা যিনি পনেরো-কুড়িটি ছেলের ক্লাসও সামলাতে হিমসিম্ খান, তিনি এই ভূত-যজ্ঞের পুরোধা হতে ইতস্তত করতেন নিশ্চয়ই। যা হোক্, যা করে ফেলেছেন, তার তো আর চারা নেই। বেচারাকে তাই আগের জনের স্মরণ নিতেই হলো। অধ্যক্ষের দাক্ষিণ্যের দক্ষিণাটা নাই জুটুক, প্রাণ তো বাঁচুক এ যাত্রায়। নাটক-নির্বাচনের জন্যে আহূত পর পর দুটো মীটিং হৈ-হল্লায় একেবারে বানচাল হয়ে গেলো। সে হট্টগোলের তুলনা দেব কিসের সঙ্গে তাই ভাবছি, চট্ করে মনে পড়ে গেল আজকের কাগজে-পড়া বিধান-সভার টাট্‌কা খবরটা। দক্ষ-যজ্ঞ, লংকা-কাণ্ড, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতির কথাও মনে ছিল, "ব্যাসটিল বেড্‌লামের" কারা-ভাঙা কয়েদীদের উন্মত্ত উল্লাস কাহিনীও ভুলিনি; কিন্তু বাঙ্‌লার বিধান-সভার উত্তাল তাণ্ডবের কাছে এরাও শিশু। হ্যাঁ, সেই নাটক-নির্বাচনী সভার একমাত্র উপমা বিধান-সভা। কেবল তাণ্ডব কেন, খাণ্ডবও অসম্ভব ছিল না। নাকানি-চোকানি খেয়ে নিলেন পূর্বগামীর পক্ষচ্ছায়ায় নিশ্চিন্ত আশ্রয়। এর পর আর কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। তিনিই নেপথ্য থেকে বহিত্র বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন কূলের দিকে। অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েও, মহড়ার আসর থেকে ছুটে এসে নির্দেশ নিয়ে যেতেন চণ্ডীবাবু তার কাছ থেকে। দোষ তাঁর নয়, যিনি ভার চাপিয়েছিলেন তার। একজনের প্রতি বিরাগ থেকে যেখানে অযোগ্যের প্রতি অনুরাগ অংকুরিত হয়, সেখানে ফলটা এইরকম হওয়াই তো স্বাভাবিক! অভিনয়ের দিন একটু একটু করে এগিয়ে আসতে লাগলো। অভিনেয় নাটকটির একটি পুরো মহড়ার আয়োজন করা হলো। উপরোধে পড়ে আগের ভদ্র-লোককেও চণ্ডীবাবুর জুটি হতে হলো। ভূমিকা নেই যাদের, এমন

ছেলেও অনেকে প্রেক্ষকরূপে উপস্থিত। নিকষ-কালো রাত, চণ্ডীবাবু এসেছেন নগেন্দ্রনগর থেকে একটি হারিকেন্ হাতে, তেল পুরো ভরা, দু'চারটে শলাকাভরা দেশলাই-এর একটা বাক্সও আছে পকেটে। 'হলে' ঢুকে আসনে আসীন হয়ে হারিকেনটিকে সযত্নে রাখলেন বেঞ্চের নীচে তাঁর প্রলম্বিত পায়ের আড়ালে। মহড়া শেষ হতে বেশ রাত হয়ে গেলো। চণ্ডীবাবু প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দিয়ে বাসায় ফিরবার তাড়ায় উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হেঁট হয়ে বেঞ্চের তলা থেকে হারিকেন্টা বার করবার জন্যে হাত বাড়ালেন। কিন্তু কৈ? হারিকেনটা কোথায় গেলো? কয়েকটি ছেলে তামাম 'হল'টি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলো, কিন্তু তার টিকিও দেখা গেলো না কোনখানে। আনাচে-কানাচে ফাকে-ফোকরে টিপবাতির আলো ফেলে ফেলে খুঁটিয়ে খুঁজে দেখা হলো, কিন্তু বৃথা। কর্পূরের মত উবে গেলো নাকি আলোটা? কে আলো দেবে? চারিদিক থেকে 'হার্কেন, হার্কেন' রবে নিশীথ-নীরবতা খান্ খান্ হয়ে যেতে লাগলো। মহরমের 'হাসান-হোসেন, হায়, হায়'-এর আর্ত্ত ক্রন্দনও এর কাছে হার মানে। 'হল' তো হলো খোঁজা, এইবার করিডোরটা একবার দেখলে হয় না? সম্বল মাত্র একটি টর্চ, জ্বেলে জ্বেলে তারও অন্তিম অবস্থা। আর যাদের ছিল, তারা আগে ভাগেই কেটে পড়েছে। যা হোক্, শেষ চেস্টা একবার করে দেখতেই হয়। এক ব্যাটারির একটা বাক্স-টর্চের ক্ষীণ আলো ফেলে ফেলে একটি ছেলে ভাঙ্গা ব্ল্যাক্-বোর্ডের গাদার নীচে, ঝুল-পড়া দরজার কোণে-কোণে, হারিকেন্টা খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে যেতে লাগলো। হঠাৎ তার কণ্ঠে হারামণি খুঁজে পাওয়ার আনন্দ-চিৎকার শোনা গেলো, "ইউরেকা, ইউরেকা, পেয়েছি, পেয়েছি।" বাকি ছেলেরাও ছুটে এসে জড়ো হলো তার চারদিকে। একখানা ভাঙ্গা টেবিলের তলা থেকে টেনে বার করা হলো ঝুল-মাখা হারিকেন্টা। চণ্ডীবাবু পকেট থেকে গুটি তিন চার কাঠি-ভরা দেশলাই-এর বাক্সটি

বার করে দিলেন। বাতি উস্কে কাঠির পর কাঠি জ্বেলে বাতিটা জ্বালার চেষ্টা চললো, কিন্তু জ্বলে না কেন? তেল নেই নাকি? নাড়িয়ে দেখা গেলো খোল যে খালি একেবারে! এখন উপায়? তীরে এসে তরী ডুববে নাকি? চণ্ডীবাবুর শুক্‌নো ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটতে না ফুটতেই মিলিয়ে গেলো। যা হোক, বরাত ভাল; লণ্ঠন-লুণ্ঠনকারী যে নিপট নিষ্ঠুর ছিল না, তার প্রমাণ রেখে গিয়েছিল হাতের কাছেই। আর একটু খোঁজ করতেই বেরিয়ে পড়লো দরজার এক কোণ থেকে কালো রঙের একটা পাঁট-বোতল, কেরোসিনে ভরা। এর পরের অংশটুকু আর নাই বা বললাম। মোটকথা অনেক জ্বলুনির পর হারিকেন্ জ্বললো—মুসকিলেরও আসান হলো। বিয়োগান্ত নাটকটি চরম-সন্ধিতে পৌঁছাবার ঠিক আগেই হঠাৎ মিলনের মুখে মোড় ফিরলো।

চণ্ডীবাবু বদলি হলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন ডঃ পীযূষ দাস। বেথুন কলেজে ছিলেন আগে। কৃষ্ণনগর তাঁর পূর্বপরিচিত; তাঁর পিতা বিশ শতকের প্রথম দশকে ছিলেন স্থানীয় কলেজ-স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ঐ স্কুলে তিনি পড়েছিলেন সেই সময়। তাঁর পুরান বন্ধু-বান্ধবও ওখানে ছিলেন দু'চারজন। তাই হাওয়া বদলে তিনি ছিলেন ভালই। আসর-জমানো মজলিসী মানুষ ডঃ দাস। পুরাদস্তুর টই-টই সংঘের সভ্য। প্রচারে ব্রাহ্ম, আচারে বারো-আনা হিন্দু। শক্তি-বাদের ওপর গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখে পেয়েছিলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারি সনন্দ (পি. এইচ. ডি.)। বিশ্বাসে ছিলেন তিনি শক্তিবাদী "কাপালিক"। কপাল-শক্তির একনিষ্ঠ-সাধক। কপাল ছাড়া অন্য কোন দেবতাই তিনি জানতেন না। এই দেবতাটি ব্রহ্মের মতই লোক-লোচনের অগোচর—অথচ অলক্ষ্য নেপথ্য থেকে নিরন্তর করে যাচ্ছেন মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। কারণটা উহ্য হলেও কাযটা কিন্তু গুহ্য নয়। এরই কৃপায় কারো ফেরে বরাত, আর কেউ বা হয় কাত। 'অসারে খলু সংসারে'

তাই বরাতকেই সার করেছিলেন ডঃ দাস। থাক্, সে কথা বাহ্য কথা—উহ্যই থাক আপাতত। মাঝারি ধরণের শক্তগড়নের মানুষ এই কাপালিক অধ্যাপক। পোষাকে-আশাকে সাধাসিধা ঢিলেঢালা। ক্লাসে যাওয়ার সময় ছাড়া আর সব সময়ই নিরাবরণ রাখতেন ঊর্ধ্বাঙ্গ; কে কি ভাবছে বা ভাববে তার পরোয়া করতেন না একটুও। ক্ষৌরমসৃণ মুখমণ্ডল, নধর শ্যামল দেহশ্রী, চলা-বলায় উদ্বৃত্ত প্রাণশক্তি যেন উপচে পড়ছে। পায়ে চপ্পল, পরণে নরুণ-পাড় ধুতি, কোঁচার আগাটা কোমরে গোঁজা, দু'পাশের দুটো খুঁটও তাই। একটা পাতলা সিগারেট কেস আর একটা দেশলাই কোমরের কাপড়ের একদিকে পাক দিয়ে মোড়া, অন্যদিকে ট্যাকে magnum-সাইজের একটি পকেট-ঘড়ি। ঠোঁটের আঠা দিয়ে আঁটা একটা সিগারেট জ্বলন্ত কিংবা নিভন্ত অবস্থায় বিরাজ করছে নিরন্তর, দু'পাশের ফাক দিয়ে কথা চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আশ্চর্য স্থানচ্যুত হচ্ছে না সেটা কোনমতেই। রাস্তা থেকে অধ্যাপকদের বিশ্রামকক্ষে ঢুকেই গায়ের পাঞ্জাবীটা খুলে নামিয়ে রাখতেন তালগোল পাকানো অবস্থায় সামনের গোল টেবিলটার ওপর। ক্লাসের ঘণ্টা পড়লে চড়িয়ে দিতেন সেটা। বোতাম লাগাতে ভুল হতো প্রায়ই, ফলে শ্রীঅঙ্গের অনেকটাই অনাবৃত থেকে যেতো। সহকর্মী ও ছাত্রদের এটা এতই চোখ-সহা হয়ে গিয়েছিল যে, এই অদ্ভুত দৃশ্যটা চোখেই পড়তো না। অভ্যাস এমনি জিনিস। হাজিরা খাতাখানা হাতে নিতেও ভুল হয়ে যেতো মাঝে মাঝে। তাই বলে বেয়ারা বা ছেলেদের নিয়ে আনিয়ে নিতেন না সেটা। ক্লাস থেকে বিশ্রাম-কক্ষে ফিরে খাতাখানা টেনে নিয়ে নির্বিকারচিত্তে পটাপট 'P' বসিয়ে যেতেন নামের পাশে পাশে। এতে ছেলেদের সুবিধাই ছিল, কারণ কেউই গরহাজির বলে চিহ্নিত হতো না কখনো। পরীক্ষার খাতাও দেখতেন ডক্টর দরাজ হাতে। মার্ক-সীটে ছাপানো সব নামের পাশেই ৩০ থেকে ৮০ পর্যন্ত যে কোন

একটা করে মার্ক বসিয়ে যেতেন অকুণ্ঠ অন্তরে। প্রশ্নপত্র পারতপক্ষে নিজে কখনো করতেন না, সে দায়টা প্রধানের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে উত্তরপত্র পরীক্ষার ভারটা সানন্দে বহন করতেন। চলছিল ভালই, কিন্তু দৈবাৎ একটা অঘটন ঘটে গেলো একবার। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সংস্কৃত-পরীক্ষার্থী ছাড়াও কয়েকজন আরবী-ফার্সী ছাত্রদের নামের পাশে অজান্তে মার্ক বসিয়ে ফেললেন। ব্যাপারটা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরে এলেও ছাত্র ও সহকর্মীদের মধ্যে এ নিয়ে হাসাহাসি পড়ে গেলো। কিন্তু ডঃ দাস এইসব রঙ্গ-কৌতুক ব্যঙ্গভরে উড়িয়ে দিলেন। বাস্তবিক এমন অ-তাত মেজাজ খুঁজে পাওয়া ভার। আর একবার আর একটা কাণ্ড করে বসেছিলেন ডঃ দাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা প্রধান পরীক্ষকের বরাবর পৌঁছে দেওয়ার নিয়ম সাধারণত তিন কিস্তিতে। যথারীতি ফেলে রেখে দিয়েছিলেন, হয় তো বা ভুলেই গিয়েছিলেন খাতা দেখার কথা। তাগিদ এলো ওপর থেকে, 'দিচ্ছি', 'দেবো' করে আরও কিছুদিন গড়িয়ে গেলো, এলো প্রথম স্মারকপত্র, ডাক্তার নির্বিকার। ক্রমে ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্মারকলিপি আসার পর টনক নড়লো। সুপ্তোত্থিতবৎ উঠে বসে খাতা-দেখার কাজে হাত লাগালেন, আর দ্রুত লয়ে হাত চালিয়ে পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই পরীক্ষাপর্ব শেষ করে কিস্তি মাত্ করার ইচ্ছায় এক লটে পাঠিয়ে দিলেন তিন কিস্তির যাবতীয় খাতা। এরপর হাল্কা মনে হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এখানে ওখানে আড্ডা জমিয়ে। কিন্তু বিধি বাম। হপ্তা না ঘুরতেই এসে পড়ল এক মক্ষম পত্রাঘাত— বজ্রাঘাত বললেও চলে। প্রধান পরীক্ষক কতকগুলো মারাত্মক ভুল ভ্রান্তির জন্যে সরেজমিনে তলব করেছেন তাঁকে। খবরটা চাউর হতে জিজ্ঞাসা করলেন সহকর্মী-বন্ধুরা, "কি ডাক্তার, কি করবেন ভাবছেন? যাচ্ছেন? যাচ্ছেন তো প্রধান পরীক্ষকের দরবারে?" নির্লিপ্তকণ্ঠে উত্তর করলেন তিনি, "যাবো তো বটেই, তবে একেবারে একা নয়;

এক সের সরপুরিয়া ও একসের সরভাজাও সঙ্গে যাচ্ছেন।" পরের দিন ফিরে এসে খোস্ মেজাজে জানালেন, "সব ঠিক হৈ।" মিষ্টির হাঁড়ি দিয়ে প্রধানের হাঁড়িমুখ বন্ধ করে এসেছেন। সত্যিই তো, মুখ বন্ধ করার এর চেয়ে ভাল মুখবন্ধ আর কি হতে পারতো? বললেন, "খাতা দেখার গলতি কিছু বেরোয়নি। শুধু মার্ক-সীট-গুলোয় সই করা হয়নি ; আর প্রথম ও দ্বিতীয় Tabulator-এর জন্য উদ্দিষ্ট অংশ-দুটি তাড়াতাড়িতে খালি থেকে গিয়েছিল এই যা। মুখ-বাঁধা হাঁড়ি দুটো পদপ্রান্তে রেখে গড় করতেই গড়গড় করে আমার উদ্দেশ্যটা হাসিল হয়ে গেল।" এ রকম বুকের পাটা ক'জনের আছে বলুন তো? একবার খেয়ালের বশে করে বসলেন একটা অদ্ভুত কাণ্ড। কলেজের অধ্যক্ষ তাঁর আবাস-সংলগ্ন সরকারী বাগানে মালীদের দিয়ে করিয়েছিলেন কিছু ফুলকপির চাষ। গ্রহবৈগুণ্যে সে কপি মুঠোভর হয়েই বাড বন্ধ করে দিল। বাড়াবার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো দেখে অধ্যক্ষমশায় সেই পুঁয়ে-পাওয়া কপি-গুলো অধ্যাপকদের বাড়ি বাড়ি বিলি করার ব্যবস্থা করলেন। অধ্যাপক দাসের বাড়িতেও গেলো সেই আজব চিজের গুটি পাঁচ ছয়। সন্ধ্যায় টেনিস-মাঠ থেকে ফিরে গৃহস্বামী সমাচারটা শুনলেন গৃহিণীর মুখে। ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা ফেলে রেখে ছুটলেন ভাড়ার ঘরের দিকে ভেটটা সচক্ষে ভেট করার জন্যে। দেখলেন বস্তুগুলো। বস্তুতই spectacular, অর্থাৎ চশমা দিয়ে দেখার যোগ্য। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে ফেললেন সঙ্গে সঙ্গে। পরের দিন দেখা গেলো অধ্যাপক কলেজে এসেছেন সেই অনুপম উপায়নের এক জোড়া হাতে নিয়ে আর ক্লাসের পাশ দিয়ে করিডোরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেই বামন কপিদুটো এক হাতে উঁচু করে তুলে ধ'রে, "white marigold, white marigold" এই আওয়াজ দিতে দিতে অনেকটা ফেরিওয়ালাদের ধরণে। অনেক কষ্টে তাকে নিবৃত্ত করতে হয় এই অপচেষ্টা থেকে।

আর একবারের আর একটা স্মরণীয় ঘটনাও বলেনি এই টানে। বোধ হয় সেটা ইংরেজি ৪১।৪২ সাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডব সুরু হয়েছে সারা ইউরোপ ; বেশ কয়েক দল ফৌজও পাঠান হয়েছে অকুস্থলে। এই অনর্থের কারণে অর্থের প্রয়োজন প্রচুর। ব্রিটিশ সরকার আবেদন (আদেশ) জানিয়েছেন জনসাধারণের কাছে দরাজ হাতে সাহায্যের জন্যে। অধ্যক্ষ-মহাশয়ের কাছেও এসে পৌঁচেছে অর্থসংগ্রহের অমোঘ আদেশ। পরিকল্পনা-অনুসারে অধ্যাপক-ছাত্রদের এক মিলিত মিছিল বেরোলো রাজপথে। সকলের আগে একজন গায়ক-ছাত্র গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে এই উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে লেখা একটি উদ্বোধন-সংগীত গাইতে গাইতে এগিয়ে চলল, আর জন দশ-বারো ছাত্র দু' পাশে এবং পিছনে দোয়ারকি করতে করতে এগিয়ে যেতে লাগল। অধ্যাপকদের দলে অধ্যক্ষ পুরোভাগে, এক পায়ের খঞ্জতাকে উপেক্ষা করে বিপুল উৎসাহে পথ পরিচারণা করে যাচ্ছেন। অধ্যাপক দাস এসে দল ভারী করলেন মাঝপথে। এই বিশেষ পরিবেশে এই বিচিত্র বেশ লোকের চোখে না পড়ে পারে না। এখন থেকে চাঁদা ও অন্যান্য জিনিসপত্র আদায়ে তিনিই নিয়েছেন অগ্রণীর ভূমিকা। দেবনাথ স্কুল ছাড়িয়ে এসে পড়লো মুকুন্দবাবুর নারায়ণ ফার্মেসী,—ঢুকে পড়লেন ডঃ দাস প্রত্যয়-দৃঢ় পদক্ষেপে। 'কুন্ঠিত-পাণি' বলে খ্যাতি ছিল মুকুন্দবাবুর। সুতরাং ডঃ দাসের অনেক অনুনয়-বিনয়েও তার মন ভিজলো না, উপায়ান্তর না দেখে ডাক্তার খোলা র‍্যাক থেকে টপ করে দুটো মেথিলেটেড স্পিরিটের বোতল তুলে নিয়ে দু' বগলে পুরলেন। হতচকিত মুকুন্দবাবু হাঁ হাঁ করে উঠবার আগেই তিনি পগারপার। নাতিস্ফীত তুন্দ বেষ্টন করে গরদের চাদর শ্যামসুন্দরের পীতধড়ার মত বাঁধা, ঠোঁটে একটা জ্বলন্ত সিগারেট, উলঙ্গ অঙ্গের নিভৃত কক্ষ থেকে উঁকি মারছে দুটো পাঁট বোতলের মুখ। অপরূপ দৃশ্য! শোভাযাত্রা আর একটু এগিয়ে যেতেই

পড়লো তিন মাথার মোড়ে ত্রিভুজাকৃতি নিতাই-বোষ্টমের মিষ্টির দোকান। কয়েকটি ছেলে দোকান ঘরে ঢুকে বহুকষ্টে আদায় করে নিয়ে এলো নগদ একটা আধুলি। ডঃ দাসের কানে খবরটা পৌঁছতেই তিনি গোপনে আপণে ঢুকে বগলে-বোতল-ধরা অবস্থাতেই ভিয়ানরত বিপুলকায় 'নেতাই'কে একেবারে জড়িয়ে ধরে বললেন, "বাবা নেতাই একি শুনছি ? তুমি নাকি একটি আধুলি ঠেকিয়েই দায় সেরেছ ? ছাড়ো আরও কিছু ধন ?" নেতাই কিন্তু সে ধন নয়, হাত আর সে উপুড় করলো না। আর কোন উপায় নেই দেখে ডাক্তার ধা ক'রে পাশের তাক থেকে এক থাবা মাখা-সন্দেশ তুলে দিয়ে বাইরে এসে বিতরণ ও ভোজন সুরু করে দিলেন। ছিনিয়ে-নেওয়া সন্দেশ ফ্রন্টের উদ্দেশ্যে না গেলেও চাঁদা-আদায়কারী শোভাযাত্রীদের সেবায় লাগলো তো ? অধ্যক্ষমশায় তার চোখের আড়ালে কি হচ্চে না হচ্চে তার কোন খবরই পাচ্ছিলেন না. পেলে সেই নীতিব্রতী সত্যসাধক লজ্জায় অধোবদন হতেন, তাতে সন্দেহ নেই। মোট কথা, এই শোভাযাত্রায় তিনি যে শোভনতার মাত্রা অতিক্রম করেছিলেন একথা মানতেই হবে। ডিগ্রি খেতাবে পুচ্ছ উচ্চ হলেও তিনি যে উচ্চতর আসনে আসীন হতে পারলেন না— তার সব চেষ্টাই যে তুচ্ছ হয়ে গেলো এর মধ্যেও তিনি দেখেছিলেন কপালের খেলা। কারণ পদোন্নতির শিকে যখন ছিঁড়লো তখন তিনি শেষ শয্যায় তন্দ্রাচ্ছন্ন, গেজেট্ বিজ্ঞপ্তিটা বার বার শুনিয়েও কোন সাড়া পাওয়া গেলো না তার। এইভাবে হয়েছিলো প্রাণ-শক্তির মূর্ত উৎস শক্তিসাধক "কাপালিকের" জীবনলীলার অবসান। হাউই প্রচণ্ড বেগে উপরে উঠবার মুখেই হঠাৎ নিভে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেলো। লোকমতের প্রতি এমন অনায়াস উদা-সীনতা, শাস্ত্রানুশীলনে অচঞ্চল এমন চঞ্চল মানুষ আমি আর দুটি দেখিনি।

টুনটুনির বই-এর মজণ্ডালি সরকারকে ভোলেন নি নিশ্চয়ই।

শুধু বই-এ নয়, জীবনেও আমার সৌভাগ্য হয়েছে এই রকম একটি অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের। পদসংখ্যায় একটু খাটো হলেও পদমর্যাদায় ইনি ছিলেন মজন্তালির অনেক ওপরে। এবার সেই পুরুষ-পুঙ্গবের বিচিত্র চরিত্র তুলে ধরবো আপনাদের সামনে। ধরুন এর নাম মন্মথনাথ ভট্টাচার্য, কাব্যতীর্থ (সরকারি রেকর্ড মোতাবেক), তিনি নিজে বলতেন ষড়তীর্থ (sic)—ছিলেন স্থানীয় কলেজ-স্কুলের সংস্কৃতের পণ্ডিত। এর আসল নাম প্রায় কেউই জানতো না—'বাঘমারা পণ্ডিত' এই উপনামেই ছিল তার পরিচয়। রোগা লিকলিকে ফ্যাকাসে ছোট্ট মানুষটি, কিন্তু প্রচণ্ড শক্তি ছিল তার তুণ্ডে, খণ্ড খণ্ড করে দিতেন প্রতিপক্ষের যুক্তিজাল শাণিত বাক্যের ক্ষুরধারে। পরণে সাদাপাড় ধুতি, তার নীচে আবার বছরে অন্তত আটমাস গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা সুতী ড্রয়ার; গায়ে ঢিলা ফতুয়ার ওপর সেকালের মুচ্ছুদ্দিদের ধরণে পাশে ফিতা আঁটা ঢলঢলে এক বেনিয়ান। নীচের ফতুয়ার এক পকেটে বিড়ির তাড়া, অন্যটায় ঠোকার লোহাসহ চকমকি পাথর, এককানের ফুটোয় গোঁজা আগুন ধরাবার আধপাকানো সুতোর পলতে। ঢিলা, প্রায় ঝুলে পড়া বাঁধানো দাঁতের ফাঁকে বিড়ি চেপে ধ'রে, কানের কোণ থেকে পলতে বার করে চকমকি ঠুকে তাতে আগুন ধরিয়ে সেই ধিকধিকে আগুনে ধরাতেন বিড়িটি। এই অঢেল দেশলাইয়ের যুগে অগ্নি-প্রজ্বলনের এই প্রাক্পৌরাণিক প্রক্রিয়া বিস্ময়াবহ সন্দেহ নেই; পণ্ডিতজী কিন্তু এই চালই চালিয়ে আসছেন কৈশোরে ধূমপানে হাতে খড়ির সেই সুদূর দিন থেকে।

আমার সঙ্গে যখন তার প্রথম পরিচয়, তখন তার আয়ুসূর্য অস্তাচলোন্মুখ অর্থাৎ বয়স গড়িয়ে সত্তরের কোঠায় ছাড়িয়েছে, অথচ চাকরির মেয়াদ ফুরোতে তখনও বেশ কয়েক বছর বাকী। এই অসম্ভব সম্ভব হলো কি করে, কৌতূহলী কারোর এই প্রশ্নের উত্তরে ধূর্ত হাসি হেসে বলেছিলেন, "সে ভারী মজার কথা। চাকরিতে

যখন ঢুকতে গেলাম বয়স তখন ভরা বিয়াল্লিস্। স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ও বয়সের যাচাই-এর জন্যে হাজির হতে হলো সিভিল সার্জেনের সামনে। খাঁটী জন্-বুল লাল টকটকে মুখ, পেল্লায় এক হ্যাভেনা দাঁতে চেপে ত্ব'কশের পাশ দিয়ে ইভিং-মিড়িং কি বলছেন বোঝাই দায়। যা হোক্ পেটে টোকা, বুকে ঠোকা দিয়ে, শোন্‌না দিয়ে জিব টেনে, দাঁত নেড়ে পরীক্ষা শেষ করে বললেন, "বয়স কতো?" সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে বার তিন চার, 'beg your pardon' বলার পর বোধগম্য হলো তার বক্তব্যটা—ঢোক গিলে বলে ফেললাম মুখস্ত করা বয়সটা "Twenty-five sir," "Twenty-five." "You damned liar. You must at least be forty." উত্তরে আমি বললাম "Thank you, sir." যা হোক, সাহেব গোরা হলেও লোক ভালো। গোল না বাধিয়ে মেনে নিলেন চোরা বয়সটা এবং ছাড়পত্র দিলেনও সেই মর্মেই।" কথাটা শেষ করেই টেনে টেনে কসে হাসতে লাগলেন—হাসির ধমকে কশ বেয়ে রসও ঝরে পড়লো ত্ব'চার বিন্দু।

ছেলেটি তার লেখাপড়ায় বেশ ভালো। আই. এস্. সি. পরীক্ষা ভালো করে পাশ করে স্থানীয় কলেজে গণিতে অনার্স নিয়ে বি. এস্. সি. পড়ছিল। একদিন কথায় কথায় তার লেখাপড়ার প্রসঙ্গটা উঠে পড়লে নির্বিকার চিত্তে বললেন, "রসায়ণ পদার্থ-বিদ্যার জন্যে ভাবি না, ও দুটো আমিই তালিম দিচ্ছি; আর গণিতের জ্যোতির্বিদ্যা, ত্রিকোণমিতি, উচ্চ-বীজগণিত ও স্থানাঙ্ক-জ্যামিতি এগুলোও আমিই দেখিয়ে দিচ্ছি। ভাবনা শুধু ঐ ক্যালকুলাস্ আর উদস্থিতি-বিদ্যা নিয়ে। তা' ওদুটো অধ্যাপকরাই দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারবেন একরকম করে।" পণ্ডিতমশায়ের তালিমের যে এলেম ছিল, তা' বলতেই হবে। "অপত্যং পুমান্" দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল বি. এস্. সি. পরীক্ষা। 'ঘংখচের' খচ্‌খচির সঙ্গে গণিতের কচকচির এমন একাসনে অধিষ্ঠান কমই দেখা যায়। নয় কি?

পণ্ডিতমশায় ছিলেন টোলের পড়ুয়া—ইংরাজি-বিদ্যা স্কুলের নীচের কয়েকটি ক্লাস পর্যন্ত। তাই রাজ-ভাষাটা জানতেনও ভাসা-ভাসা,—তাই বলে ইংরাজি বুকুনির ফোড়ন কাটতে ছাড়তেন না। একবার গ্রীষ্মের গুমোটের মধ্যে গেট্ রোডের মোড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা। হাওয়ার খোঁজে ধাওয়া করেছিলেন মোমিন-পার্কের দিকে। আমারও উদ্দেশ্য একই। বললাম, "চলুন না, পার্কে ঢুকে খ'ড়ের ধারে গিয়ে বসা যাক! হয়তো হাওয়াই দাওয়াই মিলতে পারে।" তিনিও তাই চান, এসে বসা গেল সিকতাকীর্ণ নদী-পুলিনে। বাতাস-বন্ধ, আই-ঢাই করছে দেহমন। হঠাৎ এক ঝলক হালকা হাওয়া বয়ে গেলো স্বেদসিক্ত দেহের ওপর দিয়ে কৃপণা দেবতার কুণ্ঠিত করুণার মত। অজ্ঞাতসারে আমি বলে উঠলাম 'আঃ'। বাঘ-মারা বাঘা-পণ্ডিত 'ষড়্তীর্থ' মন্মথনাথ তাঁর দৈহিক অবস্থা প্রকাশ করলেন একটিমাত্র বাছাই করা ইংরাজি শব্দে,—বললেন, "গুমট বলে গুমট, একেবারে supposition হবার উপক্রম।" Suppose করে নিতে দেরি হলো না—পণ্ডিতমশায়ের মুখে suffocation-টাই ঐ ধ্বনি রূপ নিয়েছে। শুনেছি, ক্লাসে বাঁ-হাতে সংস্কৃত Composition-এর একখানা বই একপাশে উঁচিয়ে ধরে খোলা পাতায় সতর্ক চোখ রেখে ব্ল্যাক-বোর্ডের ওপর সন্তর্পণে বসিয়ে যেতেন একটির পর একটি গোটা গোটা অক্ষর। ফলে দু'তিন লাইন লিখতেই ঘণ্টা হতো কাবার, ছেলেদের প্রশ্নের উত্তর আর লিখতে হতো না। তবে লেখার তারিফ করতো তারা প্রাণ খুলে। একদিন কোণ থেকে কোন এক জ্যাঠা ছেলে বলে উঠেছিল, "কী সুন্দর indistinct লেখা আপনার পণ্ডিতমশায়?" মুরুব্বিয়ানা চালে পণ্ডিতমশায় বলেছিলেন, "তবু তো আমার বয়েস-কালের লেখা তোরা দেখিস নিরে, দেখলে stumped (stunned) হয়ে যেতিস্। oppression এর পর থেকে ডান হাতের thump (b) টা একদম জখম, নইলে দেখতিস দেবাক্ষর কাকে বলে।" এসব আমার শোনা কথা। নিজের কানে

শোনা তাঁর একটি মূল্যবান উক্তি উপহার দিয়ে শেষ করবো এই প্রসঙ্গ।

বেশ মনে আছে দ্রব্য-মূল্যের মহার্ঘতাকে উপলক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন, "দিন দিন যে রকম costive হয়ে উঠছে জিনিসপত্রের দাম, তাতে বেঁচে থাকাই দায়।" বুঝছেন তো 'costive' শব্দের মানেটা? ওটা 'costly'-রই সংস্কৃত সংস্করণ। রাজভাষার মত দেবভাষায় নিজের অধিকার সম্বন্ধেও বেশ একটু গর্ব ছিল তাঁর মনে—পাছে সেটা খর্ব হয়, সেই ভয়ে তাকে সর্বশক্তি দিয়ে আগলাতে চাইতেন কৃপণের ধনের মত। আসলে বিদ্যায় তার মরচে পড়ে গিয়েছিল চর্চার অভাবে, কিন্তু সেটাতে শান না দিয়ে শুধু শানিয়ে যেতেন কথার ধারে। জ্যেষ্ঠতাতের দল বিলক্ষণ বুঝতেন সেটা। তাই বাগে পেলে এই বাঘা-পণ্ডিতকে চাপিয়ে দিতে ছাড়তেন না। ক্লাসের মধ্যেই কোন ফাজিল ছেলে ফস্ করে বলে বসতো, "কী অগাধ পাণ্ডিত্য আপনার, সার! এর থই পাওয়া দায়! একটা তীর্থের বেড়া ডিঙোতেই কত স্রিঞা হিম্‌সিম, আর আপনি ছ'-ছটা বেড়া টপকালেন কি করে, অবাক হয়ে তাই ভাবি।" প্রশান্ত ঔদাস্যে একটু মুচ্‌কি হেসে উত্তর করতেন তীর্থপাদ—"তবু তো ভুলেই গিয়েছি পনেরো আনা তিন পাই, এতেই এই। যেটুকু পাচ্ছিস্ তোরা সেটুকু স্রেফ তলানি রে, তলানি। সবটা পেলে কি বলতিস্ তাই ভাবছি।" বকা-ছেলে বোকা সেজে উত্তর করতো—"ওই তলানিটুকু না পেলে তলিয়ে যেতাম একেবারে। দেখুন না, অন্য ইস্কুলে সংস্কৃতে ফেল করে পাঁচ-সাতজন, আর আমাদের স্কুলে করে অন্তত বিশ-তিশজন—এটা কি কম কৃতিত্বের কথা।" বাঘা চালাকিটা বুঝেও মুখ বুঁজে থাকতেন না-বোঝার ভান করে।

হিং টিং ছটের সেই অমর লাইনগুলো ভোলেন নি তো—"অস্তিত্ব আছে, না আছে—ইত্যাদি?" মনে হয় কবি বঙ্গসন্তানের এই

নিখুঁত জাতি-রূপটি এঁকেছিলেন পণ্ডিতপ্রবর মন্মথনাথকেই সম্মুখে রেখে। বাস্তবিক, এতটুকু যন্ত্র থেকে এতটা শব্দ—ক্ষয়ক্ষাম বৃদ্ধের মুখ দিয়ে অনর্গল এমন 'গুলে'র গোলা এর আগে আর শোনা যায় নি। সাধে কি আর বন্ধুজন এঁকে "গুলন্দাজ" এই সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করেছিল? গুলের গোলা কতদূর ছুটতে পারে তার দুটি নির্জলা নমুনা এইবার আপনাদের উপহার দেবো। অতিবড় গুলন্দাজও হয়তো এথেকে শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় কিছু পেতে পারেন। 'যচ্ছ্রুতং তল্লিখিতম্'; দোষ ত্রুটি নেবেন না।

সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য-ভ্রমণে বেরোনো পণ্ডিতমশায়ের চিরকালের স্বভাব। হাতে থাকে লাঠির বদলে চার-ব্যাটারির এক পেল্লায় টর্চ—প্রয়োজন হ'লে হাতিয়ারের কাজ করে। ফাকা-ফরদায় বেড়ানোর চেয়ে বনে-জঙ্গলে আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ানোই তিনি ভালবাসতেন—তাতে নাকি আত্মচিন্তনের সুবিধা হয়। একদা এক শীতের সন্ধ্যায় আনমনে পথ চ'লতে চ'লতে ধ্যানভঙ্গের পর দেখলেন, এসে পড়েছেন বহুদূর শহরের উপকণ্ঠে শ্রীবনের মধ্যে। শীতের ছোট বেলা ঢ'লে পড়েছে তখন রাত্রির কালো কোলে—সেই অন্ধকার আবার ঘনীভূত হয়েছে বনের ঘন-সন্নিবিষ্ট পত্র-পুঞ্জের নিবিড় ছায়ায়। কোন্ পথে কোথায় এসে পড়েছেন মনের ভুলে ঠাওর করতে পারলেন না। ক্ষীণদৃষ্টি-বৃদ্ধ, যেদিকে চোখ যায় এগিয়ে যেতে লাগলেন টিপ-বাতির আলো ফেলে। সেই নীরন্ধ্র অন্ধকারে দিক্‌নির্ণয় করা অসম্ভব। শীতের রাতেও গা ভিজে উঠলো ঘামে। পা-ওঠা পথ-রেখা ধরে ক্রমাগত ঘুরপাক খাওয়া ছাড়া এই গোলকধাঁধার মধ্যে থেকে নিষ্ক্রমণের উপায়ই বা আর কি আছে? কিন্তু হায়, ঘুরপাক খাওয়াই সার হলো; এই বনপ্রস্থে—অনুমানে বুঝলেন এই বহুশ্রুত শ্রীবন—দিক্‌হারা উদ্‌ভ্রান্ত পথিককে পথ দেখাবার জন্যে কোন কপালকুণ্ডলা এগিয়ে এলো না। কপালে যা জুটল তা' কুণ্ডল নয়, ডোরা-কাটা একটি কেঁদো বাঘ। আর কেউ হলে উদ্যতপাদ শার্দূলের

আগুনভরা চোখ দেখে, আর নৃসিংহ-হুংকার শুনে ভিরমি যেতো সন্দেহ নেই, কিন্তু এই নর-শার্দূল এতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না, ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেললেন মুহূর্তের মধ্যে। বাঘের চোখে চোখ রেখে, প্রজ্বলিত টর্চটা বাগিয়ে ধরে অকম্প-অন্তরে অপেক্ষা করতে লাগলেন আসন্ন আক্রমণের। বদন-ব্যাদান করে লাফ দিয়ে ঘাড়ে পড়ার আগেই চকিত এক পা পিছিয়ে বাঘের সেই বিরাট হাঁ-মুখের মধ্যে আমূল ঢুকিয়ে দিলেন তাঁর দেড়-হাতি টর্চটা—সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্বাপদ আকাশ-ফাটা অন্তিম চিৎকার করে শার্দূল-লীলা সংবরণ করলো। অকুস্থানটা ছিল বনপ্রস্থের প্রায় প্রান্তদেশে। হাঁক শুনে আলো-হাতে লাঠি-সোটা নিয়ে এগিয়ে এলো নিকটের গ্রামের একদল দুঃসাহসী লোক। সেই রোমহর্ষক দৃশ্য দেখে তো তারা অবাক্! টর্চটা তখনো বাঘের মুখের মধ্যে—রক্তের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে মাটিতে। অদূরে বঙ্গ-মাতার বীর-সন্তান পণ্ডিত মন্মথনাথ শষ্প-শয্যায় চিৎ হয়ে প'ড়ে গুরু-শ্রমে ঘন ঘন হাঁপাচ্ছেন। নিছক চামড়া-হাড়ের ভেল্‌কি-বাজি দেখে তো তারা হতবাক্। তৃণাসন থেকে তুলে তারা নিয়ে গেলো তাঁকে গ্রামের মধ্যে এবং প্রাথমিক শুশ্রূষার পর পৌঁছে দিল তাঁর আবাসে। ঘটনাটা রটে গেলো মুখে মুখে চারিদিকে। সেই থেকে তাঁর নাম হলো "বাঘমারা পণ্ডিত।" ফরিদ খাঁ শের খাঁ হয়েছিলেন বাঘ মেরে, আর যতীন মুখুজ্জে হয়েছিলেন 'বাঘা' যতীন; আর বাঘ না মেরে শুধু গুল মেরে বাঘমারা খেতাব পেয়েছিলেন গুলন্দাজ পণ্ডিত মন্মথনাথ। একি কম কথা? এর জুড়ি আছে মাত্র একটি, খোল না ছুঁয়ে খালি পদ-গেয়ে আর বোল ব'লে 'খোলন্দাজ' খেতাবে খচিত হয়েছিলেন জনৈক প্রখ্যাত সাহিত্যিক-অধ্যাপক।

হারকিউলিস্-এর 'দ্বাদশ-শ্রমের' অলৌকিক আখ্যান পুরাণে লেখা আছে উজ্জ্বল অক্ষরে। নেমিয়ার সিংহকে কণ্ঠ-রোধ করে বধ করা ছাড়া আরও এগারটি দুঃসাধ্য সাধন করে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন

তিনি। আমাদের বাঘ-মারা বীরবরও শুধু শ্রীবনের ব্যাঘ্র বধ করেই লীলা সংবরণ করেন নি। তাঁর শ্রমসংখ্যা বোধ হয় বারোকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আজও নথিভুক্ত হয়নি সে সব। লোক-স্মৃতির ছেঁড়া পাতায় ছড়িয়ে থাকতে থাকতে হয়তো কোনদিন অবহেলার উড়ো হাওয়ায় যাবে হারিয়ে, তাই আমার জানা আর একটি অসাধ্য সাধনের অলৌকিক কাহিনী লিখে রাখছি আমার ডায়েরির পাতায়। একদিন কি একটা প্রয়োজনীয় জিনিস—পেনের কালি বা লেখার খাতা বা ঐ জাতীয় অন্য কিছু কিনবার জন্যে গিয়েছি খগেন লাহার মনিহারী দোকানে। দেখি যে দারুময় আসনে দারু-ব্রহ্মের মত বসে আছেন "ষড়্‌তীর্থ।" আমাকে দেখেই মূকমুখে ভাষা ফুটলো। বললেন, "আসুন আসুন, বসুন ; দুটো কথা ক'য়ে বাঁচা যাক্‌। এতক্ষণ কথা না ক'য়ে হাঁপিয়ে উঠেছি। সমাচার সব কুশল তো ?" বললাম, "ঐ চলে যাচ্ছে কোন রকমে।" "কোন রকমে কেন ?" প্রশ্ন করলেন পণ্ডিত। বললাম, "সংসারী মানুষ, ষোলো আনা ভালো, ঝেড়ে এ কথা বলা যায় কি ? একটা না একটা লেগেই থাকে। তারপর আপনার সব কুশল তো ?" বিনয়-বিনম্র, কম্র-কণ্ঠের উত্তর এলো, "মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় ভালোই বলতে হবে।" শুধু কুশল বিনিময়ে রস-প্রসঙ্গটা উঠছে না দেখে কথার মোড় ফেরাবার জন্যে প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা, আপনার শ্রীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনীটা শুনে অবধি আপনার প্রতি সম্ভ্রমে মন ভ'রে উঠেছে। বারবার মনে হয়েছে পড়তি বেলায় যে এই শৌর্যের খেলা দেখাতে পেরেছে, না জানি ভরা যৌবনে সে কি কাজই না করেছে। বলুন না দু'একটা, পেট এঁটে রেখে লাভ কি ? ভীরু বলে বাঙালীদের বদ্‌-নাম রটায় যারা, কালি পড়ুক তাদের গালে।" "বলতে তো পারি, কিন্তু সে সব আপনারা বিশ্বাস করবেন কি ? হেসেই উড়িয়ে দেবেন হয়তো।" "তোবা, তোবা, সে কি কথা ? আপনি খুলুন মুখ, আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলাম।" স্বেচ্ছায় সুরু করলেন এইবার কেচ্ছাগুলন্দাজ পণ্ডিত।

"কালটা বিংশ শতকের প্রথম পাদের শেষ দিকে, সালটা ঠিক স্মরণ নেই। তবে প্রথম মহাযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে এটা বেশ মনে আছে। দেশ-ভ্রমণের বাতিক আমার চিরকালের। সেবার সপরিবারে চলেছি দিল্লী হয়ে পেশোয়ারের মুখে। সঙ্গে অনেক লট-বহর। তাড়াতাড়িতে লাগেজ করা হয় নি, আম্বালার কাছাকাছি কোন্ এক স্টেশন থেকে উঠে পড়লো আমাদের কামরায়, 'মূর্ত বিঘ্নের' মত এক ধূর্ত, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান চেকার। ইয়া শাজোয়ান, তা-দেওয়া ঈষৎকটা গোঁফ-জোড়ার ছুঁচলো ডগা-দুটো যেন দুই চোখে খোঁচা দিতে উদ্যত। কটা চোখে কটু দৃষ্টি দুষ্টামি-মাখানো। ঘরে ঢুকেই তাড়াহুড়ো লাগিয়ে দিল টিকিট দেখার—টিকিটগুলো বা'র করবার সময়ও দিতে নারাজ। সে কী মিলিটারী মেজাজ। মালপত্রের ওজন আইনের সীমা না ছাড়ালেও বাংক থেকে নামিয়ে, বেঞ্চের তলা থেকে টেনে বা'র করে ওজন করার অছিলায় তছনছ করে ফেলতে লাগলো। আমার ট্রাঙ্ক, সুটকেস্ নিয়েও ঐ রকম টানা-হ্যাঁচড়া সুরু করে দিলে, প্রথমে আমি দৃঢ়-শান্তকণ্ঠে প্রতিবাদ জানালাম। কিন্তু সেই উদ্ধত ফেরঙ্গ-পুঙ্গব ব্যঙ্গ-ভরে ফুঃ করে কথাগুলো উড়িয়ে দিলো। অভদ্র ভাবে উত্তর করলো, "আলবট্ টচনচ্ করবে, you damned nigger." তখন বয়স কাঁচা, ধমনীতে রক্ত একেবারে টগ্‌বগ্ করে ফুটে উঠলো। উত্তর দিলাম মুখে নয়, শ্রীহস্তের এই প্রচণ্ড মুষ্টিযোগে—সটান ঝেড়ে দিলাম তার ডান রগে বিরাশী সিক্কা ওজনের এক ঘুঁসি। বলেই দেখালেন অস্থিচর্মসার সবুজ শির-ওঠা হাতের একটি ক্ষীণ কম্পিত মুষ্টি। সাহেবটার অবস্থা কি হলো জানতে চান নিশ্চয়ই। ব্যাটা পড়লো আর উঠলো না, তার ফেরঙ্গ-রঙ্গ ঐখানেই হলো সাঙ্গ।" কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম, "ব্যাপারটা মঞ্চাভিনয়ের পতন ও মূর্চ্ছার মত নয় তো?" "কি বললেন? অভিনয়ের কাটা সৈনিকের মত সীন পড়তেই উঠে পালিয়েছিল?" দুর্বল হস্তে অসি অর্থাৎ

ঘুঁসি ধারণ করেন না মন্মথনাথ। "জানেন এই বজ্র-মুষ্টির পুরো একটাও নয়, আধখানা ঘা খেয়ে হাঁ হয়ে পড়েছিল পোস্ত-বলা, চোখে-সুরমা-আঁকা হিংগন্ধী এক জাত-কাবুলীওয়ালা। কুসীদজীবী বর্বরটা বাকী সুদের জন্যে লাঠি ঠুকে জবরদস্তি করায় রক্ত চ'ড়ে গিয়েছিল মাথায়, বসিয়ে দিয়েছিলাম চোয়াল চেপে, রগ ঘেঁসে এক প্রচণ্ড ঘুঁসি, কুসীদের বদ্‌লা নিয়েছিলাম কুলিশে। সেই tragedy-র পর থেকে ছেড়ে দিয়েছি এই trategy (sটা লুক্)—একেবারে ছেড়ে দিয়েছি প্রতিহিংসার পথ। দেখুন না, কেমন শান্ত-শিষ্ট নিরীহ ভদ্রলোক আমি।" সব শুনে মন্তব্য করলাম, "একটা খট্‌কা তবু রয়ে গেল পণ্ডিতমশায়। দু'-দুটো জলজ্যান্ত খুন করেও আপনি আইনের হাত থেকে রেহাই পেলেন কি করে? আদালতে মামলা দায়ের হয় নি আপনার বিরুদ্ধে?" "হয়নি আবার? খুবই টানা-হ্যাঁচড়া হয়েছিল আমাকে নিয়ে, কিন্তু ধোপে টিঁকলো না শেষ পর্যন্ত। ইংরজ জজ (আই. সি. এস্.) একবার আমার দিকে তাকিয়েই নালিশ না-মঞ্জুর করে দিলেন; রায়ে লিখলেন, "এই ক্ষীণকায় বঙ্গ-সন্তানের একটিমাত্র ঘুঁসিতে একটা শাজোয়ান পালোয়ান পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হ'লো, এটা নেহাতই অবিশ্বাস্য—এটা pure decoction (sic)—সম্পূর্ণ বানানো। এর পিছনে দুর্নীতির গন্ধ আছে বলে সন্দেহ হয়। হয়তো মৃত ব্যক্তির হৃদ্‌রোগ ছিল, ডাক্তারি পরীক্ষায় নিশ্চয়ই ধরা প'ড়তো। আশ্চর্যের বিষয় এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ মামলায় এই প্রাথমিক কর্তব্যটাও উপেক্ষা করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ সাক্ষীও কেউ নেই। প্রমাণাভাবে আমি এই মামলা dismiss করতে বাধ্য হলাম।" দ্বিতীয় মামলার রায়ও প্রথমেরই অনুবৃত্তি, সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অ্যাটম বম্-এর কথা আপনারা সকলেই জানেন, শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন নরদেহে—তাও আপনাদের অজ্ঞাত নয়, যিনি অণু থেকেও অণু, এই বিরাট বিশ্ব-প্রপঞ্চের স্রষ্টা ও শিল্পী তিনিই—উপনিষদের এই

বাণীও আপনাদের অশ্রুত নয়। কিন্তু যে লোকোত্তর পুরুষের কীর্তিকথা আজ আপনাদের শোনালাম তার অনুরূপ কিছু এর আগে যে শোনেন নি, তা জোর করেই বলতে পারি।

এবার চলুন একবার কৈলাস-কবিরাজের আখড়ায় উঁকি দিই। শহরের কেন্দ্রস্থলে সেরা সরণির ওপর এই আড্ডা-কক্ষ। এর পশ্চিমে আন্দাজ হাত-দুই চওড়া এবং মানুষ-ভর গভীর এক পাকা নয়ান-জুলি, দুর্গপ্রাকারের পাশে পরিখার মত প্রসারিত। পাঁকে থক্‌থকে সবুজ-কালো ঘন একটা পংকিল পদার্থ সর্বদা টগ্‌বগ্ করে ফুট্‌ছে। আর সেই সমল-সলিলের বুদ্‌বুদের নীচে অর্বুদ দংশ-মশক বংশ বৃদ্ধি করে যাচ্ছে মনের সাধে। গরমের দিনে পশ্চিমের খোলা জানালা-দরজা দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মশক-বাহিনী ঢুকে প'ড়ে ছেকে ধ'রে স্থানে-অস্থানে কামড়াচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে এমন গা-সওয়া হ'য়ে গিয়েছে এটা আড্ডাধারীদের যে তারা মাঝে মাঝে চড়টা চাপড়টা চালিয়েই মশকের বৃন্দতানে কান না দিয়ে গুলতানের তানটুকু প্রাণভরে পান করছে। একটা উৎকট কটু-গন্ধের হল্‌কা হাল্‌কা-হাওয়াকে ভারী করে তুলছে। এ থেকে অনুমান হয়, এই সুবাস-নির্যাস ছিল তাদের রসপানের অনুপান। সেই দম-বন্ধ-করা গন্ধের সঙ্গে মিশে আছে দক্ষিণের একটি বাতাবি গাছের ফুলের দাক্ষিণ্য—পঞ্চতিক্ত-কষায়ের সঙ্গে শর্করার মিশ্রণের মত। পরিবেশের সবিশেষ বর্ণনা না দিয়ে শুধু এই কথাই বলতে পারি আড্ডাধারী-নির্বিশেষে কারোই অরুচিকর ছিল না এটা। এর প্রমাণ, দংশন যতই তীব্র হতো আর গন্ধ যতই উগ্র হতো—নিত্য-পরিকরদের আগ্রহও ততই উদগ্র হয়ে উঠতো; আড্ডা ছেড়ে নড়বার নামও করতো না তারা। এর থেকেই আন্দাজ করা যাবে কত জমাট ছিল এই বৈঠক। আখড়ার গোষ্ঠীপতি ছিলেন স্বয়ং প্রাণাচার্য কৈলাসনাথ সান্যাল। গ্রহ-উপগ্রহ সব তাঁকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো; কে কখন উদিত হয়ে কখন অস্তমিত হবেন

সে সময়টি পর্যন্ত মাপা ছিল। এঁরা হলেন নিত্য-পরিকরের দল; অনিত্য যাঁরা, তাঁরা ধূমকেতুর মত অকস্মাৎ উদিত হয়ে যদৃচ্ছ পুচ্ছ-সঞ্চালন করে সরে পড়তেন। অনিচ্ছা বা পৃচ্ছার অভাব এর কারণ নয়। নানা ধান্দায় আড্ডা রস-নিষেবণের অখণ্ড অবকাশ এঁদের ছিল না; গার্হস্থ্য শাসন অথবা অনুশাসনও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু নিত্য, অনিত্য সব পরিকরই ছিলেন স্বয়ং-প্রভ সূর্যের হিরণ্যদ্যুতিতে আলোকিত। প্রাণাচার্যই ছিলেন এই সৌরমণ্ডলের প্রাণ-কেন্দ্র। দর্শন-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প, চিকিৎসা ও জ্যোতিষ সব শাস্ত্রেই ছিল এঁর অবাধ অধিকার, বিশেষ করে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তো তিনি ছিলেন অসপত্ন ও একচ্ছত্র। তাঁকে এ যুগের ভরত বা শার্ঙ্গদেব আখ্যা দিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি ছিলেন একাধারে বোদ্ধা, ব্যাখ্যাতা এবং শিল্পী। আড্ডার লঘুচপল আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে গুরু-গম্ভীর বিষয়ের চর্বণাও চলতো। প্রাণাচার্যই ছিলেন প্রধান প্রবক্তা, আর সকলে শ্রোতা ও দ্রষ্টা। সেতার, এস্রাজ বাজিয়ে শোনাতেন, খালি গলায় খোলা হাওয়ায় বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর আলাপ করতেন। মার্গ, আরভটী, দেশী প্রভৃতি বিভিন্ন বর্গের সঙ্গীতের শ্রেণী-করণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলতেন। এক কথায় নৃত্ত, নৃত্য, গীত ও বাদ্য সম্পর্কে কত কথাই শোনা যেতো এই সিদ্ধকাম সঙ্গীত-সাধকের মুখে। একটা কথা বলে রাখি এখানে —প্রাচীন, অর্বাচীনের কোন বিচার ছিল না এই আড্ডার আখড়ায়। পথ চিনে যে এসে জুটতো, তাকেই সাদরে সভ্য বলে মেনে নেওয়া হতো। সভ্যদের পেশারও মিল ছিল না কোন, মেশার নেশায় ওরা আসতো। উকিল, মোক্তার, মাস্টার, ডাক্তার, সবারই এখ্‌তার ছিল সভ্য হবার। খতিয়ান কিছু ছিল না;—সভ্যদের নাম লেখা থাকত পরস্পরের মনের খাতায়। কবি সাহিত্যিকও আসতেন দু'একজন। তাঁদের মধ্যে একজনের কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। গোয়াড়ির রাধানগর-অঞ্চলের অধিবাসী—তাঁর নাম তুহিনরঞ্জন ভঞ্জ। তাঁর

কাব্য-জীবন আরম্ভ হয়েছিল কৈশোরেই। সেই থেকে আজ পর্যন্ত যে কাব্য-সম্ভার উপহার তিনি দিয়েছেন বাণীর চরণে, তার ভার রবীন্দ্র-রচনাকেও হার মানাতে পারে। ইনি চালুবুলি এবং ব্রজবুলি দুই ভাষাতেই লিখেছেন রাশি রাশি কবিতা। একটা দুঃখ ছিল তাঁর এবং তাঁর অনুরক্ত ভক্তদের—এই কঠোর বাস্তবতার যুগে সহৃদয় শ্রোতার বড়ই অভাব। অনেক ভেবে একটা অব্যর্থ কৌশল ঠাউরে ছিলেন সিংহ-কবি। দু'চারখানা খাতা লেখা এবং না-লেখা সর্বদাই থাকতো তাঁর পকেটে। পথ চলতে চলতে কখন প্রেরণা আসে বলা যায় না তো; এলেই, মাঠে হোক, ঘাটে হোক, ব'সে যেতেন তৎক্ষণাৎ এবং দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই চার-পাঁচ পৃষ্ঠার এক কবিতা লিখে ফেলতেন। এইভাবে হতো খালি খাতার ব্যবহার। গোল করে রোল-করা খাতার মাথাগুলো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো পকেটের খোল থেকে। চলার তালে তালে মুখ বাড়িয়েই আবার ভিতরে ঢুকে যেতো—দর্শকের বুঝতে দেরী হতো না জেবে জবর কিছু আছে। চলেছেন তুহিন-কবি বমাল-সমেত কৈলাস-কুটীরের দিকে, পথে দেখা হলো অপেক্ষাকৃত তরুণ এক পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে। মুখোমুখি হতেই বন্ধু বললেন, "কি দাদা চলেছেন কোথায় হনহন করে?" "এই একটু ওদিকে"—বলেই কবি পাশ কাটিয়ে পা বাড়ালেন। বন্ধু বললেন, "আখড়ার দিকে তো? আমিও তো ঐ তীর্থেরই যাত্রী। চলুন, আমিও আপনার সঙ্গ নিই।" যেতে যেতে আবার সুরু করলেন, "আজ পকেট-দুটো একটু ফোলা ফোলা মনে হচ্ছে যেন! গুলিগোলা কিছু আছে নিশ্চয়ই। কেমন ঠিক ধরেছি কি না?" "আপনি বেশ রসিয়ে কথা বলেন কিন্তু, বেশ মজা লাগে শুনতে।"—বলতে বলতে তাঁরা পৌঁছে গেলেন কৈলাস-কুটীরের পরিখার ধারে। ড্র-ব্রিজ নয়, পাকা বাঁধানো সেতু দিয়ে পার হয়ে উঠলেন এসে কুটীর-কুট্টিমে। খোলা দুয়ার দিয়ে ভিতরে ঢুকে দুজনে পাশাপাশি বসলেন একখানা পিঠ-দেওয়া প্রশস্ত কাঠের

বেঞ্চের ওপর। সূত্রধর তখন নেপথ্যে, ক্ষণপরেই রঙ্গপীঠে অবতীর্ণ হয়ে বসলেন নিজের আসনে; জিজ্ঞাসা করলেন, "এই যে কবি, অনেক দিন পড়েনি আপনার পায়ের ধুলো; সব কুশল তো? নতুন কিছু আছে শোনাবার?" তরুণ সহযাত্রী বললেন, "আমিও তো তাই বলছি সেই থেকে। সত্যি, গোলাগুলি ছাড়ুন না দু' একটা।" তুহিন-কবি বুঝলেন এটা নিছক ঠাট্টা; কিন্তু কবি-চিত্ত স্বভাবতই আর্দ্র ও ভাব-গদ্‌গদ্. খোঁচার হুলটা বাদ দিয়ে মধুটুকুই মেনে নিলেন। বললেন, "সত্যিই শুনতে চান আপনি? না, না, এটা আপনার ঠাট্টা!" বন্ধু বললেন, "ঠাট্টা কি দাদা এতক্ষণ ধরে কেউ করে? পিপাসায় ছাতি ফাটছে, আর আপনি বলছেন জল চাওয়াটা ঠাট্টা। ওর নাম কি—, ফটিকজলের জন্যে চাতকের বুক-ফাটা কান্নাও তা' হলে ঠাট্টা? কাল-ব্যাজে কাজ কি আর? রস-ভাণ্ড উপুড় করুন এইবার।" "কি যে বলেন", ব'ললেন তুহিন-কবি। "বলি কি আর সাধে?—আপনার সেই—

"বিত্ত নয়, চিত্ত চাই আমি,
নিত্য মন তারই অনুগামী।
বাসনার বাসা নাহি চায়,
ভাবে ভেসে খোঁজে সে কুলায়'
নীড়ে থেকে তবু নীড়হারা,
ওগো মন, এ কেমন ধারা?
এই মাটি এযে খাঁটি সোনা,
রে অবোধ, বুঝেও বোঝো না।"

লাইনগুলোর সুরের রেশ এখনো আমার 'অরূপ' কানে ঝংকার তুলছে। ওকি ভুলবার! অন্তর মন্থন করে উঠেছে এই চিন্তামণি-গুলি, মগ্ন চৈতন্য থেকে সোজা বেরিয়ে এসেছে এরা আবিষ্ট-মনের এক পরম লগ্নে, এদের তুলনা নেই।" তারপর যূথনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন—"আচ্ছা, আপনি বলুন না আমার কথা সত্যি

কিনা।” “কি যে বলেন” ব'লে কবি পরিতৃপ্ত অন্তরের বিনম্র প্রতিবাদ জানাতে যেতেই বাধা দিয়ে কৈলাসনাথ বলে উঠলেন, “কবি, আমারও এক মত। আপনার ব্রজবুলির সেই অবিস্মরণীয় লাইন ক'টি আজও আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে : বলেই সঙ্গে-সঙ্গে আবৃত্তি করলেন,—

“ঋতুপতি আওল, পিককুল গাওল,
অলিকুল মাতল কুঞ্জে,
ভন ভন কবি ঘন পশল পিয়াল-বন,
মন-সুখে ফুল-মহু ভুঞ্জে।
গরবে বরজ-বহূ গর গর পিয়ে মহু,
শরম-ভরম ভুলি যাওয়ে ;
ভণয়ে তুহিন হীন অভাজন কবি দীন
সো মহু-লব নাহি পাওয়ে।

কেমন ? ঠিক মনে আছে কিনা ? সুরু করুন কবি। বিলম্বেনালম্।” এরপরই রস-সত্রের দ্বার মুক্ত হলো—পকেটের জঠর থেকে বেরোলো সেই পথ-চাওয়া খাতাখানা। সুরু হয়ে গেলো সুধাকণ্ঠ কোকিলের কল-কূজন। সাঁঝের ছাকে ঝাকে ঝাকে মশকদল নেপথ্যে আবহ-সঙ্গীত রচনা করে চললো। জমাট গুমোট কেটে গেলো মুহূর্তে ; একটা সুরের সুরলোকের সৃষ্টি হলো সেই দংশ-গুঞ্জিত, গন্ধ-নন্দিত বন্ধ ঘরের মধ্যে।

সহজ কবি-প্রাণ নিয়ে জন্মেছিলেন কবিরঞ্জন তুহিনরঞ্জন। মক্শ করে তাঁকে কবিশক্তি অর্জন করতে হয়নি, অন্তরের উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছিল অবলীলায়। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে জীবনের কোন অবস্থাতেই ভাটা পড়েনি এই কাব্য-স্রোতে,—ব'য়ে চলেছে অবিরত ও অনাহত।

তুহিন-কবির কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে আখড়ার আর একজন উৎসাহী সভ্য উৎপলবাবুর কথা কিছু না বললে প্রত্যবায়ের দায়ে পড়তে হবে। স্থানীয় কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক, কাব্য-কণ্ডূতিও

ছিল যথেষ্ট, রচনা-শ্রাবণের বাসনাও ছিল বলবতী। মৌলিক ও অনুবাদে মিলিয়ে শ্রাবণের ধারার মত বর্ষণ করেছিলেন, অজস্র কবিতা। তাঁর মানস-গঠনে সমাবেশ হয়েছিল তুটি বিরুদ্ধ বস্তুর। দেশ-বিদেশের, বিশেষ করে ইংরাজি সাহিত্যের, অনুশীলন করেছিলেন নিরতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে। এর ফলে বিশদীভূত হয়েছিল তাঁর মনোমুকুর। সাহিত্যের মূল্যায়ন করতেন দক্ষ-সমীক্ষকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু নিজের সৃষ্টির বেলায় বেমালুম ভু:লে যেতেন এই সব মূল্যবান্ অলংকার-সূত্র, অনর্গল লিখে যেতেন অমিশ্র-পয়ার, অলংকারগুলি সবই মামুলী-খেতাবী কবিদের কাব্য থেকে আহরণ করা কেতাবী মাল। আধুনিকতম ইংরাজি কাব্যের সঙ্গে যাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তাঁর কলম দিয়ে বেরোতো কি করে এইসব ব-কলমী কবিতা তা' ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। অবশ্য, চোলাই-করা চোরাই মাল পাওয়া যায় মহা মহা রথীর লেখার মধ্যে। বিশ্বের সব সাহিত্যেই তো গ্রন্থ-চৌর্যের এই চাতুর্যের খেলা! চোরাই-এ দোষ নেই, যদি চোলাইটা হয় নিখুঁত অর্থাৎ চুরির চিহ্নটা ধরা না পড়ে কোন মতে। কবি উৎপল সহজ-সরল মানুষ, কৌশল করে পরস্ব আত্মসাৎ করা পছন্দ করতেন না, ধরাও পড়তেন তাই অতি সহজেই। থাক সে কথা। মোদ্দা কথা, তিনি ভাল-বাসতেন নিজের লেখা অন্যকে শোনাতে। কেই-বা না বাসে? তবে তাঁর আগ্রহটা ছিল একটু উগ্র—এই যা! কিছুতেই বাগ মানাতে পারতেন না সেটাকে, বল্গা আল্গা হয়ে যেতো একটু অসতর্ক হলেই। লেখা যদি খাতার পাতাতেই থেকে যায়—ব্যাংকের লকারে বন্দী বন্ধকী তমসুকের মত আত্ম-প্রকাশের অবকাশ না পায় কখনো, তবে কি লাভ এই লেখার ছেলেখেলায়? বাস্তবিক, 'একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে তুই জনে। গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আর একজন গা'বে মনে।" পুঁথির সঙ্গে শ্রুতির মিলন না হলে কি রস-শ্রুতি সম্ভব হয়? শ্রোতারা শুনলো

না বলেই না বরজলালের পড়তি গলার অমন প্রাণ-গলানো গানটা মাঠে মারা গেল! উৎপলবাবু ভালই বোঝেন এসব কথা। কিন্তু সহৃদয় শ্রোতা পাওয়া যায় কোথায়? ভেবে চিন্তে মক্ষম উপায় ঠাওরালেন তিনি: শরণ নিলেন সাহিত্য-সঙ্গীতির (আখড়ার সংসৃষ্ট সাহিত্য-শাখা)। ডাকলেন সামনের মাসিক অধিবেশনটা নিজের বাড়িতে। অবশ্য খরচা কিছু আছে এতে; কিন্তু উপায় কি? নিখরচায় কাব্যচর্চা এ যুগে হয় না। লঘু ভোজনের আয়োজন গুরুর পর্যায়েই পৌঁছালো। মুখে মুখে খবরটা র'টে গেলো কানে কানে। নিমন্ত্রিতেরা উৎসাহিত' হয়ে উঠলেন সংবাদটা শুনে। হওয়াই তো স্বাভাবিক! শারীর ব্যবস্থায় উদরের অবস্থান হৃদয়ের নীচে হলেও জৈব-প্রয়োজনে তার স্থান হৃদয়ের উপরে। হৃদয়-রাজ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারই হলো উদর; 'Way to the heart is through the stomach' উক্তিটার পেছনে যুক্তি আছে যথেষ্ট। তা'ছাড়া দুর্মুখের মুখ মারার এমন কৌশল আর নেই। একটা কথা এখানে বলে রাখি। নিমন্ত্রিতের মধ্যে অধিকাংশ বিশুদ্ধ শ্রোতা হলেও চিহ্নিত অচিহ্নিত কবি-সাহিত্যিকও ছিলেন বেশ কয়েকজন এদের মধ্যে। একে একে দর্শন দিলেন তাঁরা যথাস্থানে যথাসময়ে। কারো পকেট খালি, কারো বা ভারী। পকেট-ভারী লেখক-শ্রোতাদের লক্ষ্যটা শ্রবণের চেয়ে শ্রাবণের দিকে। সভাপতি নির্বাচনের পর সভাপর্ব আরম্ভ হলো। আহ্বায়কই পেলেন আবৃত্তির অগ্রাধিকার। এইটাই শিষ্টাচার। উৎপলবাবু দপ্তর খুলে পড়তে সুরু করে দিলেন ম্যাক্‌বেথের বঙ্গানুবাদ। অমিত্রাক্ষরের উচ্ছৃঙ্খলতাকে বেঁধেছেন ছন্দের শৃঙ্খলে। সময়-সীমা অতিক্রান্ত হ'লেও থামার নামও করেন না কবি; কাতর নেত্রপাতে সহৃদয় শ্রোতাদের নীরব সম্মতি আদায় করে আগের মতই পড়ে যেতে লাগলেন। আর কবি-সাহিত্যিক যাঁরা ওৎ পেতে বসেছিলেন ওক্তের অপেক্ষায়, তাঁদের অবস্থাটা হয়ে উঠলো সত্যিই করুণ। অবশেষে

কবি বুঝলেন ঠিক ভদ্রোচিত হচ্ছে না আচরণটা; একটু বাকী থাকতেই থামলেন। কিন্তু ঘড়ির ছোট কাঁটা তখন নয়-এর ঘর পার হয়েছে। দু-একটি ছোট লেখা পড়া হ'লে বাকীগুলো পঠিত বলে গৃহীত হলো। সভাপতি সভাভঙ্গ করে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। এইবার সুরু হলো ভোজন-পর্ব। উদ্যোগ-পর্বটা আগে থেকেই চলছিল—নেপথ্যে পেয়ালা-পিরিচের টুং-টাং শব্দেই পাওয়া যাচ্ছিল তার আভাস। পথ্যগুলো একে একে হাজির হলো প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে এইবার। সভাশেষে গৃহস্বামীকে তাঁর উদার আতিথ্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আপ্যায়ন-তৃপ্ত অতিথিরা যখন বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন, সভা-কক্ষের দেওয়াল-ঘড়িতে তখন ঠং ঠং করে দশটা বেজে গেলো। বাঞ্ছিতফলে বঞ্চিত হলেন যাঁরা, দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়ে পূর্ণোদরে শূন্যমনকে প্রবোধ দিতে দিতে রণে ভঙ্গ দিলেন তাঁরা এবারের মত। লেখে যারা, তারা যে শোনাতে চাইবে তাদের লেখা—এটা খুবই স্বাভাবিক; ব্যাপারটা অস্বাভাবিক হয় তখনই, যখন আগ্রহটা উগ্র হয়ে দুষ্ট গ্রহের মত গ্রাস করে বুদ্ধিটাকে। কবি, গায়ক, চিত্রকর সবশ্রেণীর শিল্পীই চান নিজের কলাকৃতিকে সমঝদারের সামনে তুলে ধরতে; প্রকাশই তো মনের সহজ ধর্ম। তুহিনবাবু ও উৎপল-বাবুও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না।

কলকাতায় বদলির বিজ্ঞপ্তিটা গেজেটে বেরোলে মনটা প্রথমে খুশীই হলো। ভাবলাম নতুন পরিবেশে নতুন উৎসাহে কর্মজীবনের শেষ অধ্যায়টা নতুন করে সুরু করা যাবে। একঘেয়েমির অবসাদ কেটে গিয়ে চিত্তে প্রসাদের স্বাদ মিলবে। প্রশস্ততর ক্ষেত্রে প্রশস্তির পথ প্রস্তুত হবে। কিন্তু বিদায়ের লগ্ন যতোই এগিয়ে আসতে লাগলো, উৎসাহের পারদও ততই নামতে লাগলো মনের মানযন্ত্রে। অবশেষে বিদায় নিলাম চোখের জলে। ডোরিক স্থাপত্যের নিখুঁত নিদর্শন কলেজ-ভবন, সংলগ্ন সুন্দর ফুলের বাগান, সবুজ ঘাসে-ছাওয়া আকাশ-ছোঁয়া মাঠ, মাঠের একপাশ দিয়ে চেরা-সিঁথির মত প্রসারিত ছায়াচ্ছন্ন বীথিপথ, তাল-তমাল, ঝাউ-শাল, অশোক-কিংশুক, কৃষ্ণচূড়া অর্জুন, মেহগিনি-দেবদারু-পরিকীর্ণ বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, মোটাসোটা গোল থামের মাথায় কার্ণিশে নানা-জাতের পায়রা—চন্দনা-টিয়া আর লক্ষ্মী-পেঁচাদের মেলা ও খেলা—এরা কী এক অনির্দেশ্য আকর্ষণে আমার মনকে টানতে লাগলো। কর্তব্যের টান কোন মানাই মানে না—অলঙ্ঘ্য তার আহ্বান। যেতেই হলো কলকাতায়। বাসা নিলাম রিজেন্ট-পার্ক অঞ্চলে। নামে কলকাতা, আসলে শহর থেকে বেশ একটু দূরে। প্রথম দর্শনে স্থানটাকে ভালোই লেগেছিলো। চারদিকে উন্মুক্ত প্রান্তর—দূরে দিগন্ত স্পর্শ করে তরুশ্রেণী সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে অজানা ওপারের দিকে আঙুল বাড়িয়ে। শহরের বুকে মাঝে মাঝে রম্য বীথিপথ, নানা নাম-না-জানা গাছের মিশ্র সুগন্ধে মদির-বাতাস, শাখি-শাখায় পাখীর কাকলী। আকাশে রঙের খেলা, পটু পটুয়ার আঁকা স্বপ্নচ্ছবির মত। বাড়িটির ঠিক নীচেই আদি গঙ্গার নিস্তরঙ্গ বংকিম প্রবাহটি প্রকৃতি-সুন্দরীর কটিতটে রূপালি মেখলার মত। প্রথম দর্শনেই

প্রেম—বাসা বদল করেই মালা-বদল। মন তখন কানায়-কানায় ভরা—চিত্ত-জতু আবেগের উত্তাপে দ্রব, কাজেই মশার উপদ্রবের কথাটা শুনেও আমল দিই নি। রাতে মশার কথাই জান্‌তাম মশাই, কিন্তু দিনেও যে মশক-অক্ষৌহিণীর এমন প্রচণ্ড আক্রমণ সম্ভব হতে পারে তা কে জানতো? মুখ ফুটে বলবার জো নেই, নিছক গাল-গল্প বলেই লোকে উড়িয়ে দেবে। তা'ছাড়া, আর একটা দিক থেকেও আমাকে কম নিরাশ হতে হয় নি। যে শান্ত পরিবেশের আশা করেছিলাম তার নাম-গন্ধও এখানে মিললো না। হাটের হট্টগোল দিনরাত যেন লেগেই আছে। অল্প-একটু জায়গার মধ্যে অসংখ্য ছেলে-মেয়ে—তাদের কোলাহলে কান পাতা দায়। বাস্তহারার দল, এক-এক ঘরে পাঁচ-সাত জন করে থাকে, কাজেই পাড়া মাত করে ঘুরে বেড়ানোই তাদের কাজ। তবে একটা দিক থেকে আমি কতকটা সুখী; বাড়ীওয়ালা লোকটি ভাল—উদার, অমায়িক (স্থলবিশেষে মায়িকও), কিন্তু অত্যন্ত খেয়ালী। তরুণী গৃহিণীও খাসা মানুষ। তবে ওঁদের দাম্পত্য-প্রেমের ধরনটা একটু উল্টো রকমের। দূর থেকে ওঁদের বিশ্রম্ভালাপ শুনলে মনে হবে বুঝি-বা তুমুল কলহ চ'লছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখবেন কিছুই নয়। 'অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে' যা হয়ে থ' ক এক্ষেত্রেও ঠিক তাই। আমাদের সঙ্গে ওঁদের দুজনেরই ব্যবহার অতিশয় হৃদ্য ও ভদ্র—যেন আমরা ওঁদের ঘরেরই মানুষ।

কর্তার একটা খেয়াল একটু চোখে লাগে। খানদুই মোটরগাড়ি আছে, কোনটাই ঠিকমত চ'লে না, অথচ তাদের চালাবার জন্যে তাঁর কি প্রাণান্ত প্রয়াস। ঠোকাঠুকি, ঠেলাঠেলির আর অন্ত নেই; কিন্তু জগন্নাথের রথ আপনি না চ'ললে মানুষের সাধ্য কি যে ঠেলে চালায়? এক গণ্ডা মোটর-মিস্ত্রী ে''গ আছে ওদের পেছনে দিনরাত; তা'ছাড়া, আধ-ডজন ভারি-ওজন চাকরও পুষতে হয়েছে এই ঠেলাঠেলির জন্যে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপও নেই ভদ্রলোকের, বিরক্তি

নেই একটুও। নিজে ট্রাম-বাস-রিকসায় যাতায়াত ক'রছেন, ছেলে-মেয়েরাও ইস্কুলে যাচ্ছে ট্রামে-বাসে। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে না তাঁর কিছুতেই। মাঝে মাঝে খিটিমিটি লাগছে মিস্ত্রীদের সঙ্গে। কিন্তু হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না; সেই যে গোঁ ধরেছেন পয়মন্ত মোটর দু'খানাকে চালু করবেনই, কার সাধ্য তাঁকে টলায়। সারারাত আলো জ্বেলে চলছে কাজ; দুখানা অতিকায় ভাঙা মোটর গাড়ি তুষার-যুগের ম্যামথ-কংকালের মত পড়ে আছে প্রবেশ-পথ বন্ধ করে। মাঝে মাঝে স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টার চোটে যন্ত্র-দানবের ক্রুদ্ধ ঊর্ধ্বশ্বাস কর্ণ-পটহ বিদীর্ণ করে দিচ্ছে! হালে পানি না পেয়েও হাল ছাড়ছেন না কর্তা।

এর ওপর আছে আবার প্রার্থনা-সংগীতের মহড়া। ভোর পাঁচটা না বাজতেই পাড়ার একপাল ছেলে জুটিয়ে বিপুল উৎসাহে চলতে থাকে গলার কসরত্। কর্তাই অবশ্য মূল গায়েন,—সুর ধরেন বেজায় বেসুরো মোটা খাদে, আর বেদম চিৎকার করতে থাকে ছেলের পাল প্রার্থনান্তে দুখানা বিস্কুটের লোভে। নিতম্বদেশে চপেটাঘাত করে বেতালা তাল দিতেও ছাড়েন না কর্তা। সব মিলে সে এক ভয়াবহ 'পরিস্থিতি' মশাই; ভাষার সাধ্য নেই সে চিত্র তুলে ধরে আপনাদের সামনে। 'ভব-সাগর-তারণ-কারণ হে' এই প্রথম চরণটাই কানে পশে বেশি করে; পরের কলিগুলো তালগোল পাকিয়ে একটা শবল এবং সবল আর্ত-ধ্বনির মতই শোনায়। দ্বিতীয় চরণটা আমি আন্দাজে বানিয়ে নিয়েছি—"ছপ্পর ফোঁড়কে লাখ টাকা দে।" বেশী মাথা ঘামাতে হয় নি, শাকুন-সামুদ্রিকের আশ্রয়ও নিতে হয়নি। সকাল ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত যিনি অর্থ-চিন্তায় ডুবে আছেন, তাঁর প্রার্থনার অর্থ যে পরমার্থ নয়, তা' বুঝতে দেরি হয়না একটুও। যাহোক, খেয়াল যেমনি হোক, কর্তা আমার প্রতি সদয় খুবই; ছাড়তে চান না—বলেন, "ভাড়া নাই-বা দিতে পারলেন, থেকে যান মশাই।" এমন সহৃদয় উক্তি

শুনেছেন কোনদিন কোন বাড়িওয়ালার মুখে? ছোট্ট কথা;—আমিও কিছু ভাড়া-ছাড়া অমনি থাকতে যাচ্ছি নে; কিন্তু এক-মাসের ভাড়া বাকী পড়লেই যেখানে কড়া তাড়া খেতে হয়, সেখানে এই সহৃদয়তা সত্যিই দুর্লভ।

তাঁর প্রিয় গানগুলির আর দুটি কলিও প্রায়ই আমার কানে আসে; একটি হচ্ছে—"আমায় দে মা পাগল করে"। শুনে ভাবি, তার কি আর বাকী আছে? পালা এবার আমাদের—কলিটা একটু ঘুরিয়ে বললেই বোধ হয় ভাল হয়—"ওদের দেবো পাগল করে।" আগেই বলেছি ভদ্রলোক অমায়িক অর্থাৎ 'মাইকে'র তাঁর দরকার হয় না; কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মতই 'মাইক' তার কণ্ঠে বসান। শ্বাস-যন্ত্রটা এতই সতেজ যে ওর আটপৌরে 'ফুস্‌ফুস্‌' নামটা বদলে 'ফস্‌ফস্‌' বা 'ফোস ফোস' রাখাতে কারো আপত্তি হবার কথা নয়। আর একটা লাইন হচ্ছে—"তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি।" এর দার্শনিক ইংগিতটুকু বড়ো মর্মস্পর্শী। "চুরি করি, বাটপাড়ি করি, জাল-জোচ্চুরি যাই করি—এই হতভাগার হাত দিয়ে সে তুমিই তো করছো মা! তবে আর আমার ভরাডুবির ভয় কি? অতএব লুটে নাও, দু'দিন বৈ তো নয়।" "ত্বয়া হৃষীকেশ"—এর পর এমন মলম আর কোন কলম থেকে বেরোয় নি আজও। এর পরে আবার রামধুনও আছে;—"ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম, সবকো সম্মতি দে ভগবান।" ঈশ্বর, আল্লা দুজনেই আছেন; সেই সঙ্গে গড্‌ নামটা জুড়ে দিতে পারলেই একেবারে সর্বধর্মসমন্বয়; বৌদ্ধরা তো শূন্য-বাদী! কথাটা বলতে গিয়ে আমাদের "হ'রে পাগ্‌লার" কথা মনে পড়ে গেলো; বেঁচে থাকলে বেচারার বয়স হতো এক 'শতক'। সেই পুরোনো যুগে সামান্য ইংরাজি শিখেই সে নিজেকে সাহেব ভেবে বসলো; আর ধুতি-বেনিয়ান ছেড়ে কোট্‌-পাতলুন্‌ ধরলো। মধ্যে কিছুদিন অধ্যাত্মসাধনা করতে করতে শেষটা সর্বধর্মসমন্বয়ের

বাতিক চাপলো তার, আর জপের জন্যে "এলাহি" মন্ত্র রচনা করে সাধন-সমুদ্রে ডুব দিলো। সে এক আশ্চয পঞ্চাক্ষর মন্ত্র—ইনিয়ে-বিনিয়ে কেবল এক ধর্মের যতো নাম, 'হরে কেষ্ট, হরে রাম' নয়—পৃথিবীর বৃহত্তম তিন ধর্মের বীজ এর মধ্যে নিহিত,—'গড্-খোদা-হরি'। ফলকাসনে ব'সে অক্ষমালা হাতে বিড় বিড় করে নিজের উদ্ভাবিত এই মন্ত্র জপ করতে করতে সাহেব-হরি শিবনেত্র হয়ে যেতো, হয়তো তার ধ্যান-নেত্রে উদ্ভাসিত হতো ধর্ম-বৈষম্যহীন, শ্রেণী-সম্প্রদায়হীন এক বিরাট বিশ্ব-সমাজ।

বাবুর বড়ো ছেলেটিও বাঁপ্‌কা-বেটা; নিজের গলার ঘাটতি তিনি পরের গলা দিয়ে পুষিয়ে নেন; দিনের মধ্যে অন্তত চোদ্দ থেকে ষোল ঘণ্টা রেডিও ও গ্রামোফোন চালিয়ে বাপের ওপর টেক্কা দেন। কথাতেই তো আছে. 'কুছ্ না হোয় তো থোড়া থোড়া'। আপ্তবাক্য কি আর মিথ্যা হতে পারে?

রবিবারটা পাওনাদারদের' মোলাকাত-মোকাবিলার দিন; ভিড় লেগে যায়, গাড়ি-বারান্দার নীচে। আন্দাজ দেড়-ডজন ছোট-বড়-মাঝারি—নানা আকারের আর প্রকারের পাওনাদার জমায়ত হয়ে জটলা করতে থাকে। প্রত্যেকেরই চেষ্টা বাবুর সংগে সেই আগে কথা ব'লে কাজ সারবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দোতলা থেকে দেড়তলার সিঁড়ির চৌতারায় নেমে বাবুমশাই উত্তমর্ণদের চরিতার্থ করলেন দর্শন দিয়ে। অদ্ভুত বেশ, অদ্ভুত পরিবেশ; পরনে রঙীন ডুরে শাড়ির একটা টুকরো, ঢেউ-খেলানো তলপেট থেকে নেমে উরুতের মাঝামাঝি এসেই জবাব দিয়েছে। ডান হাতে টুথব্রাশ চলেছে মুহুর্মুহু—মুখে একমুখ 'কলিনোজে'র ফেনা, বাঁ হাতে তুন্দে তৈলমর্দন করছেন। খাস খানসামা পিঠের দিক থেকে সন্তর্পণে কুন্তল-কলাপে স্নেহরস-নিষেকে নিযুক্ত; অন্য একজন ভৃত্য পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে পদ-সংবাহন করছে। দেনার ওজন বুঝে কারো সঙ্গে তিনি অত্যন্ত মসৃণ ও মোলায়েম ব্যবহার করছেন,

কাউকে বা দিচ্ছেন মিঠে-কড়া, আর দু' চার টাকার অন্ত্যজ পাওনাদার যারা তাদের অদৃষ্টে জুটছে স্রেফ দাঁত-খিঁচুনি। সে এক অপরূপ দৃশ্য! কখনও হেসে কুটোকুটি, কখন ভ্রূকুটি, মাঝে-মধ্যে কড়ি-মধ্যম। আশ্চর্য ক্ষমতা কিন্তু ভদ্রলোকের, কাউকে একটি পয়সাও ঠেকালেন না, অথচ ভোজবাজির মত পাওনাদারের দল কোথায় উবে গেলো!

একটা সৌভাগ্যের কথা এখানে বলি। বাড়ির পাশেই পেয়েছি এক অধ্যাপক-বন্ধুকে—সহৃদয় ও বিদ্যানুরাগী; পড়াশুনা নিয়েই থাকেন বেশীর ভাগ সময়; ফুরসত্ পেলে দু'চারটে কথা ক'ন আমারই সঙ্গে। কোনদিন বা সন্ধ্যার দিকে বেরিয়ে পড়ি দু'জনে এদিক ওদিক। শেয়ালকাঁটা, আশ-শ্যাওড়া, কুকুরশোঁকার ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ফণিমনসার বেড়ার পাশ দিয়ে প্রায়-নিশ্চিহ্ন আঁকাবাঁকা পল্লীর পথ-রেখা ধরে কতদূরে চলে যাই। ধান ক্ষেতের বুক চিরে সাদা জরির মত ঐ যে আল-পথটি চলে গিয়েছে বরাবর, আমার মনও তার সঙ্গে সঙ্গে চলে। ভাঁটফুলের কুণ্ঠিত মৃদু গন্ধ ব্রীড়া-বিনম্র গোপনচারিণী নববধূর মত আমার কানে কানে কত কি বলে, মুচকুন্দফুলের ঘন সৌরভ প্রগল্‌ভার প্রলাপের মত আমার কানে আসে, ঘন-পাতার চিকের আড়াল থেকে কাঁটালিচাঁপা আমাকে ইংগিতে ডাক দেয়, বুনো লতাপাতার কটু-সবুজ-গন্ধ উগ্র আসবের মত আমার ইন্দ্রিয়-গ্রামকে বিবশ করে দেয়! এমনি করে ক্ষণে ক্ষণে গন্ধে-গানে, রঙে-রেখায় প্রকৃতি আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। বকের পালকের মত হালকা সাদা মেঘের ওপর রবিরশ্মির আবীর-খেলা আমার মনের পটেও রঙের তুলি বুলিয়ে দেয়। 'মানস'যাত্রী মরালের সঙ্গে আমার মনও 'ক্রৌঞ্চ-রন্ধ্র' পার হয়ে ডানা মেলে উড়ে যায় 'মানসের' অভিমুখে! প্রকৃতিরও একটা ভাষা আছে, মানুষের ভাষার মত তা' অর্থ দিয়ে বাঁধা নয়। মন কখনো তাতে সাড়া দেয়—কখনো দেয় না। সে

ভাষার কিন্তু বিরাম নেই—তার ব্যঞ্জনারও অন্ত নেই! প্রত্যক্ষের আলোক থেকে সে নিয়ে যায় গোধূলির দেহলীতে—জাগ্রত জীবন থেকে ধ্যানময় স্বপ্নের দেশে। এ শুধু কথার কবিত্ব নয়, কবিত্বরই মর্মকথা। এইবার প্রসঙ্গে ফেরা যাক্; অধ্যাপক-বন্ধুটির কথাই বলি। বিজনে দু'জনে এই স্বৈর-বিহার ভারি ভালো লাগে; মাঠের আলের 'পরে বসে কতো কথা হয়! এক কাজের কাজী আমরা 'এক পালকের পাখী'। ইতিহাসের অধ্যাপকের মুখে শুনি দেশ দেশান্তরের কতো ইতিকথা, তিনিও আমার কাছে শোনেন কাব্য-সাহিত্যের এটা-ওটা-সেটা। কখনো বা কোন কথাই হয় না, সামনে দৃষ্টি মেলে শুধু চেয়ে থাকি দূর দিক্চক্রবালের দিকে, মাঠের সবুজ আর আকাশের নীল যেখানে মিলে গিয়েছে বলয়িত বংকিম রেখায়। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। সহসা সংবিৎ ফিরে পেয়ে ঘরের দিকে দ্রুত পা চালাই। প্রকৃতির রূপ-সাগরে স্নান করে শুচিস্নিগ্ধ অন্তর বলে ওঠে, 'দিন মোর গেলো ভালো'।

ভালোই গিয়েছিল এর পরের কয়েক বছর। সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়ে এলাম দেশের ডাকে দেশের কলেজে। নয়া পরিবেশ, নতুন-জীবন ভালোই লাগছিল। ভেবেছিলাম এই মাটিতেই "নয়ন রেখে মুদবো নয়ন শেষে"। কিন্তু পূর্ণ হলো না সে সাধ, বিধি সাধলেন বাদ। জীবন-সঙ্গিনী নোটিশ্ না দিয়েই হঠাৎ পাড়ি দিলেন ওপারের পথে। ভাঙা বুক নিয়ে পড়ে রইলাম আমি এপারে। কলের মত চালিয়ে গেলাম কলেজের কাজ আরও কয়েকটা বছর। তারপর ফেরে পড়ে আবার ফিরে আসতে হলো কলকাতায়। পিছনে পড়ে রইলো শান্তিপুর—দূর স্মৃতির সৌরভে-ভরা এই পুণ্যধাম। আমার কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কত স্বপ্ন-স্মৃতি জড়িয়ে আছে এর তন্তুতে তন্তুতে; কত রাস-রথ ঝুলন-দোল-ধুলোট-কীর্তনের আনন্দবার্তা মূক হয়ে আছে এর মাটিতে। কত প্রত্নকীর্তির মুছে-যাওয়া স্বাক্ষর অলক্ষ্যে রক্ষিত

রয়েছে এর মঠে-মসজিদে, দীর্ণ দেউল ও জীর্ণ প্রাসাদের কোণে কোণে। এর হাওয়ায় আজও যেন শোনা যায় চির বিরহের দীর্ঘশ্বাস আর ক্ষণ-মিলনের মধূচ্ছ্বাস। বসুধার বুকে শৃঙ্গার-হারের মত বিলম্বিত এর গঙ্গার প্রবাহ, আর বিসারিত বালু-বেলা যেন কোন নিপুণ শিল্পীর তূলির লেখায় রেখায়িত—এ শোভার কি তুলনা আছে? গ্রীষ্ম-দিনের কত প্রত্যুষে সখাদলে মিলে এই পুণ্য-প্রবাহিনীর স্নিগ্ধ সলিলে করেছি শুচিস্নান ও সুখ-সন্তরণ। সে আনন্দচ্ছবি কি মন থেকে সহজে মুছবার? দুই তীরে যতদূর দৃষ্টি যায় প্রসারিত রয়েছে অবারিত প্রান্তর। দিগ্‌বলয়ে যেখানে উদাস-আকাশ, উদাসীন উমেশের মত, প্রেমভরে নত হয়ে মোহিনী ধরণীকে নিচ্ছে কোলে তুলে, উন্মনা মন যেন পাখা মেলে উড়ে যেতে চায় মহামিলনের সেই বিবাহ-বাসরে! তীরের ধারে ধারে প্রসারিত প্রান্তরের পাড়ের মত ডাঙালি পটোলের সবুজ ক্ষেত; কোথাও বা পাট, মেস্তা, অড়হরের ক্বচিৎ হরিৎ-হিল্লোল, মাঠের পর মাঠ জুড়ে অসম ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আছে বিশৃঙ্খল বাবলার সারি নিষ্পাদপ মহাপ্রান্তরে নিস্তব্ধ প্রহরীর মত। গঙ্গার বুকে ব'য়ে চলে ছোট-বড়-মাঝারি পাল-তোলা নৌকার সারি ধীর-মন্থর গতিতে কোথায় কে জানে? উপরে আকাশ-গঙ্গার বুকে থেকে থেকে ভেসে চলে লীলাচঞ্চল বলাকার দল মানস-যাত্রী হংস-যূথের মত, কোন্ নিরুদ্দেশের উদ্দেশে! মাঝে মাঝে ভেসে আসে কানে সারি-গানের মন্দীভূত তান, আর বিহঙ্গের মিশ্র কূজন। কোথায় পাব এসব কোলাহল-মুখর মহানগরীর সংঘাত-সংকুল জীবনে? মরুভূমির মাঝে মরূদ্যানের মত ফাকা জায়গা এখানে-ওখানে আছে এখানেও; আছে ইডেন উদ্যান, আছে পার্ক লেক আর উদার গড়ের-মাঠ। এরা ইশারায় আমাকে ডাকে; কিন্তু মনোরথ ছাড়া যাবার কোন পথ নেই। সোজা পথে বাধা বিস্তর এবং দুস্তর। গঙ্গা, গঙ্গাতীরও আছে এখানে,—কিন্তু মানুষ এদের লাবণ্য হরণ করেছে, যুগযুগ-বন্দিতা জাহ্নবীকে করেছে বন্দিনী! তাই উজানে

চলে যেতে চায় মন ফেলে-আসা সেই দিনগুলিতে—ফিরে যেতে চায়, 'সর্বতীর্থসার' জননী-জন্মভূমির স্নেহ-শীতল কোলে। জানি না কবে আসবে সেই শুভলগ্ন। মন উন্মুখ হয়ে আছে সেই ভাবী দিনের প্রতীক্ষায়। শান্তিপুরের প্রিয়-কবি করুণানিধানের কথায় বলি—

'পূজ্য তুমি, পুণ্য তুমি, অন্নদা মা ইন্দিরা,
আজকে তোমায় বন্দিছে এই দীন,
কোথায় এমন শান্তি ঢালে সন্ধ্যারতির মন্দিরা?
কে পরিশোধ ক'রবে মা তোর ঋণ!'